PART- 13

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

ইয়া-সীন

৩৬

নামকরণ

যে দু'টি হরফ দিয়ে সূরার সূচনা করা হয়েছে তাকেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বর্ণনাভংগী দেখে অনুভব করা যায়, এ সূরার নাযিল হবার সময়টি হবে নবী করীমের (সা) নবুওয়াত লাভ করার পর মক্কায় অবস্থানের মধ্যবর্তী যুগের শেষের দিনগুলো। অথবা এটি হবে তাঁর মক্কায় অবস্থানের একেবারে শেষ দিনগুলোর একটি সূরা।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের ওপর ঈমান না আনা এবং জুলুম ও বিদ্রূপের মাধ্যমে তার মোকাবিলা করার পরিণামের ভয় দেখানোই এ আলোচনার লক্ষ। এর মধ্যে ভয় দেখানোর দিকটি প্রবল ও সুস্পষ্ট। কিন্তু বার বার ভয় দেখানোর সাথে যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিষয়বস্তু বুঝাবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

তিনটি বিষয়ের ওপর যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে ঃ

০ তাওহীদের ওপর বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনাবলী ও সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে।

০ আখেরাতের ওপর বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনাবলী, সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও মানুষের নিজের অস্তিত্বের সাহায্যে।

০ মুহাম্মাদী নবুওয়াতের সত্যতার ওপর একথার ভিত্তিতে যে, তিনি নিজের রিসালাতের ক্ষেত্রে এ সমস্ত কষ্ট সহ্য করছিলেন নিস্বার্থভাবে এবং এ বিষয়ের ভিত্তিতে যে, তিনি লোকদেরকে যেসব কথার প্রতি আহবান জানাচ্ছিলেন সেগুলো পুরোপুরি যুক্তিসংগত ছিল এবং সেগুলো গ্রহণ করার মধ্যেই ছিল লোকদের নিজেদের কল্যাণ।

এ যুক্তি প্রদর্শনের শক্তির ওপর ভীতি প্রদর্শন এবং তিরস্কার ও সতর্ক করার বিষয়বস্তু অত্যন্ত জোরে শোরে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে হৃদয়ের তালা খুলে যায় এবং যাদের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার সামান্যতম যোগ্যতাও আছে তারা যেন কুফরীর ওপর বহাল থাকতে না পারে।

ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও তাবারানী প্রমুখগণ মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, يس قلب القران অর্থাৎ এ ইয়া-সীন সূরাটি কুরআনের হৃদয়। এটি ঠিক তেমনই একটি উপমা যেমন সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন বলা হয়েছে। ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন গণ্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে কুরআন মজীদের সমস্ত শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার এসে গেছে। অন্যদিকে ইয়াসীনকে কুরআনের স্পন্দিত হৃদয় বলা হয়েছে এ জন্য যে, কুরআনের দাওয়াতকে সে অত্যন্ত জোরেশোরে পেশ করে, যার ফলে জড়তা কেটে যায় এবং প্রাণপ্রবাহ গতিশীল হয়।

এই হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকেই হযরত ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, اقرءوا سورة يس على موتاكم "তোমাদের মৃতদের ওপর সূরা ইয়া–সীন পাঠ করো।" এর পেছনে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এর মাধ্যমে মরার সময় মুসলমানের অন্তরে কেবলমাত্র ইসলামী আকীদা বিশ্বাসই তাজা হয়ে যায় না বরং বিশেষভাবে তার সামনে আখেরাতের পূর্ণ চিত্রও এসে যায় এবং সে জানতে পারে দুনিয়ার জীবনের মনযিল অতিক্রম করে এখন সামনের দিকে কোন্ সব মনযিল পার হয়ে তাকে যেতে হবে। এ কল্যাণকারিতাকে পূর্ণতা দান করার জন্য আরবী জানে না এমন ব্যক্তিকে সূরা ইয়াসীন শুনাবার সাথে সাথে তার অনুবাদও শুনিয়ে দেয়া উচিত। এভাবে উপদেশ দান ও স্মরণ করিয়ে দেবার হক পুরোপুরি আদায় হয়ে যায়।

يٰسٓ ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾

ইয়া–সীন।[১] বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম, তুমি নিসন্দেহে রসূলদের অন্তরভুক্ত,[২] সরল–সোজা পথ অবলম্বনকারী (এবং এ কুরআন) প্রবল পরাক্রমশালী ও করুণাময় সত্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত,[৩] যাতে তুমি সতর্ক করে দাও এমন এক জাতিকে যার বাপ–দাদাকে সতর্ক করা হয়নি এবং এ কারণে তারা গাফলতিতে ডুবে আছে।[৪]

১. ইবনে আব্বাস, ইকরামা, দ্বাহ্হাক, হাসান বসরী ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার বক্তব্য মতে এর অর্থ হচ্ছে, "হে মানুষ" অথবা "ওহে লোক" এবং কোন কোন মুফাস্সির একে "ইয়া সাইয়েদ" এর সংক্ষিপ্ত উচ্চারণও গণ্য করেন। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে ধরা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে এ শব্দগুলো বলা হয়েছে।

২. এভাবে বক্তব্য শুরু করার কারণ নাউযুবিল্লাহ এ নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দিহান ছিলেন এবং তাঁকে নিশ্চয়তা দান করার জন্য আল্লাহর একথা বলার প্রয়োজন হয়েছিল। বরং এর কারণ হচ্ছে এই যে, সে সময় কুরাইশ বংশীয় কাফেররা অত্যন্ত জোরেশোরে নবী করীমের (সা) নবুওয়াত অস্বীকার করছিল। তাই আল্লাহ কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই তাঁর ভাষণ শুরুই করেছেন এ বাক্য দিয়ে যে, "তুমি নিশ্চয়ই রসূলদের অন্তরভুক্ত।" অর্থাৎ যারা তোমার নবুওয়াত অস্বীকার করছে তারা বিরাট ভুল করছে। তারপর একথার ওপর কুরআনের কসম খাওয়া হয়েছে এবং কুরআনের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে "বিজ্ঞানময়" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমার নবী হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এ কুরআন যা পুরোপুরি জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এ জিনিসটি নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে যে, যে ব্যক্তি এমন জ্ঞানপূর্ণ বাণী উপস্থাপন করছেন তিনি নিসন্দেহে আল্লাহর রসূল। কোন মানুষ এমন ধরনের বাণী রচনা করার ক্ষমতা রাখে না। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা

জানতো তাদের পক্ষে কোনক্রমেই এ বিভ্রান্তির শিকার হওয়া সম্ভব ছিল না যে, এ বাণী তিনি নিজে রচনা করে আনছেন অথবা অন্য কোন মানুষের কাছ থেকে শিখে এসে শুনাচ্ছেন। (এ বিষয়বস্তুর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, ২০, ২১, ২২, ৪৪, ৪৫; বনী ইসরাঈল, ১০৪, ১০৫ টীকা; সূরা নূরের ভূমিকা; সূরা আশ্ শূআরা, ১; আন্ নাম্‌ল, ৯২; আল কাসাস, ৬২, ৬৩, ৬৪, ১০২-১০৯; আল আনকাবুত, ৮৮-৯১ টীকা এবং আর রুমের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ১, ২, ৩ টীকা।)

৩. এখানে কুরআন নাযিলকারীর দু'টি গুণের কথা বলা হয়েছে। এক, তিনি প্রবল ও পরাক্রান্ত। দুই, তিনি করুণাময়। প্রথম গুণটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সত্যটি সম্পর্কে সতর্ক করা যে, এ কুরআন কোন অক্ষম উপদেষ্টার উপদেশ নয় যে, একে উপেক্ষা করলে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। বরং এটি এমন বিশ্ব-জাহানের মালিকের ফরমান যিনি সবার ওপর প্রবল পরাক্রান্ত, যাঁর ফায়সালাসমূহ প্রয়োগ করার পথে কোন শক্তি বাধা সৃষ্টি করতে পারে না এবং যার পাকড়াও থেকে রেহাই পাবার ক্ষমতা কারো নেই। আর দ্বিতীয় গুণটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ অনুভূতি সৃষ্টি করা যে, তিনি নিছক দয়াপরবশ হয়ে তোমাদের হিদায়াত ও পথ দেখাবার জন্য নিজের রসূল পাঠিয়েছেন এবং এ মহান কিতাবটি নাযিল করেছেন, যাতে তোমরা গোমরাহী মুক্ত হয়ে এমন সরল সঠিক পথে চলতে পারো যে পথে চলে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য লাভ করতে পারবে।

৪. এ আয়াতের দু'টি অনুবাদ হতে পারে। এর একটি অনুবাদ ওপরে করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি এও হতে পারে যে, "একটি জাতির লোকদেরকে তুমি সে জিনিসের ভয় দেখাও যার ভয় তাদের বাপ-দাদাদেরকেও দেখানো হয়েছিল, কারণ তারা গাফলতিতে ডুবে আছে।" প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে বাপ-দাদা বলতে নিকট অতীতে অতিক্রান্ত বাপ-দাদাদের কথা বুঝানো হবে। কারণ দূর অতীতে আরব ভূখণ্ডে বহু নবী-রসূল এসেছিলেন। আর দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে এর অর্থ দাঁড়াবে প্রাচীনকালে এ জাতির পূর্বপুরুষদের কাছে নবীদের মাধ্যমে যে পয়গাম এসেছিল এখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করো। কারণ এরা তা ভুলে গেছে। এদিক দিয়ে দু'টি অনুবাদের মধ্যে আসলে কোন বৈপরীত্য নেই এবং অর্থের দিক দিয়ে উভয় অনুবাদ সঠিক ও অর্থবহ।

এ জায়গায় সন্দেহ জাগে যে, এ জাতির পূর্ববর্তী লোকেরা এমন একটি যুগ অতিক্রম করেছিল যখন তাদের কাছে কোন নবী আসেনি, এ সময়ে নিজেদের গোমরাহীর জন্য তারা নিজেরা কেমন করে দায়ী হতে পারে? এর জবাব হচ্ছে, আল্লাহ যখনই দুনিয়ায় কোন নবী পাঠান তখনই তাঁর শিক্ষা ও হিদায়াতের প্রভাব দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং বংশ পরম্পরায় এ প্রভাব বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ প্রভাব যতদিন টিকে থাকে এবং নবীর অনুসারীদের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত এমনসব লোকের আবির্ভাব ঘটতে থাকে যারা হিদায়াতের প্রদীপ উজ্জ্বল করে যেতে থাকেন ততদিন পর্যন্তকার সময়কে হিদায়াতবিহীন গণ্য করা যেতে পারে না। আর যখন এ নবীর শিক্ষার প্রভাব একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অথবা তা পুরোপুরি বিকৃত হয়ে যায় তখন সেখানে নতুন নবীর আবির্ভাব অপরিহার্য হয়ে ওঠে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে আরবে হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, শোআইব, মূসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের শিক্ষার প্রভাব চতুরদিক ছড়িয়েছিল। আর মাঝে মাঝে এ জাতির মধ্যে এমনসব লোকের আবির্ভাব ঘটতো অথবা

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿١٢﴾

তাদের অধিকাংশই শাস্তি লাভের ফায়সালার হকদার হয়ে গেছে, এ জন্যই তারা ঈমান আনে না।[৫] আমি তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, যাতে তাদের চিবুক পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে, তাই তারা মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।[৬] আমি তাদের সামনে একটি দেয়াল এবং পেছনে একটি দেয়াল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। আমি তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না।[৭] তুমি তাদেরকে সতর্ক করো বা না করো তা তাদের জন্য সমান, তারা মানবে না।[৮] তুমি তো তাকেই সতর্ক করতে পারো যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে, তাকে মাগফেরাত ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদানের সুসংবাদ দাও।

আমি অবশ্যই একদিন মৃতদেরকে জীবিত করবো, যা কিছু কাজ তারা করেছে তা সবই আমি লিখে চলছি এবং যা কিছু চিহ্ন তারা পেছনে রেখে যাচ্ছে তাও আমি স্থায়ী করে রাখছি।[৯] প্রত্যেকটি জিনিস আমি একটি খোলা কিতাবে লিখে রাখছি।

বাইর থেকে আগমন হতে থাকতো যারা এ প্রভাবগুলোকে তরতাজা করে তুলতেন। যখন এ প্রভাবগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কাছাকাছি পৌঁছে যায় এবং আসল শিক্ষাও বিকৃত হয়ে যায় তখন মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠান এবং এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যার ফলে তাঁর হিদায়াতের প্রভাব নিশ্চিহ্ন হতে পারবে না। এবং তা বিকৃত হতেও পারবে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা সাবা, ৫ টীকা)

৫. যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলায় জিদ ও গোয়ার্তুমির পথ অবলম্বন করেছিল এবং তাঁর কথা কোনভাবেই মানবে না বলে সিদ্ধান্ত

নিয়েছিল এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তারা শাস্তিলাভের ফায়সালার হকদার হয়ে গেছে, তাই তারা ঈমান আনছে না।" এর অর্থ হচ্ছে, যারা উপদেশে কান দেয় না এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের মাধ্যমে প্রমাণ পুরোপুরি উপস্থাপিত হবার পরও সত্য অস্বীকার ও সত্যের সাথে শত্রুতার নীতি অবলম্বন করে চলতেই থাকে তাদের ওপর তাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের দুর্ভোগ চাপিয়ে দেয়া হয় এবং তারপর তাদের ঈমানলাভের সৌভাগ্য হয় না। এ বিষয়বস্তুকে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে এ বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, "তুমি তো এমন ব্যক্তিকেই সতর্ক করতে পারো যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে।"

৬. এ আয়াতে বেড়ি মানে হচ্ছে তাদের নিজেদের হঠকারিতা। তাদের জন্য সত্য গ্রহণ করার পথে এটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। "চিবুক পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে" এবং "মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে"–এর অর্থ হচ্ছে, অহংকার বশত ঘাড় তেড়া করে দাঁড়িয়ে থাকা। আল্লাহ বলছেন, তাদের জিদ ও হঠকারিতাকে আমি তাদের ঘাড়ের বেড়িতে পরিণত করে দিয়েছি এবং যে অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় তারা লিপ্ত রয়েছে তার ফলে তাদের ঘাড় এমনভাবে বাঁকা হয়ে গেছে যে, কোন উজ্জ্বলতর সত্য তাদের সামনে এসে গেলেও তারা সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করবে না।

৭. সামনে একটি দেয়াল ও পেছনে একটি দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেবার অর্থ হচ্ছে এই যে, এ হঠকারিতা ও অহংকারের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে তারা পূর্বের ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না এবং ভবিষ্যত পরিণামের কথাও চিন্তা করে না। তাদের অন্ধ স্বার্থপ্রীতি তাদেরকে এমনভাবে চারদিক থেকে ঢেকে নিয়েছে এবং তাদের বিভ্রান্তি এমনভাবে তাদের চোখের ওপর আচ্ছাদন টেনে দিয়েছে যার ফলে প্রত্যেক সুস্থবোধ সম্পন্ন ও অন্ধ স্বার্থপ্রীতিহীন মানুষ যে উন্মুক্ত সত্য দেখতে পায় তা তারা দেখতে পায় না।

৮. এর অর্থ এ নয় যে, এ অবস্থায় সত্যদীনের কথা প্রচার করা অর্থহীন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তোমার সাধারণ প্রচার সব ধরনের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের কথা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কিছু লোকের কথা সামনের দিকের আয়াতে আসছে। প্রথম ধরনের লোকদের মুখোমুখি হয়ে যখন দেখবে তারা অস্বীকার, অহংকার, বিদ্বেষ ও বিরোধিতার ওপর স্থির হয়ে আছে তখন তাদের পেছনে লেগে থাকার দরকার নেই। কিন্তু তাদের এ আচরণে হতাশ হয়েও মনোবল হারিয়ে নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ো না। কারণ, তুমি জানো না, মানুষের এ ভীড়ের মধ্যে আল্লাহর এমন বান্দা কোথায় আছে যে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহকে ভয় করে সরল-সঠিক পথে চলে আসবে। তোমার সত্য প্রচারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এ দ্বিতীয় ধরনের লোকদের সন্ধান করা এবং তাদেরকে ছাঁটাই বাছাই করে বের করে আনা। একদিকে হঠকারীদেরকে ত্যাগ করে যেতে হবে এবং অন্যদিকে এ মূল্যবান সম্পদ হস্তগত করতে হবে।

৯. এ থেকে জানা যায়, মানুষের আমলনামা তিন ধরনের বিষয় সম্বলিত হবে। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু ভালো-মন্দ কাজ করে তা আল্লাহর দফতরে লিখে নেয়া হয়। দুই, নিজের চারপাশের বস্তুসমূহের এবং নিজের শরীরের অংগ-প্রত্যংগের ওপর মানুষ যে

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝١٣ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ۝١٤ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ۝١٥ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ۝١٦ وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝١٧

২ রুকূ'

তাদেরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই জনপদের লোকদের কাহিনী শোনাও যখন সেখানে রসূলগণ এসেছিল।[১০] *আমি তাদের কাছে দু'জন রসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তারা দু'জনকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল; তখন আমি তৃতীয়জনকে সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিলাম এবং তারা সবাই বলেছিল, "তোমাদের কাছে রসূল হিসেবে আমাদের পাঠানো হয়েছে।"*

জনপদবাসীরা বললো, "তোমরা আমাদের মতো কয়েকজন মানুষ ছাড়া আর কেউ নও[১১] *এবং দয়াময় আল্লাহ মোটেই কোন জিনিস নাযিল করেননি,*[১২] *তোমরা স্রেফ মিথ্যা বলছো।"*

রসূলরা বললো, আমাদের রব জানেন আমাদের অবশ্যই তোমাদের কাছে রসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আমাদের ওপর আর কোন দায়িত্ব নেই।[১৩]

প্রভাব (Impressions) রাখে তা সবও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং এ সমস্ত চিহ্ন এক সময় এমনভাবে সামনে ভেসে উঠবে যে, তার নিজের আওয়াজ শোনা যাবে, তার নিজের চিন্তা, নিয়ত ও ইচ্ছা-সংকল্পসমূহের সমস্ত কথা তার মানসপটে লিখিত আকারে দৃষ্টিগোচর হবে এবং এক একটি ভাল ও মন্দ কাজ এবং তার সমস্ত নড়াচড়া ও আচরণের ছবি সামনে এসে যাবে। তিন, মৃত্যুর পর নিজের ভবিষ্যত প্রজন্মের ওপর এবং নিজের সমাজ ও সমগ্র মানব জাতির ওপর নিজের ভালো ও মন্দ যেসব প্রভাব সে রেখে গেছে তা যতক্ষণ পর্যন্ত এবং যেখানে যেখানে সক্রিয় থাকবে তা সবই তার হিসেবে লেখা হতে থাকবে। নিজের সন্তানদেরকে সে ভালো মন্দ যা কিছু শিক্ষা দিয়েছে, নিজের সমাজ ক্ষেত্রে যা কিছু সুকৃতি বা দুষ্কৃতি ছাড়িয়েছে এবং মানবতার পক্ষে যে ফুল বা কাঁটা গাছ বপন করে গেছে এসবের পূর্ণ রেকর্ড ততক্ষণ পর্যন্ত তৈরি করা হতে থাকবে যতক্ষণ তার বপন করা এসব চারা দুনিয়ায় ভালো-মন্দ ফল উৎপাদন করে যেতে থাকবে।

১০. প্রাচীন কুরআন ব্যাখ্যাতাগণ সাধারণভাবে এ মত পোষণ করেছেন যে, এ জনপদটি হচ্ছে সিরিয়ার ইন্তাকিয়া শহর। আর এখানে যে রসূলদের কথা বলা হয়েছে তাঁদেরকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এ প্রসংগে যে বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তাতে একথাও বলা হয়েছে যে, সে সময় ইন্তাখিশ ছিল এ এলাকার বাদশাহ। কিন্তু এ পুরো কাহিনীটিই ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, ইকরামাহ, কাবুল আহবার, ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ প্রমুখ মনীষীগণ খৃষ্টানদের অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে গ্রহণ করেছেন এবং ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইন্তাকিয়ায় সালুতী পরিবারের (Seleucid dynasty) ১৩ জন বাদশাহ এন্‌টিউ কাস (Antiochus) নামে রাজ্য শাসন করেছিল। এ নামের শেষ শাসকের শাসন এবং সে সাথে গোটা পরিবারের শাসনকালও খৃষ্টপূর্ব ৬৫ সালে শেষ হয়ে গিয়েছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যুগে ইন্তাকিয়াসহ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের সমগ্র এলাকা রোমানদের শাসনাধীনে ছিল। তাছাড়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেই তাঁর সহচরদেরকে ইসলাম প্রচারের জন্য ইন্তাকিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, খৃষ্টানদের কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বাইবেলের 'প্রেরিতদের কার্য' অধ্যায় থেকে জানা যায়, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার কয়েক বছর পর খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ প্রথমবার সেখানে পৌঁছেছিলেন। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যাদেরকে আল্লাহ রসূল বানিয়ে পাঠাননি এবং আল্লাহর রসূল যাদেরকে নিযুক্ত করেননি তারা যদি নিজস্ব উদ্যোগে ধর্মপ্রচারে বের হন, তাহলে কোন ধরনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহর রসূল গণ্য করা যেতে পারে না। তাছাড়া বাইবেলের বর্ণনা মতে ইন্তাকিয়া হচ্ছে প্রথম শহর যেখানকার অইসরাঈলিরা বিপুল সংখ্যায় ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং ঈসায়ী গীর্জা অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী হয়েছিল। অথচ কুরআন এখানে যে জনপদটির কথা বলছে সেটি এমন একটি জনপদ ছিল যার অধিবাসীরা রসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাবের শিকার হয়েছিল। ইন্তাকিয়া যে এমন ধরনের ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল যাকে রিসালাত অস্বীকার করার কারণে আগত আযাব গণ্য করা যেতে পারে, তার কোন প্রমাণ ইতিহাসে নেই।

এসব কারণে জনবসতি বলে এখানে ইন্তাকিয়া বুঝানো হয়েছে একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন বা হাদীসে এ জনবসতিটিকে চিহ্নিত করা হয়নি। এমনকি এ রসূলগণ কারা ছিলেন এবং কোন্ যুগে এদেরকে পাঠানো হয়েছিল, কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে একথাও জানা যায়নি। কুরআন মজীদ যে উদ্দেশ্যে এ কাহিনী এখানে বর্ণনা করছে তা বুঝার জন্য জনপদের ও রসূলগণের নাম জানার কোন প্রয়োজন নেই। কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরাইশদেরকে একথা জানানো যে, তোমরা হঠকারিতা ও সত্য অস্বীকার করার সে একই নীতির ওপর চলছো যার ওপর চলেছিল এ জনপদের লোকেরা এবং তারা যে পরিণাম ভোগ করেছিল সে একই পরিণামের সম্মুখীন হবার জন্য তোমরা প্রস্তুতি নিচ্ছো।

১১. অন্য কথায় তাদের বক্তব্য ছিল, তোমরা যেহেতু মানুষ, কাজেই তোমরা আল্লাহ প্রেরিত রসূল হতে পারো না। মক্কার কাফেররাও এ একই ধারণা করতো। তারা বলতো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রসূল নন, কারণ তিনি মানুষ ঃ

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ

"তারা বলে, এ কেমন রসূল, যে খাবার খায় এবং বাজারে চলাফেরা করে।"
(আল ফুরকান, ৭)

وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ –

"আর জালেমরা পরস্পর কানাঘুষা করে যে, এ ব্যক্তি (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কি। তারপর কি তোমরা চোখে দেখা এ যাদুর শিকার হয়ে যাবে?" (আল আম্বিয়া, ৩)

কুরআন মজীদ মক্কার কাফেরদের এ জাহেলী চিন্তার প্রতিবাদ করে বলে, এটা কোন নতুন জাহেলীয়াত নয়। আজ প্রথমবার এ লোকদের থেকে এর প্রকাশ হচ্ছে না। বরং অতি প্রাচীনকাল থেকে সকল মূর্খ ও অজ্ঞের দল এ বিভ্রান্তির শিকার ছিল যে, মানুষ রসূল হতে পারে না এবং রসূল মানুষ হতে পারে না। নূহের জাতির সরদাররা যখন হযরত নূহের রিসালাত অস্বীকার করেছিল তখন তারাও একথাই বলেছিল ঃ

مَا هٰذَآ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۚ

"এ ব্যক্তি তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে চায় তোমাদের ওপর তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে। অথচ আল্লাহ চাইলে ফেরেশতা নাযিল করতেন। আমরা কখনো নিজেদের বাপ–দাদাদের মুখে একথা শুনিনি।"
(আল মু'মিননূন, ২৪)

আদ জাতি একথাই হযরত হুদ (আ) সম্পর্কে বলেছিল ঃ

مَا هٰذَآ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۚ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۚ

"এ ব্যক্তি তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে তাই খায় যা তোমরা খাও এবং পান করে তাই যা তোমরা পান করো। এখন যদি তোমরা নিজেদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো তাহলে তোমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (আল মু'মিনূন, ৩৩–৩৪)

সামূদ জাতি হযরত সালেহ (আ) সম্পর্কেও এ একই কথা বলেছিল ঃ

اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗ ۙ

"আমরা কি আমাদের মধ্য থেকে একজন মানুষের আনুগত্য করবো?" (ক্বামার, ২৪)

আর প্রায় সকল নবীর সাথেই এরূপ ব্যবহার করা হয়। কাফেররা বলে ঃ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا "তোমরা আমাদেরই মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও।" নবীগণ তাদের জবাবে বলেন ঃ

إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ

"অবশ্যই আমরা তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি চান অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।" (ইবরাহীম, ১১)

এরপর কুরআন মজীদ বলছে, এ জাহেলী চিন্তাধারা প্রতি যুগে লোকদের হিদায়াত গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে এবং এরই কারণে বিভিন্ন জাতির জীবনে ধ্বংস নেমে এসেছে ঃ

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا –

"তোমাদের কাছে কি এমন লোকদের খবর পৌঁছেনি? যারা ইতিপূর্বে কুফরী করেছিল তারপর নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করে নিয়েছে এবং সামনে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এসব কিছু হয়েছে এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসতে থেকেছে কিন্তু তারা বলেছে, "এখন কি মানুষ আমাদের পথ দেখাবে?" এ কারণে তারা কুফরী করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।"
(আত্‌ তাগাবুন, ৫-৬)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا –

"লোকদের কাছে যখন হিদায়াত এলো তখন এ অজুহাত ছাড়া আর কোন জিনিস তাদের ঈমান আনা থেকে বিরত রাখেনি যে, তারা বললো, "আল্লাহ মানুষকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?" (বনী ইসরাঈল, ৯৪)

তারপর কুরআন মজীদ সুস্পষ্টভাবে বলছে, আল্লাহ চিরকাল মানুষদেরকেই রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষই রসূল হতে পারে কোন ফেরেশতা বা মানুষের চেয়ে উচ্চতর কোন সত্তা এ দায়িত্ব পালন করতে পারে না ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ○

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۚ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾

জনপদবাসীরা বলতে লাগলো, "আমরা তো তোমাদেরকে নিজেদের জন্য অমঙ্গলজনক মনে করি।[১৪] যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করবো এবং আমাদের হাতে তোমরা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।"

রসূলরা জবাব দিল, তোমাদের অমংগল তোমাদের নিজেদের সাথেই লেগে আছে।[১৫] তোমাদের উপদেশ দেয়া হয়েছে বলেই কি তোমরা একথা বলছো? আসল কথা হচ্ছে, তোমরা সীমালংঘনকারী লোক।"[১৬]

ইতিমধ্যে নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! রসূলদের কথা মেনে নাও। যারা তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চায় না এবং সঠিক পথের অনুসারী, তাদের কথা মেনে নাও।[১৭]

"তোমার পূর্বে আমি মানুষদেরকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি অহি পাঠাতাম। যদি তোমরা না জানো তাহলে জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞেস করো। আর তারা আহার করবে না এবং চিরকাল জীবিত থাকবে, এমন শরীর দিয়ে তাদেরকে আমি সৃষ্টি করিনি।" (আল আম্বিয়া, ৭–৮)

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ –

"আমি তোমার পূর্বে যে রসূলই পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই আহার করতো এবং বাজারে চলাফেরা করতো।" (আল ফুরকান, ২০)

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ○

"হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, যদি পৃথিবীতে ফেরেশাতারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে থাকতো, তাহলে আমি তাদের প্রতি ফেশেতাদেরকেই রসূল বানিয়ে নাযিল করতাম।" (বনী ইসরাঈল, ৯৫)

১২. এটি আরো একটি মূর্খতা ও অজ্ঞতা। মক্কার কাফেররা এ মূর্খতা ও অজ্ঞতায় লিপ্ত ছিল। বর্তমানকালের তথাকথিত মুক্ত বুদ্ধির প্রবক্তারাও এতে লিপ্ত রয়েছে এবং প্রাচীনতম কাল থেকে প্রত্যেক যুগের অহী ও রিসালাত অস্বীকারকারীরা এতে লিপ্ত থেকেছে। চিরকাল এদের সবার চিন্তা ছিল, মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ আদতে কোন অহী নাযিল করেন না। তিনি কেবলমাত্র উর্ধজগতের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত। মানুষদের ব্যাপার মানুষদের নিজেদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন।

১৩. অর্থাৎ রব্বুল আলামীন্ তোমাদের কাছে যে পয়গাম পৌছিয়ে দেবার জন্য আমাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন কাজ আমাদের নেই। এরপর তা মেনে নেয়া বা না মেনে নেয়া তোমাদের ইচ্ছাধীন। তোমাদের ওপর বল প্রয়োগ করে মেনে নিতে বাধ্য করার দায়িত্ব আমাদের ওপর সোপর্দ করা হয়নি। আর তোমরা না মেনে নিলে তোমাদের কুফরীর কারণে আমরা পাকড়াও হবো না। বরং তোমাদের এ অপরাধের জন্য তোমাদের নিজেদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে।

১৪. তাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো যে, তোমরা আমাদের জন্য কুলক্ষুণে ও অশুভ। তোমরা এসে আমাদের উপাস্য দেবতাদের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছো তার ফলে দেবতারা আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এখন আমাদের ওপর যেসব বিপদ আসছে তা আসছে তোমাদেরই বদৌলতে। ঠিক এ একই কথাই আরবের কাফের ও মোনাফিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে বলতো ঃ

وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ط

"যদি তারা কোন কষ্টের সম্মুখীন হতো, তাহলে বলতো, এটা হয়েছে তোমার কারণে।" (আন্ নিসা, ৭৮)

তাই কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ ধরনের জাহেলী কথাবার্তাই প্রাচীন যুগের লোকেরাও তাদের নবীদের সম্পর্কে বলতো। সামূদ জাতি তাদের নবীকে বলতো, اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ "আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে অমংগল জনক পেয়েছি।" (আন্ নম্‌লঃ ৪৭)

আর ফেরাউনের জাতিও এ একই মনোভাবের অধিকারী ছিল ঃ

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ج وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ –

وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

কেন আমি এমন সত্তার বন্দেগী করবো না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে?[১৮] তাঁকে বাদ দিয়ে কি আমি অন্য উপাস্য বানিয়ে নেবো? অথচ যদি দয়াময় আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে লাগবে না এবং তারা আমাকে ছাড়িয়ে নিতেও পারবে না।[১৯] যদি এমনটি করি[২০] তাহলে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে পড়বো। আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি,[২১] তোমরাও আমার কথা মেনে নাও।

(শেষ পর্যন্ত তারা তাকে হত্যা করে ফেললো এবং) সে ব্যক্তিকে বলে দেয়া হলো, "প্রবেশ করো জান্নাতে।"[২২] সে বললো, "হায়, যদি আমার সম্প্রদায় জানতো আমার রব কোন্ জিনিসের বদৌলতে আমার মাগফিরাত করেছেন এবং আমাকে মর্যাদাশালী লোকদের অন্তরভুক্ত করেছেন।"[২৩]

"যখন তারা ভালো অবস্থায় থাকে তখন বলে, এটা আমাদের সৌভাগ্যের ফল এবং তাদের ওপর কোন বিপদ এলে তাকে মূসা ও তার সাথীদের অলক্ষুণের ফল গণ্য করতো। (আল আরাফ, ১৩১)

১৫. অর্থাৎ কেউ কারোর জন্য অপয়া ও অলক্ষণ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির তাকদীরের লিখন তার নিজেরই গলায় ঝুলছে। কোন অকল্যাণ ও অঘটন ঘটলে তা হয় তার নিজের তাকদীরেরই ফল এবং শুভ ও কল্যাণকর কিছু ঘটলে তাও হয় তার তাকদীরের ফল।

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ – بنى اسراءيل – ١٣

"প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ ও অকল্যাণের পরোয়ানা আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি।"

১৬. আসলে তোমরা কল্যাণ থেকে পালাতে চাও এবং হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী পছন্দ করো। তাই তোমরা যুক্তির মাধ্যমে হক ও বাতিলের ফায়সালা করার পরিবর্তে কুসংস্কার ও পৌরানিক ভাব কল্পনার মাধ্যমে বাহানাবাজি করছো।

১৭. এ একটি বাক্যের মাধ্যমেই সেই ব্যক্তি নবুওয়াতের সত্যতার সপক্ষে সমস্ত যুক্তি বর্ণনা করে দিয়েছেন। দু'টি কথার মাধ্যমেই একজন নবীর সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। এক, তাঁর কথা ও কাজ। দুই, তাঁর নিস্বার্থপর হওয়া। সে ব্যক্তির যুক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রথমত তাঁরা একটি ন্যায়সংগত কথা বলছেন এবং তাঁদের নিজেদের চরিত্র একেবারে নিষ্কলুষ। দ্বিতীয়ত তাঁরা নিজেদের কোন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এ দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন একথা কেউ চিহ্নিত করতে পারবে না। এরপর তাঁদের কথা কেন মেনে নেয়া হবে না তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সে ব্যক্তির এ যুক্তি উদ্ধৃত করে কুরআন মজীদ লোকদের সামনে একটি মানদন্ড তুলে ধরেছে যে, নবীর নবুওয়াত যাচাই করতে হলে এরি নিরিখে যাচাই করো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, তিনি সঠিক পথে রয়েছেন এবং তাছাড়া তাঁর প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের পেছনে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের লেশ মাত্রও নেই। এরপর কোন বিবেকবান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তাঁদের কথা প্রত্যাখ্যান করবে কিসের ভিত্তিতে?

১৮. এ বাক্যটি দু'টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটিতে রয়েছে উন্নত যুক্তিবাদিতা এবং দ্বিতীয় অংশে সত্য প্রচারের সর্বোত্তম কৌশলের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। প্রথম অংশে তিনি বলছেন, স্রষ্টার বন্দেগী করা বুদ্ধি ও প্রকৃতির দাবীর নামান্তর মাত্র। অযৌক্তিক কথা যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে যারা মানুষ সৃষ্টি করেনি মানুষ তাদের বন্দেগী করবে এটাই অযৌক্তিক। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ তাঁর বন্দেগী করবে, এটা অযৌক্তিক নয়। দ্বিতীয় অংশে তিনি নিজের জাতির লোকদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করছেন যে, তোমাদের একদিন মরতে তো হবেই এবং যে আল্লাহর বন্দেগী করতে আজ তোমাদের আপত্তি তখন তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। এখন তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমরা কোন্ কল্যাণের আশা পোষণ করতে পারো।

১৯. অর্থাৎ তারা আল্লাহর এত প্রিয়ও নয় যে, আমি সুস্পষ্ট অপরাধ করবো এবং তিনি নিছক তাদের সুপারিশে আমাকে মাফ করে দেবেন। আবার তাদের এত শক্তিও নেই যে, আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিতে চান এবং তারা নিছক নিজেদের শক্তির জোরে আমাকে তাঁর কবল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারেন।

২০. অর্থাৎ এসব জেনে বুঝে যদি আমি তাদেরকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করি।

২১. এ বাক্যের মধ্যে আবার সত্য প্রচারের একটি সূক্ষ্ম কৌশলের অবতারণা করা হয়েছে। একথা বলে সে ব্যক্তি তাদের অনুভূতিকে এভাবে সজাগ করেন যে, আমি যে রবের প্রতি ঈমান এনেছি তিনি কেবল আমারই রব নন বরং তোমাদেরও রব। তাঁর প্রতি ঈমান এনে আমি ভুল করিনি বরং তাঁর প্রতি ঈমান না এনে তোমরাই ভুল করছো।

২২. অর্থাৎ শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করার সাথে সাথেই তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হলো। যখনই মৃত্যুর দরোজা পার হয়ে তিনি অন্য জগতে পৌঁছে গেলেন, ফেরেশতারা সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন এবং তারা তখনই তাঁকে এ মর্মে সুসংবাদ দিয়ে দিলেন যে, সুসজ্জিত বেহেশ্ত তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। এ বাক্যটির ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কাতাদাহ বলেন, "আল্লাহ তখনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন, তিনি সেখানে জীবিত রয়েছেন

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

এরপর তার সম্প্রদায়ের ওপর আমি আকাশ থেকে কোন সেনাদল পাঠাইনি, সেনাদল পাঠাবার কোন দরকারও আমার ছিল না। ব্যস, একটি বিস্ফোরণের শব্দ হলো এবং সহসা তারা সব নিস্তব্ধ হয়ে গেলো।[২৪] বান্দাদের অবস্থার প্রতি আফসোস, যে রসূলই তাদের কাছে এসেছে তাকেই তারা বিদ্রূপ করতে থেকেছে। তারা কি দেখেনি তাদের পূর্বে কত মানব সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করেছি এবং তারপর তারা আর কখনো তাদের কাছে ফিরে আসবে না?[২৫] তাদের সবাইকে একদিন আমার সামনে হাজির করা হবে।

এবং আহারলাভ করছেন। অন্যদিকে মুজাহিদ বলেন, "ফেরেশ্‌তারা একথা সুসংবাদ হিসেবে তাঁকে জানিয়ে দেন এবং এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামতের পরে যখন সকল মু'মিন জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন তিনিও তাদের সাথে প্রবেশ করবেন।"

২৩. এটি সেই মু'মিন ব্যক্তির উন্নত নৈতিক মানসিকতার একটি শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। যারা এ মাত্র হত্যা কর্ম সংঘটিত করেছিল তাদের বিরুদ্ধে তাঁর মনে কোন ক্রোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল না। তিনি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য কোন বদদোয়া করছেন না। এর পরিবর্তে তিনি এখনো তাদের কল্যাণ কামনা করে চলছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর মনে যদি কোন আকাংখা জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে তা ছিল কেবলমাত্র এতটুকু যে, হায়, আমার জাতি যদি আমার এ শুভ পরিণাম জানতে পারতো এবং আমার জীবন থেকে না হলেও আমার মৃত্যু থেকেও যদি শিক্ষা নিয়ে সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করতো। এ ভদ্র-বিবেকবান মানুষটি নিজের হত্যাকারীদের জন্যও জাহান্নামের প্রত্যাশা করতেন না। বরং তিনি চাইতেন তারা ঈমান এনে জান্নাতের অধিকারী হোক। এরি প্রশংসা করে হাদীসে বলা হয়েছে نصح قومه حيا وميتا "এ ব্যক্তি জীবিত অবস্থায়ও নিজের জাতির কল্যাণকামী থেকেছে এবং মৃত্যুর পরও।"

এ ঘটনাটি বর্ণনা করে মহান আল্লাহ মক্কার কাফেরদেরকে পরোক্ষভাবে এ সত্যটির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۝ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۭ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩ রুকূ'

এদের[২৬] জন্য নিষ্প্রাণ ভূমি একটি নিদর্শন।[২৭] আমি তাকে জীবন দান করেছি এবং তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেছি, যা এরা খায়। আমি তার মধ্যে খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করেছি এবং তার মধ্য থেকে ঝরণাধারা উৎসারিত করেছি, যাতে এরা তার ফল ভক্ষণ করে। এসব কিছু এদের নিজেদের হাতের সৃষ্ট নয়।[২৮] তারপরও কি এরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না?[২৯] পাক-পবিত্র সে সত্তা[৩০] যিনি সব রকমের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তা ভূমিজাত উদ্ভিদের মধ্য থেকে হোক অথবা স্বয়ং এদের নিজেদের প্রজাতির (অর্থাৎ মানব জাতি) মধ্য থেকে হোক কিংবা এমন জিনিসের মধ্য থেকে হোক যাদেরকে এরা জানেও না।[৩১]

সাথী মু'মিনরাও তোমাদের ঠিক তেমনি যথার্থ কল্যাণকামী যেমন এ মর্দে মু'মিন তাঁর জাতির কল্যাণকামী ছিল। তোমাদের সকল প্রকার উৎপীড়ন-নিপীড়ন সত্ত্বেও এরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ স্পৃহা পোষণ করে না। তোমাদের সাথে এদের শত্রুতা নেই। বরং এদের শত্রুতা তোমাদের গোমরাহীর সাথে। তোমরা সত্যসঠিক পথে ফিরে আসবে, কেবল এ জন্যই এরা লড়াই করছে। এ ছাড়া এদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

যেসব আয়াত থেকে বরযখের (মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত) জীবনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এ আয়াতটি তার অন্যতম। এ থেকে জানা যায় মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়-কাল চূড়ান্ত অস্তিত্ব বিলুপ্তির যুগ নয়। কোন কোন স্বল্পজ্ঞান-সম্পন্ন লোক এ রকম ধারণা পোষণ করে থাকে। বরং এ সময় দেহ ছাড়াই প্রাণ জীবিত থাকে, কথা বলে ও কথা শোনে, আবেগ-অনুভূতি পোষণ করে, আনন্দ ও দুঃখ অনুভব করে এবং দুনিয়াবাসীদের ব্যাপারেও তার আগ্রহ অব্যাহত থাকে। যদি এমনটি না হতো, তাহলে মৃত্যুর পর এ মর্দে মু'মিনকে কেমন করে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয় এবং তিনিই বা কেমন করে তার জাতির জন্য এ আকাংখা করেন যে, হায়, যদি তারা তাঁর এ শুভ পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারতো।

২৪. মূল শব্দটি হচ্ছে "নিভে গেল।" এ শব্দের মধ্যে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম ব্যাংগ। নিজেদের শক্তির জন্য তাদের অহংকার এবং সত্যদীনের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত ক্ষোভ ও আক্রোশ ছিল যেন একটি জলন্ত অগ্নিশিখা। তারা মনে করছিল, এটি ঐ তিনজন নবী ও তাঁদের অনুসারীদেরকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে। কিন্তু আল্লাহর আযাবের একটি আঘাতেই এ অগ্নিশিখা ঠান্ডা হয়ে গেলো।

২৫. অর্থাৎ এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে যে, কোথাও তাদের সামান্যতম চিহ্নও নেই। যে একবার পড়ে গেছে সে আর ওঠেনি। দুনিয়ায় আজ তাদের নাম নেবার মতো একজন লোকও বেঁচে নেই। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিই নয়, তাদের বংশধারাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

২৬. মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলায় অস্বীকার, মিথ্যা আরোপ ও সত্য বিরোধিতার যে কর্মনীতি অবলম্বন করে, পিছনের দু'রুকূ'তে তার নিন্দা করা হয়েছে। আর এখন ভাষণের মোড় ফিরে যাচ্ছে মূল বিবাদের দিকে, যা তাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার দ্বন্দ্ব–সংঘাতের আসল কারণ ছিল। অর্থাৎ তাওহীদ ও আখেরাতের বিশ্বাস, যা নবী করীম (সা) পেশ করছিলেন এবং কাফেররা মেনে নিতে অস্বীকার করছিল। এ প্রসঙ্গে একের পর এক কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করে লোকদেরকে এ মর্মে চিন্তা–ভাবনা করার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে যে, তোমাদের চোখের সামনে বিশ্ব–জাহানের এই যে, নিদর্শনাবলী প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে, এগুলো কি এ সত্যটির প্রতি পরিষ্কার অংগুলি নির্দেশ করছে না, যা এ নবী তোমাদের সামনে পেশ করছেন?

২৭. অর্থাৎ তাওহীদই সত্য এবং শিরক পুরোপুরি ভিত্তিহীন।

২৮. এ বাক্যটির দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে, "যাতে এরা খেতে পারে তার ফল এবং সে জিনিসগুলো, যা এদের নিজেদের হাত তৈরি করে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে এরা নিজেরা যেসব কৃত্রিম খাদ্য তৈরি করে যেমন রুটি, তরকারী, মুরব্বা, আচার, চাটনি এবং অন্যান্য অসংখ্য জিনিস।

২৯. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলোতে ভূমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতাকে যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। মানুষ দিনরাত ভূমি থেকে উৎপাদিত শস্য–ফলমূল খাচ্ছে। তারা নিজেরা একে একটি মামুলি ব্যাপার মনে করে থাকে। কিন্তু গাফলতির পর্দা ছিন্ন করে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে তারা জানতে পারবে, এ ভূমির আস্তরণ ভেদ করে সবুজ শ্যামল ফসল ও বন–বনানীর সৃষ্টি এবং তার মধ্যে নদ–নদী ও স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হওয়া এমন কোন খেলা নয় যা নিজে নিজেই চলছে। বরং এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে একটি বিরাট জ্ঞান, শক্তি এবং প্রতিপালন ও পরিচালন ব্যবস্থা। পৃথিবীর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে দেখা যাবে যেসব উপাদানের সাহায্যে এটি গঠিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আপনা–আপনি বিকাশ, বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি লাভ করার কোন ক্ষমতা নেই। এসব উপাদান এককভাবেও এবং সব রকমের মিশ্রণ ও সংগঠনের পরও থাকে একেবারেই অকেজো ও অনুপযোগী। এ কারণে এদের মধ্যে জীবনের নামমাত্রও নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ নিস্প্রাণ যমীনের বুক চিরে উদ্ভিদ জীবনের উন্মেষ সম্ভব হলো কেমন করে? এ

সম্পর্কে অনুসন্ধান চালালে জানা যাবে, পূর্বাহ্নেই কয়েকটি বড় বড় কার্যকারণ সংগৃহীত না হলে এ জীবনধারা আদৌ অস্তিত্বলাভই করতে পারতো না।

প্রথমত, পৃথিবীর বিশেষ অংশসমূহে তার উপরিভাগের ভূপৃষ্ঠে এমন অনেক জৈবিক উপাদানের আস্তরণ বিছানো হয়েছে যা উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হবার উপযোগী হতে পারতো। এ আস্তরণকে নরম রাখা হয়েছে, যাতে উদ্ভিদের শিকড় তার মধ্যে বিস্তার লাভ করে নিজের খাদ্য আহরণ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যমীনের ওপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে পানি সিঞ্চনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে খাদ্য উপাদানসমূহ তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এমন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে যার ফলে উদ্ভিদের শিকড়সমূহ তা চূষে নিতে সক্ষম হয়।

তৃতীয়ত, ওপরের শূন্যলোকে বায়ু সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বায়ু উর্ধলোকের বিপদ–আপদ থেকে যমীনের হেফাজত করে এবং বৃষ্টি পরিবহনের কাজ সম্পাদন করে। এ সংগে এর মধ্যে এমন সব গ্যাসের সমাবেশ ঘটে যা উদ্ভিদের জীবন এবং তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশলাভের জন্য প্রয়োজন।

চতুর্থত, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে যার ফলে উদ্ভিদ তাদের জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় হারে উষ্ণতা এবং অনুকূল পরিবেশ ও মওসুম লাভ করতে পারে।

এ চারটি বড় বড় কার্যকারণ (যেগুলো মূলগতভাবে অসংখ্য আনুষংগিক কার্যকারণের সমষ্টি) সৃষ্টি করে দেয়ার পর উদ্ভিদের অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভবপর হয়। তারপর এ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবার পর উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের বীজ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যার ফলে যখনই তা উপযোগী জমি, পানি, বাতাস ও মওসুমের সংস্পর্শে আসে তখনই তার মধ্যে উদ্ভিদ সুলভ জীবনের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। এছাড়াও এ বীজের মধ্যে এমন ব্যবস্থাও করে দেয়া হয়েছে যার ফলে প্রত্যেক উদ্ভিদ প্রজাতির বীজ থেকে অনিবার্যভাবে একই প্রজাতির চারা তার যাবতীয় শ্রেণী স্বাতন্ত্র ও উত্তরাধিকার বৈশিষ্ট সহকারে জন্ম নেয়। এর ওপর বাড়তি যে সৃজন কুশলতার অবতারণা করা হয় তা হচ্ছে এই যে, দশ–বিশ বা পঞ্চাশ শ্রেণীর নয় বরং অসংখ্য শ্রেণীর উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় এবং সেগুলোকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যার ফলে তারা অসংখ্য শ্রেণীর পশু ও মানবকূলের খাদ্য, ঔষুধ, পোশাক ও অন্যান্য অগণিত প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম হয়, উদ্ভিদের পরে পৃথিবীর বুকে এ প্রয়োজনগুলো অস্তিত্বলাভের অপেক্ষায় ছিল।

এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ব্যক্তিই চিন্তা করবে সে যদি হঠকারিতা ও সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতির শিকার না হয় তাহলে তার অন্তর সাক্ষ দেবে, এসব কিছু আপনা–আপনি হতে পারে না। এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে একটি জ্ঞানদীপ্ত পরিকল্পনা কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে মওসুমের সম্পর্ক উদ্ভিদের সাথে এবং উদ্ভিদের সম্পর্ক জীব জন্তু ও মানুষের প্রয়োজনের সাথে চরম স্পর্শকাতরতা ও সূক্ষতা বজায় রেখে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কোন বুদ্ধি–বিবেকবান মানুষ ধারণা করতে পারে না এ ধরনের সর্বব্যাপী সম্পর্ক নিছক ঘটনাক্রমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তারপর এ ব্যবস্থাপনা আবার একথাও প্রমাণ করে যে,

এটি বহু প্রভুর কৃতিত্ব হতে পারে না। এটি এমন একজন মাত্র ইলাহর ব্যবস্থাধীনে সম্পাদিত হচ্ছে এবং হতে পারে যিনি মাটি, বাতাস, পানি, সূর্য, উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানব জাতি সবার স্রষ্টা ও রব। এদের প্রত্যেকের প্রভু যদি আলাদা আলাদা হতো তাহলে কেমন করে এমনি ধরনের একটি সর্বব্যাপী ও গভীর জ্ঞানময় সম্পর্ক রক্ষাকারী পরিকল্পনা তৈরি হয়ে যাওয়ার এবং লাখো-লাখো কোটি-কোটি বছর পর্যন্ত এমন সুশৃংখলভাবে যথানিয়মে পরিচালিত হবার কথা কল্পনা করা যেতে পারে।

তাওহীদের সপক্ষে এ যুক্তি পেশ করার পর মহান আল্লাহ বলেন ঃ أَفَلَا يَشْكُرُونَ অর্থাৎ এরা কি এমনই অকৃতজ্ঞ ও নিমকহারাম হয়ে গেছে যে, যে আল্লাহ এদের জীবনের জন্য এ সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করে দিয়েছেন এরা তাঁর শোকরগুজারী করে না এবং তাঁর নিয়ামতগুলো উদরস্থ করে অন্যের শোকরগুজারী করে? তাঁর সামনে মাথা নত করে না এবং তাদের জন্য যে মিথ্যা উপাস্যরা একটি ঘাসও সৃষ্টি করেনি তাদের সামনে মাথা নত করে ষষ্ঠাংগ প্রণিপাত করে?

৩০. অর্থাৎ সব রকমের দোষ-ত্রুটির আবিলতামুক্ত, সব রকমের দুর্বলতা ও ভ্রান্তির উর্ধে তাঁর কোন শরীক ও ভাগীদার আছে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশই নেই। মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাস খণ্ডন করে সাধারণভাবে কুরআন মজীদে এ শব্দগুলো এ জন্য ব্যবহার করা হয় যে, শিরকের প্রতিটি আকীদা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর প্রতি কোন না কোন দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা ও ভ্রান্তির অপবাদ। আল্লাহর জন্য শরীক নির্ধারণ করার অর্থই হচ্ছে এই যে, এ ধরনের কথা যে বলে সে আসলে মনে করে, আল্লাহ একা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব পরিচালনার যোগ্যতা রাখেন না অথবা তিনি নিজে তাঁর প্রভুত্বের কর্তৃত্ব পরিচালনায় কাউকে শরীক করতে বাধ্য কিংবা অন্য কতিপয় সত্তা আপনা আপনিই এত বেশী শক্তির অধিকারী হয়ে গেছে যে, তারা প্রভুত্বের ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করছে এবং আল্লাহ তাদের হস্তক্ষেপ বরদাশ্‌ত করছেন অথবা নাউযুবিল্লাহ তিনি মানব বংশজাত রাজা-বাদশাহদের মতো দুর্বলতার অধিকারী, যে কারণে মন্ত্রী, পারিষদবর্গ, মোসাহেব ও প্রিয় শাহজাদা ও শাহজাদীদের একটি বিরাট দলের দ্বারা তিনি ঘেরাও হয়ে আছেন এবং আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের বহু ক্ষমতা তাদের মধ্যে বন্টিত হয়ে গেছে। আল্লাহ সম্পর্কে এ জাহেলী ধ্যান-ধারণা যদি চিন্তা-চেতনার সাথে সম্পৃক্ত না থাকতো, তাহলে আদতে শিরকের চিন্তার জন্মই হতে পারতো না। তাই কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, মুশরিকরা আল্লাহর সাথে যেসব দোষ, অভাব ও দুর্বলতা সম্পৃক্ত করে, আল্লাহ তা থেকে মুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র।

৩১. এটি তাওহীদের সপক্ষে আরো একটি যুক্তি। এখানে আবার পূর্ব থেকে উপস্থিত সত্যগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটিকে নিয়ে একথা বলা হচ্ছে যে, দিনরাত তোমরা যেসব জিনিস স্বচক্ষে দেখে চলছো এবং কোনপ্রকার ভাবনা-চিন্তা না করেই এমনিই সামনের দিকে এগিয়ে চলে যেতে থাকো সেগুলোর মধ্যেই সত্যের সন্ধান দেবার মতো নিদর্শনাবলী রয়ে গেছে। নারী ও পুরুষের জুটি তো মানুষের নিজের জন্মের উৎস। জীব-জন্তুর বংশধারাও পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় পশুর মিলনের সাহায্যেই এগিয়ে চলছে। উদ্ভিদ সম্পর্কেও মানুষ জানে, তাদের মধ্যে বিপরীত লিংগের জুড়ি বাঁধার নীতি কার্যকর রয়েছে। এমনকি নিষ্প্রাণ জড় বস্তুর মধ্যেও দেখা যায় বিভিন্ন বস্তু যখন একটা অন্যটার সাথে যুথবদ্ধ হয় তখনই

وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ
تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ
حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

এদের জন্য রাত হচ্ছে আর একটি নিদর্শন। আমি তার উপর থেকে দিনকে সরিয়ে দেই তখন এদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়।[৩২] আর সূর্য, সে তার নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে ধেয়ে চলছে।[৩৩] এটি প্রবল পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার নিয়ন্ত্রিত হিসেব। আর চাঁদ, তার জন্য আমি মন্‌যিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, সেগুলো অতিক্রম করে সে শেষ পর্যন্ত আবার খেজুরের শুকনো ডালের মতো হয়ে যায়।[৩৪] না সূর্যের ক্ষমতা আছে চাঁদকে ধরে ফেলে[৩৫] এবং না রাত দিনের ওপর অগ্রবর্তী হতে পারে,[৩৬] সবাই এক একটি কক্ষপথে সন্তরণ করছে।[৩৭]

তাদের থেকে নানা প্রকার যৌগিক পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করে। স্বয়ং পদার্থের মৌলিক গঠন ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বৈদ্যুতিক শক্তির সংযোগেই সম্পন্ন হয়েছে। এ যূথিবদ্ধতা, যার মাধ্যমে এ সমগ্র বিশ্ব-জাহান অস্তিত্ব লাভ করেছে, প্রজ্ঞা ও সৃষ্টি কুশলতার এমন সব সূক্ষ্মতা ও জটিলতার অধিকারী এবং তার মধ্যে প্রতিটি জোড়ায় সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের মধ্যে এমনসব সম্পর্ক পাওয়া যায়, যার ফলে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী কোন ব্যক্তি এ জিনিসটিকে একটি আকস্মিক ঘটনাচক্র বলতে পারেন না। আবার একথা মেনেও নিতে পারেন না যে, বিভিন্ন ইলাহ এসব অসংখ্য জোট সৃষ্টি করে এদের মধ্যে এ ধরনের বুদ্ধিমত্তা সহকারে জুড়ি বেঁধে দিয়ে থাকবেন। পুরুষ ও স্ত্রীর পরস্পরের জুড়ি হওয়া এবং তাদের জুড়ি হবার ফলে নতুন জিনিসের সৃষ্টি হওয়া স্বয়ং স্রষ্টার একত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৩২. দিন-রাত্রির আসা-যাওয়াও পূর্ব থেকে উপস্থিত সত্যগুলোর অন্যতম। স্বাভাবিকভাবে দুনিয়ায় এগুলো নিয়মিত ঘটে চলছে বলে নিছক এ জন্য মানুষ এগুলোর প্রতি মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। অথচ যদি দিন কেমন করে আসে, রাত কেমন করে অতিবাহিত হয় এবং দিনের চলে যাওয়ার ও রাতের ফিরে আসার মধ্যে কি কি বিজ্ঞতা ও কৌশল সক্রিয় রয়েছে সে সম্পর্কে সে চিন্তা-ভাবনা করতো তাহলে নিজেই অনুভব করতো যে, এটি একজন শক্তিশালী ও জ্ঞানবান রবের অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ। পৃথিবীর সামনে থেকে সূর্যের সরে না যাওয়া পর্যন্ত কখনো দিনের বিদায় ও রাতের আগমন হতে পারে না। দিনের সরে যাওয়া এবং রাতের আগমনের মধ্যে যে চরম নিয়মানুবর্তিতা পাওয়া যায় তা সূর্য ও পৃথিবীকে একই অপরিবর্তনশীল বিধানের আওতায় আবদ্ধ না রেখে সম্ভবপর ছিল না। তারপর এ রাত ও দিনের আসা-যাওয়ার যে

গভীর সম্পর্ক পৃথিবীর সৃষ্ট জীবকুলের সাথে পাওয়া যায় তা পরিষ্কারভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, চরম বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা সহকারে কোন সত্তা ইচ্ছাকৃতভাবেই এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পৃথিবীর বুকে মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব, বরং এখানে পানি, হাওয়া ও বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের অস্তিত্বও আসলে পৃথিবীকে সূর্য থেকে একটি বিশেষ দূরত্বে অবস্থান করাবার এবং তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের একটি ধারাবাহিকতা সহকারে নির্ধারিত বিরতির পর সূর্যের সামনে আসার এবং তার সামনে থেকে সরে যেতে থাকার ফল। যদি পৃথিবীর দূরত্ব সূর্য থেকে খুব কম বা বেশী হতো অথবা তার এক অংশে সবসময় রাত ও অন্য অংশে সব সময় দিন থাকতো কিংবা দিন–রাত্রির পরিবর্তন অতি দ্রুত বা অতি শ্লথ গতিতে হতো অথবা নিয়ম বহির্ভূতভাবে হঠাৎ কখনো দিনের উদয় হতো আবার কখনো রাত ঢেকে ফেলতো, তাহলে এ পৃথিবীতে কোন জীবনের অস্তিত্ব লাভ সম্ভবপর হতো না। শুধু তাই নয় বরং এ অবস্থায় নিষ্প্রাণ পদার্থসমূহের আকার–আকৃতিও তাদের বর্তমান আকৃতি থেকে ভিন্নতর হতো। অন্তরের চোখ যদি বন্ধ করে না রাখা হয়, তাহলে মানুষ এ ব্যবস্থার মধ্যে এমন এক আল্লাহর কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করতে পারে যিনি এ পৃথিবীর বুকে এ বিশেষ ধরনের সৃষ্ট জীবকুলকে অস্তিত্ব দান করার সংকল্প করেন এবং তাদের যথাযথ প্রয়োজন অনুসারে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন। আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব যদি কোন ব্যক্তির দৃষ্টিতে বুদ্ধি বিরোধী হয়ে থাকে তাহলে সে নিজেই চিন্তা করে বলুক, এ কলাকৌশলকে বহু ইলাহর সাথে সংশ্লিষ্ট করা অথবা কোন অন্ধ ও বধির প্রাকৃতিক আইনের আওতায় আপনা–আপনিই এসব কিছু হয়ে গেছে বলে মনে করা কতদূর বুদ্ধি বিরোধী হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই শুধুমাত্র আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে একেবারেই অযৌক্তিক এ শেষোক্ত ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারে, সে যখন বলে, বিশ্ব–জাহানে আইন–শৃংখলা, জ্ঞান–প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্যমুখিনতার সন্ধান পাওয়া আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়, তখন আমাদের জন্য একথা মেনে নেয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় যে, যথার্থই এ ব্যক্তি কোন মতবাদ বা বিশ্বাসকে স্বীকার করে নেবার জন্য কোন পর্যায়েরও যথেষ্ট বা অযথেষ্ট যৌক্তিক সাক্ষ–প্রমাণের প্রয়োজন অনুভব করে।

৩৩. অবস্থান বলতে এমন জায়গাও বুঝানো যেতে পারে যেখানে গিয়ে সূর্যকে সবশেষে থেমে যেতে ও অবস্থান গ্রহণ করতে হবে আবার এমন সময়ও হতে পারে যখন সে থেমে যাবে। এ আয়াতের সঠিক অর্থ মানুষ তখনই নির্ধারণ করতে পারে যখন বিশ্ব–জাহানের নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে সে সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তা প্রত্যেক যুগে পরিবর্তনশীল ছিল এবং বর্তমানে বাহ্যত সে যা কিছু জানে যে কোন সময় তা পরিবর্তিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাচীন যুগের লোকেরা তাদের চাক্ষুষ দর্শনের ভিত্তিতে সূর্য সম্পর্কে এ নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করতো যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। তারপর আরো গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পরে এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এবং সৌর জগতের গ্রহসমূহ তার চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু এ মতবাদও স্থায়ী প্রমাণিত হয়নি। পরবর্তীকালের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবলমাত্র সূর্যই নয় বরং সমস্ত তারকারাজি, যাদেরকে অনড় (Fixed Stars) মনে করা হতো, একদিকে ছুটে চলছে। তাদের চলার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১০ থেকে ১০০ মাইল বলে অনুমান করা হয়েছে। আর

আধুনিক আকাশ বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণ সূর্য সম্পর্কে বলেন যে, সে তার সমগ্র সৌরজগত নিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ২০ কিলোমিটার (অর্থাৎ প্রায় ১২ মাইল) গতিতে এগিয়ে চলছে। (দেখুন ইন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, 'ষ্টার' ও 'সান' শব্দ)

৩৪. অর্থাৎ মাসের মধ্যে চাঁদের আবর্তন প্রতিদিন পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম দিন সে 'হেলাল' আকারে উদিত হয়। তারপর প্রতিদিন তার দেহ বড় হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চতুর্দশীর রাতে সে পূর্ণ চন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। তারপর প্রতিদিন তার দেহ হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত আবার হেলালের আকারে ফিরে আসে। লাখো–লাখো বছর থেকে এ প্রক্রিয়া চলছে। এবং চাঁদের এ নির্ধারিত মন্‌যিলগুলো পরিভ্রমণের মধ্যে কখনো কোন ব্যতিক্রম দেখা দেয়নি। এ কারণে মানুষ হিসেব করে সবসময় বলতে পারে চাঁদ কোন্‌ দিন কোন্‌ মন্‌যিলে থাকবে। চাঁদের আবর্তন যদি কোন নিয়মের অধীন না হতো, তাহলে এ ধরনের হিসেব করা সম্ভব হতো না।

৩৫. এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে এবং দু'টি অর্থই সঠিক। একটি হচ্ছে, চাঁদকে ধরে নিজের দিকে টেনে নেবার অথবা তার গতিপথে প্রবেশ করে তার সাথে সংঘাত বাধাবার ক্ষমতা সূর্যের নেই। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, চাঁদের উদয়ের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে সূর্য কখনো তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। রাতে চাঁদ আকাশে আলো ছড়াচ্ছে এ সময় হঠাৎ দিগন্তে সূর্যের উদয় সম্ভব নয়।

৩৬. অর্থাৎ দিনের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাবার আগে কখনো রাত এসে যাওয়া এবং দিনের আলোর জন্য যে সময় নির্ধারিত রয়েছে তার মধ্যে অকস্মাত নিজের অন্ধকার নিয়ে তার উপস্থিত হওয়া কখনো সম্ভব নয়।

৩৭. মূলে "ফালাক" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় "ফালাক" মানে গ্রহ–নক্ষত্রের কক্ষপথ (Orbit) এবং এর অর্থ আকাশের অর্থ থেকে ভিন্ন। "সবাই একটি কক্ষপথে সাঁতরাচ্ছে" এ উক্তি চারিটি সত্যের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করছে। এক, কেবলমাত্র সূর্য ও চন্দ্র নয় বরং সমস্ত তারকা ও গ্রহ এবং সমগ্র আকাশ জগত আবর্তন করছে। দুই, এদের প্রত্যেকের আকাশ অর্থাৎ প্রত্যেকের আবর্তন পথ বা কক্ষপথ আলাদা। তিন, আকাশসমূহ তারকারাজিকে নিয়ে আবর্তন করছে না বরং তারকারাজি আকাশসমূহে আবর্তন করছে। চার, আকাশসমূহে তারকাদের আবর্তন এমনভাবে হচ্ছে যেমন কোন তরল পদার্থে কোন জিনিস ভেসে চলে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা এ আয়াতগুলোর মূল উদ্দেশ্য নয় বরং মানুষকে একথা বুঝানোই এর উদ্দেশ্য যে, যদি সে চোখ মেলে তাকায় এবং নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করে তাহলে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত যেদিকেই তাকাবে সেদিকেই তার সামনে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বের অসংখ্য ও অগণিত যুক্তি–প্রমাণের সমাবেশ দেখতে পাবে। এ অবস্থায় সে কোথাও নাস্তিক্যবাদ ও শিরকের সপক্ষে একটি যুক্তি–প্রমাণও পাবে না। আমাদের এ পৃথিবী যে সৌরজগতের (Solar System) অন্তরভুক্ত তার বিশালত্বের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার কেন্দ্রীয় সূর্যটি পৃথিবীর তিন লক্ষ গুণ বড় এবং তার সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ নেপচুনের দূরত্ব সূর্য থেকে কমপক্ষে ২শ' ৭৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। বরং যদি প্লুটোকে দূরবর্তী গ্রহ ধরা হয় তাহলে সূর্য থেকে তার দূরত্ব ৪শ' ৬০ কোটি মাইলে গিয়ে

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾

এদের জন্য এটিও একটি নিদর্শন যে, আমি এদের বংশধরদেরকে ভরা নৌকায় চড়িয়ে দিয়েছি[৩৮] এবং তারপর এদের জন্য ঠিক তেমনি আরো নৌযান সৃষ্টি করেছি যেগুলোতে এরা আরোহণ করে।[৩৯] আমি চাইলে এদেরকে ডুবিয়ে দেই, এদের কোন ফরিয়াদ শ্রবণকারী থাকবে না এবং কোনভাবেই এদেরকে বাঁচানো যেতে পারে না। ব্যস, আমার রহমতই এদেরকে কূলে ভিড়িয়ে দেয় এবং একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত জীবনের দ্বারা লাভবান হবার সুযোগ দিয়ে থাকে।[৪০]

পৌছে। এ বিশালত্ব সত্ত্বেও এ সৌরজগত একটি বিরাট বিশাল ছায়াপথের নিছক একটি ছোট অংশ মাত্র। আমাদের এ সৌরজগত যে ছায়াপথটির (Galaxy) অন্তরভুক্ত তার মধ্যে প্রায় ৩ হাজার মিলিয়ন (৩শ' কোটি) সূর্য রয়েছে এবং তার নিকটবর্তী সূর্যটি আমাদের পৃথিবী থেকে এত দূরে অবস্থান করছে যে, তার আলো এখানে পৌছুতে ৪ বছর সময় লাগে। তারপর এ ছায়াপথই সমগ্র বিশ্ব-জাহান নয়। বরং এতদিনকার পর্যবেক্ষণ থেকে অনুমান করা হয়েছে যে, প্রায় ২০ লক্ষ নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে এটিও একটি এবং এদের নিকটতম নীহারিকা আমাদের থেকে এত বেশী দূরত্বে অবস্থিত যে, তার আলো আমাদের পৃথিবীতে পৌছুতে ১০ লক্ষ বছর লাগে। আর আমাদের অত্যাধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সবচেয়ে দূরের যে নীহারিকা দৃষ্টিগোচর হয় তার আলো দুনিয়ায় পৌছতে ১০ কোটি বছর লাগে। এরপরও মানুষ সমগ্র বিশ্ব-জাহান দেখে নিয়েছে, একথা বলা যায় না। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের সামান্যতম অংশমাত্র এতদিন পর্যন্ত মানুষ পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছে। সামনের দিকে আরো অত্যাধুনিক পর্যবেক্ষণ উপকরণ উদ্ভাবিত ও সংগৃহিত হলে আরো কতো ব্যাপকতা মানুষের সামনে উন্মুক্ত হবে তা বলা সম্ভব নয়।

বিশ্ব-জাহান সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয়, আমাদের এ ক্ষুদ্র পৃথিবীটি যেসব উপাদানে গঠিত এ সমগ্র বিশ্ব-জাহান সে একই উপাদানে গঠিত হয়েছে এবং এর মধ্যে আমাদের পৃথিবীর মতো একই নিয়ম সক্রিয় রয়েছে। নয়তো এ পৃথিবীতে বসে আমরা যে অতি দূরবর্তী বিশ্বগুলো পর্যবেক্ষণ করছি, তাদের দূরত্ব পরিমাপ করছি এবং তাদের গতির হিসেব কষছি এসব কোনক্রমেই সম্ভবপর হতো না। এসব কি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, এ সমস্ত বিশ্ব-জাহান একই আল্লাহর সৃষ্টি এবং একই শাসকের রাজ্য? তারপর যে নিয়ম-শৃংখলা, প্রজ্ঞা-কলাকৌশল, দক্ষতা-শিল্পকারিতা ও সম্পর্ক-সম্বন্ধ এসব লাখো লাখো ছায়াপথ ও তাদের মধ্যে সঞ্চরণশীল শত শত কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে পাওয়া যায় তা দেখে কি

কোন বুদ্ধিমান মানুষ একথা কল্পনা করতে পারে যে, এসব কিছু আপনা–আপনিই হয়ে গেছে? এ নিয়ম–শৃংখলার পেছনে কি কোন ব্যবস্থাপক, এ কলা–কৌশলের পেছনে কোন জ্ঞানী কৌশলী, এ শিল্পকর্মের পেছনে কোন শিল্পী এবং এ সমন্বয় ও সম্পর্কের পেছনে কোন পরিকল্পনাকারী নেই?

৩৮. ভরা নৌযান মানে নূহ আলাইহিস সালামের নৌযান। আর মানব বংশধরদেরকে তাতে আরোহণ করিয়ে দেবার অর্থ হচ্ছে এই যে, এ নৌযানে বাহ্যত হযরত নূহের কয়েকজন সাথীই বসেছিলেন ঠিকই কিন্তু আসলে তাতে আরোহণ করেছিল কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভকারী সমস্ত মানুষ। কারণ নূহের তূফানে তাদেরকে ছাড়া বাকি সমস্ত মানুষকে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল এবং পরবর্তী মানব বংশধারা এ নৌযান আরোহীদের থেকে শুরু হয়েছিল।

৩৯. এ থেকে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, ইতিহাসে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নৌকাটিই ছিল প্রথম নৌকা। এর পূর্বে নদী ও সাগর পার হবার কোন উপায় মানুষ জানতো না। মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম হযরত নূহকে (আ) এ উপায়টি শেখান। তাঁর তৈরি করা নৌকায় চড়ে যখন আল্লাহর কিছু বান্দা প্লাবন ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে রক্ষা পায় তখন পরবর্তীকালে তাদের বংশধররা সামুদ্রিক সফরের জন্য নৌযান তৈরি করতে থাকে।

৪০. আগের নিদর্শনগুলো উল্লেখ করা হয়েছিল তাওহীদের সপক্ষে যুক্তি–প্রমাণ হিসেবে, আর এখানে এ নিদর্শনটির উল্লেখ করা হয়েছে এ ধারণা দান করার জন্য যে, প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করার যে ক্ষমতাও মানুষকে দেয়া হয়েছে তা সবই আল্লাহ প্রদত্ত, মানুষ নিজেই সেগুলো অর্জন করেনি। আর এ শক্তিগুলো ব্যবহার করার যে পদ্ধতি সে উদ্ভাবন করেছে তাও আল্লাহর পথনির্দেশনার মাধ্যমেই তার জ্ঞানের আওতাধীন হয়েছে, এগুলো তার নিজের উদ্ভাবন নয়। নিজ শক্তিতে এ বিশাল শক্তিগুলোকে বিজিত করার ক্ষমতা মানুষের ছিল না। প্রকৃতির রহস্য সন্ধান করা এবং তার শক্তিগুলোকে কাজে লাগাবার যোগ্যতাও তার ছিল না, তারপর যে শক্তিগুলোর ওপর আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ আল্লাহ তাদেরকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। অন্যথায় আল্লাহর ইচ্ছা যখন ভিন্নতর হয় তখন যেসব শক্তি মানুষের সেবা করে চলছিল সেগুলো অকস্মাত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মানুষ নিজেকে তাদের সামনে সম্পূর্ণ অসহায় দেখতে পায়। এ সত্যটি সম্পর্কে সজাগ করার জন্য আল্লাহ সামুদ্রিক সফরের ব্যাপারটিকে নিছক নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন। আল্লাহ হযরত নূহকে যদি নৌকা তৈরি করার পদ্ধতি না শিখিয়ে দিতেন এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তারা তাতে আরোহণ না করতো তাহলে প্লাবনে সমগ্র মানব জাতি ধ্বংস হয়ে যেতো। তারপর আল্লাহর কাছ থেকে নৌকা নির্মাণের কায়দা–কানুন শিখে নিয়ে লোকেরা নদী ও সাগর অতিক্রম করার যোগ্যতা অর্জন করে। এর ফলে মানব জাতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়। কিন্তু এ প্রথম পর্ব থেকে আজকের বিশাল আকার জাহাজ নির্মাণ পর্যন্ত মানুষ যতদূর উন্নতি সাধন করেছে এবং নৌযান পরিচালনার ক্ষেত্রে

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

এদেরকে যখন বলা হয়, তোমাদের সামনে যে পরিণাম আসছে এবং যা তোমাদের পেছনে অতিক্রান্ত হয়েছে তার হাত থেকে বাঁচো,[৪১] হয়তো তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে (তখন এরা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়)। এদের সামনে এদের রবের আয়াতসমূহের মধ্য থেকে যে আয়াতই আসে এরা সেদিকে দৃষ্টি দেয় না।[৪২] এবং যখন এদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দান করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু আল্লাহর পথে খরচ করো তখন এসব কুফরীতে লিপ্ত লোক মু'মিনদেরকে জবাব দেয়, "আমরা কি তাদেরকে খাওয়াবো, যাদেরকে আল্লাহ চাইলে নিজেই খাওয়াতেন? তোমরা তো পরিষ্কার বিভ্রান্তির শিকার হয়েছো।"[৪৩]

যতটুকুই নিপুণতা ও দক্ষতা অর্জন করেছে তা সত্ত্বেও সে এ দাবী করতে পারে না যে, নদী ও সাগর সবই তার নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে এবং তাদের ওপর সে পুরোপুরি বিজয় লাভ করেছে। আজো আল্লাহর পানি আল্লাহরই কুদরতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং যখনই তিনি চান মানুষকে তার জাহাজসহ তার বুকে ডুবিয়ে দেন।

৪১. অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা যা দেখেছে।

৪২. আয়াত বলতে আল্লাহর কিতাবের আয়াতই বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষকে উপদেশ দেয়া হয় আবার এমন নিদর্শনাবলীও বুঝানো হয়েছে যেগুলো প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ও মানুষের নিজের অস্তিত্ব ও তার ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায়। এসব মানুষকে শিক্ষা দান করে। তবে এ জন্য অবশ্যই মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করার মানসিকতা থাকা জরুরী।

৪৩. এর মাধ্যমে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, কুফরী কেবল তাদের দৃষ্টিশক্তিকেই অন্ধ করে দেয়নি বরং তাদের নৈতিক অনুভূতিকেও নির্জীব করে দিয়েছে। তারা আল্লাহর ব্যাপারেও সঠিক চিন্তা–ভাবনা করে না এবং আল্লাহর সৃষ্টির সাথেও যথার্থ ব্যবহার করে না। তাদের কাছে রয়েছে প্রত্যেক উপদেশের উল্টা জবাব। প্রত্যেক পথভ্রষ্টতা ও অসদাচরণের জন্য একটি বিপরীত দর্শন। প্রত্যেক সৎকাজ থেকে দূরে থাকার জন্য একটি মনগড়া বাহানা তাদের কাছে তো রয়েছেই।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

এরা[৪৪] বলে, "এ কিয়ামতের হুমকি কবে পুরা হবে? বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?"[৪৫] আসলে এরা যে জিনিসের দিকে তাকিয়ে আছে তা তো একটি বিস্ফোরণের শব্দ, য সহসা এদেরকে ঠিক এমন অবস্থায় ধরে ফেলবে যখন এরা (নিজেদের পার্থিব ব্যাপারে) বিবাদ করতে থাকবে এবং সে সময় এরা কোন অসিয়াতও করতে পারবে না এবং নিজেদের গৃহেও ফিরতে পারবে না।[৪৬]

৪৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যে তাওহীদের পরে আর যে বিষয়টি নিয়ে বিরোধ চলছিল সেটি ছিল আখেরাত। এ সম্পর্কিত বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি অবশ্যই সামনের দিকে আলোচনার শেষ পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু যুক্তি উপস্থাপনের পূর্বে এখানে এ বিষয়টির ভিত্তিতে তাদের সামনে আখেরাতের একটি শিক্ষণীয় চিত্র অংকন করা হয়েছে। এর ফলে তারা জানতে পারবে, যে বিষয়টি তারা অস্বীকার করছে তা তাদের অস্বীকার করার ফলে মূলতবী হয়ে যাবে না বরং অনিবার্যভাবে একদিন তাদের এসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হবেই।

৪৫. এ প্রশ্নের অর্থ এ ছিল না যে, যথার্থই তারা কিয়ামতের আসার তারিখ জানতে চায় এবং যদি তাদেরকে জানানো হতো, অমুক বছরের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিয়ামত হবে তাহলে তাদের সন্দেহ দূর হয়ে যেতো এবং তারা তা মেনে নিতো। আসলে এ ধরনের প্রশ্ন তারা করতো নিছক চ্যালেঞ্জের ঢংয়ে কূটতর্ক করার জন্য। এ ব্যাপারে তারা একথা বলতে চাচ্ছিল যে, কোন কিয়ামত টিয়ামত হবে না, তোমরা খামখা আমাদের ভয় দেখাচ্ছো। এ কারণে তাদের জবাবে বলা হয়নি, কিয়ামত অমুক দিন আসবে বরং তাদেরকে বলা হয়েছে, তা আসবে এবং প্রচণ্ড শক্তিতে আসবে।

৪৬. অর্থাৎ কিয়ামত আস্তে আস্তে ধীরে-সুস্থে আসবে এবং লোকেরা তাকে আসতে দেখবে, এমনটি হবে না। বরং তা এমনভাবে আসবে যখন লোকেরা পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে নিজেদের কাজ কারবারে মশগুল থাকবে এবং তাদের মনের ক্ষুদ্রতম কোণেও এ চিন্তা জাগবে না যে, দুনিয়ার শেষ সময় এসে গেছে। এ অবস্থায় অকস্মাত একটি বিরাট বিস্ফোরণ ঘটবে এবং যে যেখানে থাকবে সেখানেই খতম হয়ে যাবে।

হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ও হযরত আবু হুরাইরার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ লোকেরা পথে চলাফেরা করবে, বাজারে কেনাবেচা করতে থাকবে, নিজেদের মজলিসে বসে আলাপ আলোচনা করতে থাকবে, এমন সময় হঠাৎ শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। কেউ কাপড়

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ۝٥١ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۝٥٢ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝٥٣ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٥٤ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ۝٥٥

৪ রুকূ'

—তারপর একটি শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সহসা তারা নিজেদের রবের সামনে হাজির হবার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে পড়বে।[৪৭] ভীত হয়ে বলবে, "আরে, কে আমাদেরকে আমাদের নিঁদমহল থেকে উঠিয়ে দাঁড় করালো?"[৪৮]

—"এটা সে জিনিস যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং রসূলদের কথা সত্য ছিল।"[৪৯] একটিমাত্র প্রচণ্ড আওয়াজ হবে এবং সবকিছু আমার সামনে হাজির করে দেয়া হবে।

আজ কারো[৫০] প্রতি তিলমাত্র জুলুম করা হবে না এবং যেমন কাজ তোমরা করে এসেছ ঠিক তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে—জান্নাতীরা আজ আনন্দে মশগুল রয়েছে।[৫১]

কিনছিল। হাত থেকে রেখে দেবার সময়টুকু পাবে না, সে শেষ হয়ে যাবে। কেউ নিজের পশুগুলোকে পানি পান করাবার জন্য জলাধার ভর্তি করবে এবং তখনো পানি পান করানো শুরু করবে না তার আগেই কিয়ামত হয়ে যাবে। কেউ খাবার খেতে বসবে এবং এক গ্রাস খাবার মুখ পর্যন্ত নিয়ে যাবার সুযোগও পাবে না।

৪৭. শিংগা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা, ৭৮ টীকা। শিংগার প্রথম ফুঁৎকার ও দ্বিতীয় ফুঁৎকারের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান হবে, এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন তথ্য নেই। এ সময়টা শত শত ও হাজার হাজার বছর দীর্ঘ হতে পারে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ইসরাফীল শিংগায় মুখ লাগিয়ে আরশের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং কখন ফুঁৎকার দেবার হুকুম হয় তার অপেক্ষা করছেন। শিংগায় তিনবার ফুঁক দেয়া হবে। প্রথমটি হবে نفخة الفزع এটি পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত

সৃষ্টিকে হতবিহ্বল করে দেবে। দ্বিতীয়টি হবে نفخة الصعق এটি শোনার সাথে সাথেই সবাই মরে পড়ে যাবে। তারপর যখন একমাত্র ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ থাকবে না তখন পৃথিবীকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দেয়া হবে। উক্কাযের বাজারের সমতল ভূমির মতো তাকে এমনভাবে সমতল করা হবে যে, তার মধ্যে সামান্য একটু ভাঁজও কোথাও পড়ে থাকবে না। তারপর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে একটি বিকট ধমক দেবেন আর তা শুনতেই প্রত্যেক ব্যক্তিই যেখানে সে মরে পড়ে গিয়েছিল সেখানকার পরিবর্তিত জমি থেকেই উঠে দাঁড়াবে। এটিই শেষ ফুঁক বলে পরিচিত। এর নাম হবে نفخة القيام لرب العالمين কুরআন মজীদের বিভিন্ন ইশারা-ইংগিত থেকে এ বিষয়বস্তুটিরই প্রতি সমর্থন পাওয়া গেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম, ৫৬-৫৭ ও সূরা ত্বা-হা, ৮২-৮৩ টীকা।

৪৮. অর্থাৎ তখন তাদের এ অনুভূতিই থাকবে না যে, তারা মরে গিয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে এখন আবার তাদেরকে জীবিত করে উঠানো হয়েছে। বরং তারা এ চিন্তায় মগ্ন থাকবে যে, তারা ঘুমিয়েছিল, এখন হঠাৎ কোন ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণে জেগে উঠেছে এবং ছুটে চলছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা ৭৮ এবং ইবরাহীম, ১৮ টীকা)

৪৯. কে এ জবাব দেবে, তা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। হতে পারে কিছুক্ষণ পরে তারা নিজেরাই বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে এবং মনে মনে বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এ তো সে জিনিসই যার খবর আল্লাহর রসূল আমাদের দিতেন এবং আমরা তাঁকে মিথ্যুক বলতাম। আবার এও হতে পারে, মু'মিনরা তাদের বিভ্রান্তি দূর করে দেবে এবং তাদেরকে জানাবে, এটা ঘুম থেকে জেগে ওঠা নয় বরং মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জীবন। তাছাড়া এও হতে পারে যে, কিয়ামতের সমগ্র পরিবেশ তাদেরকে এ জবাব দেবে অথবা ফেরেশতারা তাদেরকে প্রকৃত অবস্থা জানাবে।

৫০. কাফের, মুশরিক, ফাসেক ও অপরাধীদেরকে যখন আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে তখন আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে এ ভাষণ দেবেন।

৫১. এ বক্তব্য অনুধাবন করার জন্য প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে হাশরের ময়দানে আটকে রাখা হবে না বরং শুরুতেই তাদেরকে কোন প্রকার হিসেব-নিকেশ ছাড়াই অথবা সামান্য হাল্কা হিসেব গ্রহণ করার পর জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কারণ তাদের রেকর্ড হবে পরিষ্কার। আদালত চলাকালীন সময়ে তাদেরকে অপেক্ষা করার কষ্ট বরদাশ্‌ত করার কোন প্রয়োজন হবে না। তাই মহান আল্লাহ হাশরের ময়দানে জবাবদিহিকারী অপরাধীদেরকে বলবেন, দেখো, যেসব সৎলোককে তোমরা দুনিয়ায় বোকা মনে করে বিদ্রূপ করতে তারা নিজেদের বুদ্ধিমত্তার কারণে আজ জান্নাতে বসে আরাম করছে এবং তোমরা যারা নিজেদেরকে অতি বুদ্ধিমান ও চালাক-চতুর মনে করতে তারা আজ দেখো কেমন এখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের অপরাধের জন্য জবাবদিহি করছো।

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ
وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ
أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ
أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾

তারা ও তাদের স্ত্রীরা ঘন ছায়ায় রাজকীয় আসনে হেলান দিয়ে বসে আছে। সবরকমের সুস্বাদু পানাহারের জিনিস তাদের জন্য সেখানে রয়েছে, যা কিছু তারা চাইবে তা তাদের জন্য হাজির রয়েছে। দয়াময় রবের পক্ষ থেকে তাদেরকে "সালাম" বলা হয়েছে —এবং হে অপরাধীরা! আজ তোমরা ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যাও।[৫২] হে আদম সন্তানেরা! আমি কি তোমাদের এ মর্মে হিদায়াত করিনি যে, শয়তানের বন্দেগী করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমারই বন্দেগী করো, এটিই সরল–সঠিক পথ?[৫৩] কিন্তু এ সত্ত্বেও সে তোমাদের মধ্য থেকে বিপুল সংখ্যককে গোমরাহ করে দিয়েছে, তোমাদের কি বুদ্ধি–জ্ঞান নেই?[৫৪] এটা সে জাহান্নাম, যার ভয় তোমাদের দেখানো হতো। দুনিয়ায় যে কুফরী তোমরা করতে থেকেছো তার ফলস্বরূপ আজ এর ইন্ধন হও।

৫২. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, সৎকর্মশীল মু'মিনদের থেকে ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যাও। কারণ দুনিয়ায় তোমরা তাদের সম্প্রদায়, পরিবার ও গোষ্ঠীর অন্তরভুক্ত থাকলে থাকতে পারো, কিন্তু এখানে এখন তোমাদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে আলাদা হয়ে যাও। এখন তোমাদের কোন দল ও জোট থাকতে পারে না। তোমাদের সমস্ত দল ভেঙে দেয়া হয়েছে। তোমাদের সকল প্রকার সম্পর্ক ও আত্মীয়তা খতম করে দেয়া হয়েছে। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এখন একাকী ব্যক্তিগতভাবে নিজের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৫৩. এখানে আবার আল্লাহ "ইবাদাত"কে আনুগত্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। ইতিপূর্বে তাফহীমুল কুরআনে আমি বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি। (দেখুন আল বাকারাহ, ১৭০; আন নিসা, ১৪৫; আল আনআম, ৮৭ ও ১০৭; আত্ তাওবা, ৩১; ইবরাহীম, ৩২;

আল কাহ্‌ফ, ৫০; মারয়াম, ২৭; আল কাসাস, ৮৬ এবং সাবা, ৬৩ টীকা) এ প্রসংগে এ আয়াতটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরে কবীরে যে চমৎকার আলোচনা করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ মানে হচ্ছে لا تطيعوه (তার আনুগত্য করো না)। এর সপক্ষে যুক্তি হচ্ছে, তাকে নিছক সিজদা করাই নিষিদ্ধ নয় বরং তার আনুগত্য করা এবং তার হুকুম মেনে চলাও নিষিদ্ধ। কাজেই আনুগত্য হচ্ছে ইবাদাত। এরপর ইমাম সাহেব এ প্রশ্ন করেছেন, যদি ইবাদাতের অর্থ হয় আনুগত্য তাহলে, أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ আয়াতে আমাদের কি রসূল ও কর্তৃত্বশীলদের ইবাদাত করার হুকুম দেয়া হয়েছে? তারপর এ প্রশ্নের জবাব তিনি এভাবে দিয়েছেন ঃ "তাঁদের আনুগত্য যখন আল্লাহর হুকুমে করা হয় তখন তা আল্লাহরই ইবাদাত এবং তাঁরই আনুগত্য হবে। দেখছেন না, ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুমে আদমকে সিজদা করলো এবং এটি আল্লাহর ছাড়া আর কারো ইবাদাত ছিল না। কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য একমাত্র তখনই তাদের ইবাদাত হতে পারে যখন এমন ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করা হবে যে ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করার হুকুম আল্লাহ দেননি।" তারপর বলেন, "তোমার সামনে যদি কোন লোক আসে এবং তোমাকে কোন জিনিসের হুকুম দেয় তাহলে দেখো তার এ হুকুম আল্লাহর হুকুমের অনুসারী কিনা। অনুসারী না হলে শয়তান সে লোকদের সহযোগী হয়েছে। যদি এ অবস্থায় তুমি তার আনুগত্য করো তাহলে তুমি তার ও তার শয়তানের ইবাদাত করলে। অনুরূপভাবে তোমার নিজের প্রবৃত্তি যদি তোমাকে কোন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে তাহলে এ ক্ষেত্রে শরীয়াতের দৃষ্টিতে সে কাজটি করার অনুমতি আছে কিনা দেখো। অনুমতি না থাকলে তোমার প্রবৃত্তি নিজেই শয়তান হয়ে গেছে অথবা শয়তান তার সহযোগী হয়েছে এ অবস্থায়-যদি তুমি তার আনুগত্য করো তাহলে তুমি তার ইবাদাত করলে।" সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে তিনি আবার বলেছেন, "কিন্তু শয়তানের ইবাদাত করার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কখনো এমন হয়, মানুষ একটি কাজ করে এবং তার অংগ–প্রত্যংগের সাথে সাথে তার কণ্ঠও তার সহযোগী হয় এবং মনও তার সাথে অংশ গ্রহণ করে। আবার কখনো এমনও হয়, অংগ–প্রত্যংগের সাহায্যে মানুষ একটি কাজ করে কিন্তু অন্তর ও কণ্ঠ সে কাজে তার সহযোগী হয় না। কেউ কেউ এমন অবস্থায় একটি গোনাহ করে, যখন তার অন্তর তাতে সায় দেয় না এবং তার কণ্ঠ সে জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, এ অবস্থায় সে স্বীকার করে আমি এ খারাপ কাজ করছি। এ হচ্ছে নিছক বাইরের অংগ–প্রত্যংগের সাহায্যে শয়তানের ইবাদাত। আবার এমন কিছু লোকও আছে যারা ঠাণ্ডা মাথায় অপরাধ করে এবং মুখেও নিজেদের এ কাজে আনন্দ ও সন্তোষ প্রকাশ করে। ....এরা ভিতরে বাইরে উভয় পর্যায়ে শয়তানের ইবাদাতকারী।" (তাফসীরে কবীর, ৭ খণ্ড, ১০৩–১০৪ পৃষ্ঠা)

৫৪. অর্থাৎ যদি তোমরা বুদ্ধি–জ্ঞান বঞ্চিত হতে এবং তারপর নিজেদের রবকে ত্যাগ করে তোমাদের শত্রুদের ইবাদাত করতে তাহলে তোমাদের জন্য কোন ওজরের অবকাশ ছিল না। কিন্তু তোমাদের কাছে তো আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধি–জ্ঞান ছিল! তার মাধ্যমে তোমরা দুনিয়ার সমস্ত কাজ–কারবার করে চলছিলে এবং আল্লাহ তোমাদের পয়গম্বরদের মাধ্যমে সতর্কও করে দিয়েছিলেন। এরপরও যখন তোমরা তোমাদের শত্রুদের প্রতারণা জালে আবদ্ধ হয়েছো এবং তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে তখন নিজেদের বোকামির দায়–দায়িত্ব থেকে তোমরা কোনক্রমেই মুক্ত হতে পারো না।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَاۤءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاۤءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾

আজ আমি এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং এদের পা সাক্ষ দেবে এরা দুনিয়ায় কি উপার্জন করে এসেছে।[৫৫]

আমি চাইলে এদের চোখ বন্ধ করে দিতাম, তখন এরা পথের দিকে চেয়ে দেখতো, কোথা থেকে এরা পথের দেখা পাবে? আমি চাইলে এদের নিজেদের জায়গায়ই এদেরকে এমনভাবে বিকৃত করে রেখে দিতাম যার ফলে এরা না সামনে এগিয়ে যেতে পারতো, না পেছনে ফিরে আসতে পারতো।[৫৬]

৫৫. যে উদ্ধত অপরাধীরা তাদের অপরাধ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলবে এবং আমলনামার নির্ভুলতাও মেনে নেবে না, তাদের ব্যাপারে এ ফায়সালা দেয়া হবে। তখন আল্লাহ হুকুম দেবেন, ঠিক আছে, তোমাদের বাজে কথা বন্ধ করো এবং এখন দেখো তোমাদের নিজেদের শরীরের অংগ–প্রত্যংগ তোমাদের কৃতকর্মের কি বর্ণনা দেয়। এ প্রসংগে এখানে কেবলমাত্র হাত ও পায়ের সাক্ষদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে, তাদের চোখ, কান, জিহ্বা এবং শরীরের চর্মও তাদেরকে দিয়ে যেসব কাজ করানো হয়েছে সেগুলোর পূর্ণ বিবরণ শুনিয়ে দেবে ঃ

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (النور : ٢٤)

حَتّٰى اِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (حم السجده : ٢٠)

এখানে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একদিকে আল্লাহ বলেন, আমি এদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবো এবং অন্যদিকে সূরা নূরের আয়াতে বলেন, এদের কণ্ঠ সাক্ষ দেবে— এ দু'টি বক্তব্যের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যাবে? এর জবাব হচ্ছে, কণ্ঠ রুদ্ধ করার অর্থ হলো, তাদের কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া। অর্থাৎ এরপর তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের মর্জি মাফিক কথা বলতে পারবে না। আর কন্ঠের সাক্ষদানের অর্থ হচ্ছে, পাপিষ্ঠ লোকেরা

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

৫ রুকূ'

যে ব্যক্তিকে আমি দীর্ঘ আয়ু দান করি তার আকৃতিকে আমি একেবারেই বদলে দেই[৫৭] (এ অবস্থা দেখে কি) তাদের বোধোদয় হয় না?

আমি এ (নবী)–কে কবিতা শিখাইনি এবং কাব্য চর্চা তার জন্য শোভনীয়ও নয়।[৫৮] এ তো একটি উপদেশ এবং পরিষ্কার পঠনযোগ্য কিতাব, যাতে সে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতে পারে[৫৯] এবং অস্বীকারকারীদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

তাদেরকে কোন্ কোন্ কাজে লাগিয়েছিল, তাদের মাধ্যমে কেমন সব কুফরী কথা বলেছিল, কোন্ ধরনের মিথ্যা উচ্চারণ করেছিল, কতপ্রকার ফিত্না সৃষ্টি করেছিল এবং কোন্ কোন্ সময় তাদের মাধ্যমে কোন্ কোন্ কথা বলেছিল সেসব বিবরণ তাদের কণ্ঠ স্বতস্ফূর্তভাবে দিয়ে যেতে থাকবে।

৫৬. কিয়ামতের চিত্র অংকন করার পর এখন এদেরকে জানানো হচ্ছে, এ কিয়ামত তো তোমাদের কাছে দূরের জিনিস বলে মনে হচ্ছে কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো, এ দুনিয়ায় যে জীবনের জন্য তোমরা অহংকারে স্ফীত হচ্ছো, তোমরা কিভাবে আল্লাহর বিপুল শক্তির হাতে অসহায় হয়ে আছো! যে চোখের দৃষ্টিশক্তির কারণে তোমরা দুনিয়ার সমস্ত কাজ করে যাচ্ছো আল্লাহর একটিমাত্র ইশারায় তা অন্ধ হয়ে যেতে পারে। যে পায়ের ওপর ভর করে তোমরা এসব দৌড়াদৌড়ি ও চেষ্টা–তদবীর চালাচ্ছো, আল্লাহর একটিমাত্র হুকুমে অকস্মাত তা অবশ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহর দেয়া এ শক্তিগুলো যতক্ষণ কাজ করতে থাকে ততক্ষণ তোমরা আত্মশক্তির বিভ্রমে মশগুল হয়ে থাকো। কিন্তু যখন এদের মধ্য থেকে কোন একটি শক্তিও বিকল হয়ে পড়ে, তখন তোমাদের শক্তির বহর বুঝতে আর তোমাদের মোটেই বেগ পেতে হয় না।

৫৭. আকৃতি বদলে দেয়ার মানে হচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ মানুষের অবস্থা শিশুদের মতো করে দেন। ঠিক শিশুদের মতোই তারা চলতে ফিরতে অক্ষম হয়ে পড়ে। অন্যেরা তাদেরকে উঠাতে বসাতে ও সহায়তা দিয়ে চলাফেরা করাতে থাকে। অন্যেরা তাদেরকে পানাহার করায়। তারা নিজেদের কাপড়ে ও বিছানায় পেশাব পায়খানা করে দেয়। বালসুলভ কথা বলতে থাকে, যা শুনে লোকেরা হেসে ওঠে। মোট কথা যে ধরনের দুর্বলতার মধ্য দিয়ে তারা দুনিয়ার জীবন শুরু করেছিল, জীবন সায়াহ্নে প্রায় সেই একই অবস্থায় পৌঁছে যায়।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

এরা কি দেখে না, আমি নিজের হাতে তৈরি জিনিসের[৬০] মধ্য থেকে এদের জন্য সৃষ্টি করেছি গবাদি পশু এবং এখন এরা তার মালিক। আমি এভাবে তাদেরকে এদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিয়েছি যে, তাদের মধ্য থেকে কারো ওপর এরা সওয়ার হয়, কারো গোশত খায় এবং তাদের মধ্যে এদের জন্য রয়েছে নানা ধরনের উপকারিতা ও পানীয়। এরপর কি এরা কৃতজ্ঞ হয় না?[৬১] এ সবকিছু সত্ত্বেও এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে এবং এদেরকে সাহায্য করা হবে এ আশা করছে। তারা এদের কোন সাহায্য করতে পারে না বরং উল্টো এরা তাদের জন্য সদা প্রস্তুত সৈন্য হয়ে বিরাজ করছে।[৬২] হ্যাঁ, এদের তৈরি কথা যেন তোমাকে মর্মাহত না করে এদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কথাই আমি জানি।[৬৩]

৫৮. কাফেররা তাওহীদ, আখেরাত, মৃত্যুপরের জীবন ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকে নিছক কাব্য কথা গণ্য করে নিজেরা তাকে গুরুত্বহীন করে দেবার যে প্রচেষ্টা চালাতো এখানে তারই জবাব দেয়া হয়েছে।

৫৯. জীবন বলতে চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষ বুঝানো হয়েছে। যার অবস্থা পাথরের মতো নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় নয়। আপনি তার সামনে যতই যুক্তি সহকারে হক ও বাতিলের পার্থক্য বর্ণনা করেন না কেন এবং যতই সহানুভূতি সহকারে তাকে উপদেশ দেন না কেন সে কিছুই শোনে না, বোঝে না এবং নিজের জায়গা থেকে একটুও নড়ে না।

৬০. হাত শব্দটি আল্লাহর জন্যে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ পবিত্র ও মহান আল্লাহ শরীর ও দেহাবয়বের অধিকারী এবং মানুষের মতো হাত দিয়ে কাজ করেন। বরং এর মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, এ জিনিসগুলো আল্লাহ নিজেই তৈরি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিকর্মে অন্য কারো সামান্যতমও অংশ নেই।

৬১. নিয়ামতকে নিয়ামতদাতা ছাড়া অন্য কারো দান মনে করা, এ জন্য অন্য কারো অনুগ্রহভাজন হওয়া এবং নিয়ামতদাতা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে নিয়ামতলাভের আশা করা অথবা নিয়ামত চাওয়া, এ সবকিছুই নিয়ামত অস্বীকারেরই নামান্তর। অনুরূপভাবে নিয়ামতদাতার প্রদত্ত নিয়ামতকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করলেও নিয়ামত অস্বীকার করাই হয়। কাজেই একজন মুশরিক ও কাফের এবং মুনাফিক ও ফাসেক নিছক মুখে ধন্যবাদ শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা গণ্য হতে পারে না। এ জন্তু-জানোয়ারগুলোকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, একথা মেনে নিতে মক্কার কাফেররা অস্বীকার করতো না। তাদের একজনও এগুলোর সৃষ্টির ব্যাপারে অন্য উপাস্যদের হাত আছে বলে দাবী করতো না। কিন্তু এ সবকিছু মেনে নেবার পরও যখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের জন্য নিজেদের উপাস্য দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো, তাদের সামনে নজরানা পেশ করতো এবং আরো নিয়ামত দান করার জন্য তাদের কাছে প্রার্থনা করতো, এ সংগে তাদের জন্য বলিদান করতে থাকতো, তখন আল্লাহর কাছে তাদের মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়তো। এ জন্যই আল্লাহ তাদেরকে নিয়ামত অস্বীকারকারী ও অকৃতজ্ঞ বলে অভিহিত করছেন।

৬২. অর্থাৎ ঐ মিথ্যা উপাস্য দেবতারা নিজেরাই তাদের অস্তিত্ব, টিকে থাকা, সংরক্ষণ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য এসব পূজা উপাসনাকারীর মুখাপেক্ষী। এ সেনাবাহিনী ছাড়া তাদের খোদায়ী এক দিনও চলে না। এরা তাদের সার্বক্ষণিক উপস্থিত দাস। এরা তাদের দরবার বানিয়ে ও সাজিয়ে রাখছে। এরা তাদের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে বেড়াচ্ছে। এরা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের ভক্তে-অনুরক্তে পরিণত করছে। তাদের সমর্থনে এরা ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করছে। তারপরই তাদের খোদায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। নয়তো কেউ তাদের কথা জিজ্ঞেসও করতো না। তারা আসল খোদা নয়। কেউ তাদেরকে মেনে নিক বা না মেনে নিক তারা নিজ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সমগ্র বিশ্ব-জাহানে কর্তৃত্ব চালিয়ে যাবে, এমন ক্ষমতা তাদের নেই।

৬৩. সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। গোপন ও প্রকাশ্য কথা বলে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, মক্কার কাফেরদের বড় বড় সরদাররা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যার ঝড় সৃষ্টি করছিল। তারা ভালোভাবেই জানতো এবং নিজেদের ব্যক্তিগত মজলিসে একথা স্বীকার করতো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তারা যেসব অপবাদ দিচ্ছে সেগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন। তারা লোকদের মনে তাঁর বিরুদ্ধে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য তাঁকে কবি, গণক, যাদুকর, পাগল এবং আরো নাজানি কত কি বলতো। কিন্তু তাদের নিজেদের বিবেক একথা মানতো এবং তারা পরস্পরের সামনে স্বীকারও করতো যে, এসব ডাহা মিথ্যা কথা এবং নিছক তাঁর দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তারা এগুলো তৈরি করছে। তাই আল্লাহ তাঁর নবীকে বলছেন, এদের বাজে কথায় মন খারাপ করো না। যারা মিথ্যা দিয়ে সত্যের মোকাবিলা করে তারা শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়ায়ও ব্যর্থ হবে এবং আখেরাতেও নিজেদের অশুভ পরিণতি দেখে নেবে।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

মানুষ[৬৪] কি দেখে না, তাকে আমি সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে এবং তারপর সে দাঁড়িয়ে গেছে স্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে?[৬৫] এখন সে আমার ওপর উপমা প্রয়োগ করে[৬৬] এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়[৬৭] বলে, "এ হাড়গুলো যখন পচে গলে গেছে এতে আবার প্রাণ সঞ্চার করবে কে?" তাকে বলো, এদেরকে তিনি জীবিত করবেন যিনি প্রথমে এদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি সৃষ্টির প্রত্যেকটি কাজ জানেন। তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা থেকে নিজেদের চুলা জ্বালিয়ে থাকো।[৬৮] যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? কেন নয়, যখন তিনি পারদর্শী স্রষ্টা। তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তাঁর কাজ হয় কেবল এতটুকু যে, তিনি তাকে হুকুম দেন, হয়ে যাও এবং তা হয়ে যায়। পবিত্র তিনি যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

৬৪. এবার কাফেরদের প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক জবাব দেয়া হচ্ছে। ৪৮ আয়াতে এ প্রশ্নটি উদ্ধৃত হয়েছে। "কিয়ামতের হুমকি কবে পূর্ণ হবে" তাদের এ প্রশ্ন এ জন্য ছিল না যে, তারা কিয়ামত আসার তারিখ জানতে চাচ্ছিল বরং এ জন্য ছিল যে, মৃত্যুর পর তারা মানুষদের পুনরবার উঠানোকে অসম্ভব বরং বুদ্ধি বিরোধী মনে করতো। তাই তাদের প্রশ্নের জবাবে আখেরাতের সম্ভাবনার পক্ষে যুক্তি পেশ করা হচ্ছে।

ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ ও সাঈদ ইবনে জুবাইর বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, এ সময় মক্কার কাফের সরদারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি কবরস্তান থেকে কোন লাশের একটি গলিত হাড় নিয়ে আসে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সেটি ভেঙে ফেলে এবং তার বিচূর্ণিত অংশগুলো বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে বলে, "হে মুহাম্মাদ, তুমি বলছো মৃতদেরকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে। বলো, এ পচা–গলা হাড়গুলোকে আবার কে জীবিত করবে?" সংগে–সংগেই এ আয়াতগুলোতে এর জবাব দেয়া হয়।

৬৫. অর্থাৎ এমন শুক্রবিন্দু যার মধ্যে নিছক একটি প্রাথমিক জীবন–কীট ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তাকে উন্নতি দান করে আমি এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছি যার ফলে সে কেবল প্রাণীদের মতো চলাফেরা ও পানাহার করতে থাকেনি বরং এর থেকে অগ্রসর হয়ে তার মধ্যে চেতনা, বুদ্ধি–জ্ঞান এবং তর্ক–বিতর্ক, আলাপ–আলোচনা, যুক্তি প্রদর্শন করা ও বাগ্মীতার এমন সব যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গেছে যা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। এমন কি এখন সে নিজের স্রষ্টাকেও বিদ্রূপ করতে এগিয়ে আসছে।

৬৬. অর্থাৎ আমাকে সৃষ্টিকুলের মতো অক্ষম মনে করে এবং এ ধারণা পোষণ করে যে, মানুষ যেমন কোন মৃতকে জীবিত করতে পারে না ঠিক তেমনি আমিও পারি না।

৬৭. অর্থাৎ একথা ভুলে যায় যে, আমি নিষ্প্রাণ বস্তু থেকে এমন প্রাথমিক জীবন–কীট সৃষ্টি করেছি, যা তার সৃষ্টির উৎসে পরিণত হয়েছে এবং তারপর এ কীটকে লালন করে তাকে এত বড় করে দিয়েছি, যার ফলে সে আজ আমার সামনে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

৬৮. এর অর্থ হচ্ছে, তিনি সবুজ বৃক্ষসমূহে এমন দাহ্যবস্তু রেখে দিয়েছেন যা ব্যবহার করে তোমরা কাঠের সাহায্যে আগুন জ্বালিয়ে থাকো। অথবা এর মাধ্যমে 'মার্‌খ' ও 'আফার' নামক দু'টি গাছের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ গাছ দু'টির কাঁচা ডাল নিয়ে আরবের লোকেরা একটার ওপর আর একটাকে মারতো, ফলে তা থেকে আগুন ঝরে পড়তো। প্রাচীন যুগে গ্রামীণ আরবরা আগুন জ্বালাবার জন্য চকমকি হিসেবে এ ডাল ব্যবহার করতো এবং সম্ভবত আজো করে থাকে।

আস্ সা-ফ্ফা-ত

৩৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতের والصافات শব্দ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বক্তব্য উপস্থাপনা পদ্ধতি থেকে মনে হয়, এ সূরাটি সম্ভবত মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়ে বরং সম্ভবত ঐ মধ্য যুগেরও শেষের দিকে নাযিল হয়। বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, পশ্চাতভূমিতে বিরোধিতা চলছে প্রচণ্ড ধারায় এবং নবী ও তাঁর সাহাবীগণ অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন।

বিষয়বস্তু ও বক্তব্য বিষয়

সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদ ও আখেরাতের দাওয়াতের জবাব দেয়া হচ্ছিল নিকৃষ্ট ধরনের রঙ–তামাসা ও ঠাট্টা–বিদ্রূপের মাধ্যমে। তাঁর রিসালাতের দাবী জোরে–শোরে অস্বীকার করা হচ্ছিল। এ জন্য মক্কার কাফেরদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং শেষে তাদেরকে এ মর্মে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে পয়গম্বরকে আজ তোমরা বিদ্রূপ করছো খুব শিগ্গির তোমাদের চোখের সামনেই তিনি তোমাদের ওপর বিজয় লাভ করবেন এবং তোমরা নিজেরাই আল্লাহর সেনাদলকে তোমাদের গৃহের আঙিনায় প্রবেশ করতে দেখবে। (১৭১–১৭৯ আয়াত) এমন এক সময় এ ঘোষণা দেয়া হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাফল্যের লক্ষণ বহু দূরেও কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি। মুসলমানরা (যাদেরকে এ আয়াতে আল্লাহর সেনাদল বলা হয়েছে) ভয়াবহ জুলুম–নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। তাদের তিন–চতুর্থাংশ দেশ ত্যাগ করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বড় জোর ৪০–৫০ জন সাহাবী মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন এবং চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে সবরকমের উৎপীড়ন–নিপীড়ন বরদাশত করে যাচ্ছিলেন। এহেন অবস্থায় বাহ্যিক কার্যকারণগুলো প্রত্যক্ষ করে কোন ব্যক্তি ধারণা করতে পারতো না যে, শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহায় সম্বলহীন ক্ষুদ্র দলটি বিজয় লাভ করবে। বরং প্রত্যক্ষকারীরা মনে করছিল, এ আন্দোলনের সমাধি মক্কার পার্বত্য উপত্যকার মধ্যেই রচিত হয়ে যাবে। কিন্তু ১৫–১৬ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি, মক্কা বিজয়ের সময় ঠিক সে একই ঘটনা ঘটে গেলো যে ব্যাপারে কাফেরদেরকে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

সতর্কবাণী উচ্চারণ করার সাথে সাথে আল্লাহ এ সূরায় পুরোপুরি ভারসাম্য রক্ষা করে বুঝাবার ও উৎসাহিত-উদ্দীপিত করার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের নির্ভুলতার সপক্ষে সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তি পেশ করেছেন। মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসের সমালোচনা করে তারা কেমন বাজে অর্থহীন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করেছেন। তাদের এসব বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার ফল তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সংগে ঈমান ও সৎকাজের ফল কত মহান ও গৌরবময় তা শুনিয়ে দিয়েছেন। তারপর এ প্রসংগে ইতিহাস থেকে এমন সব উদাহরণ তুলে ধরেছেন যা থেকে জানা যায় আল্লাহ তাঁর নবীদের এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, নিজের বিশ্বস্ত বান্দাদেরকে তিনি কিভাবে পুরস্কৃত করেছেন এবং কিভাবে তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়েছেন।

যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী শিক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পবিত্র জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি যে, আল্লাহর একটি ইশারাতেই তিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে কুরবানী দিতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে কেবলমাত্র কুরাইশদের যেসব কাফেররা হযরত ইবরাহীমের (আ) সাথে নিজেদের বংশগত সম্পর্কের জন্য অহংকার করতো তাদের জন্যই শিক্ষা ছিল তা নয় বরং এমন মুসলমানদের জন্যও শিক্ষা ছিল যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছিলেন। এ ঘটনা শুনিয়ে তাদেরকে বলা হয়েছে, ইসলামের তাৎপর্য ও তার মূল প্রাণশক্তি কি এবং তাকে নিজেদের দীন তথা জীবন ব্যবস্থায় পরিণত করার পর একজন সত্যিকার মু'মিনকে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে নিজের সবকিছু কুরবানী করে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

সূরার শেষ আয়াতগুলো কাফেরদের জন্য নিছক সতর্কবাণীই ছিল না বরং যেসব মু'মিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমর্থন ও তাঁর সাথে সহযোগিতা করে চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থার মোকাবিলা করছিলেন তাঁদের জন্যও ছিল সুসংবাদ। তাঁদেরকে এসব আয়াত শুনিয়ে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, কাজের সূচনা করতে গিয়ে তাঁদেরকে যেসব বিপদ আপদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাতে যেন তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে না পড়েন, শেষ পর্যন্ত বিজয় তাঁদেরই পদচুম্বন করবে এবং বাতিলের যে পতাকাবাহীদেরকে বর্তমানে বিজয়ীর আসনে দেখা যাচ্ছে, তারা তাঁদেরই হাতে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে। মাত্র কয়েক বছর পরেই ঘটনাবলী জানিয়ে দিল, এটি নিছক আল্লাহর সান্ত্বনাবাণীই ছিল না বরং ছিল একটি বাস্তব ঘটনা এবং পূর্বাহ্নেই এর খবর দিয়ে তাদের মনোবল শক্তিশালী ও জোরদার করা হয়েছিল।

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰـهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿۵﴾

সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মানদের কসম, তারপর যারা ধমক ও অভিশাপ দেয় তাদের কসম, তারপর তাদের কসম যারা উপদেশবাণী শুনায়,[১] তোমাদের প্রকৃত মাবুদ মাত্র একজনই[২]—যিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর এবং পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যা কিছু আছে তাদের সবার মালিক এবং সমস্ত উদয়স্থলের[৩] মালিক।[৪]

১. মুফাস্‌সিরদের অধিকাংশ এ ব্যাপারে একমত যে, এ তিনটি দলই হচ্ছে ফেরেশ্‌তাদের দল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত কাতাদাহ (রা), মাসরূক, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইকরামা, মুজাহিদ, সুদ্দী, ইবনে যায়েদ ও রাবী' ইবনে আনাস থেকেও এ একই তাফসীর উদ্ধৃত হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার এর অন্য ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে এ ব্যাখ্যাটিই বেশী সামঞ্জস্যশীল বলে মনে হয়।

এখানে "সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো"—এর মাধ্যমে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনায় যেসব ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত রয়েছে তারা আল্লাহর বান্দা ও গোলাম। তারা সারিবদ্ধভাবে তাঁর বন্দেগী ও আনুগত্য করছে এবং তাঁর হুকুম তামিল করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত রয়েছে। সামনের দিকে গিয়ে ১৬৫ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সেখানে ফেরেশ্‌তারা নিজেদের সম্পর্কে বলছে ঃ

وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ

কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে "ধমক ও অভিশাপ দেবার" অর্থ হচ্ছে, কিছু ফেরেশ্‌তা আছে তারা মেঘমালাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং বৃষ্টির ব্যবস্থা করে। যদিও এ অর্থও ভুল নয়, কিন্তু সামনের দিকের বিষয়বস্তুর সাথে যে অর্থ বেশী মানানসই তা হচ্ছে এই যে, ঐ ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে একটি দল নাফরমানদেরকে ও অপরাধীদেরকে অভিশাপ দিয়ে থাকে এবং তাদের এ অভিশাপ কেবল শাব্দিক হয় না বরং তা মানুষের ওপর বড় বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঐতিহাসিক বিপদ মুসিবতের আকারে বর্ষিত হয়।

"উপদেশবাণী শুনাবার" অর্থ হচ্ছে ঐ ফেরেশ্তাদের মধ্যে এমন ধরনের ফেরেশ্তাও আছে যারা মানুষকে সত্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য উপদেশ দেবার দায়িত্ব পালন করে। সে উপদেশ দুর্যোগ দুর্ঘটনাদির আকারেও হয়, যা থেকে শিক্ষা গ্রহণকারীরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। আবার তা এমন শিক্ষার আকারেও হয়, যা ঐ ফেরেশ্তাদের মাধ্যমে নবীদের ওপর নাযিল হয়। আবার কখনো তা হয় তাদের মাধ্যমে সৎকর্মশীল লোকদের ওপর নাযিলকৃত ইলহাম অর্থাৎ অভাবনীয় পন্থায় মানুষের মনে আল্লাহ যে প্রেরণার (Inspiration) সঞ্চার করেন তার আকারেও।

২. এ সত্যটির ভিত্তিতেই উল্লেখিত গুণাবলী সমৃদ্ধ ফেরেশ্তাদের কসম খাওয়া হয়েছে। অন্য কথায় যেন বলা হয়েছে, এ সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা যা আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে সক্রিয় রয়েছে, এ বিশ্ব-জাহানের এমন সমস্ত নিদর্শন যেগুলো আল্লাহর বন্দেগী বিমুখতার অশুভ ফল মানুষের সামনে তুলে ধরছে এবং বিশ্ব-জাহানের এ আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা যার ফলে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত অবিরাম একই সত্যের কথা বিভিন্নভাবে স্মরণ করানো হচ্ছে—এ সবকিছুই মানুষের "ইলাহ" যে একজন, তারই সাক্ষ পেশ করছে।

"ইলাহ" শব্দটির ব্যবহার হয় দু'টি অর্থে। এক, এমন মাবুদ ও উপাস্য অর্থে, বাস্তবে ও সক্রিয়ভাবে যার বন্দেগী করা হচ্ছে। দুই, সে মাবুদ অর্থে, যিনি এমন মর্যাদার অধিকারী, যার ফলে প্রকৃতপক্ষে তাঁরই ইবাদাত ও বন্দেগী করা উচিত। এখানে ইলাহ শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ প্রথম অর্থে মানুষ তো বহু ইলাহ তৈরি করে রেখেছে। এ জন্য আমি ইলাহ শব্দটির অনুবাদ করেছি "প্রকৃত মাবুদ"।

৩. সূর্য সবসময় একই উদয়স্থল থেকে উদিত হয় না। বরং প্রতিদিন একটি নতুন স্থান থেকে উদিত হয়। তাছাড়া সারা দুনিয়ায় সে একই সময় উদিত হয় না বরং দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময় উদিত হয়। এসব কারণে উদয়স্থলের পরিবর্তে "সমস্ত উদয়স্থল" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এ সংগে "সমস্ত অস্তস্থল"-এর কথা না বলার কারণ হচ্ছে এই যে, সমস্ত উদয়স্থল শব্দেই সমস্ত অস্তস্থল প্রমাণ করে। তবুও এক জায়গায় رب المشارق والمغارب (উদয়স্থলগুলো ও অস্তস্থলগুলোর রব) শব্দগুলোও এসেছে। (আল মা'আরিজ, ৪০)

৪. এ আয়াতগুলোতে যে সত্যটি বুঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, বিশ্ব-জাহানের আসল মালিক ও শাসনকর্তাই মানুষের আসল মা'বুদ। তিনিই প্রকৃতপক্ষে মা'বুদ হতে পারেন এবং তাঁরই মাবুদ হওয়া উচিত। রব (মালিক, শাসনকর্তা ও প্রতিপালক) হবে একজন এবং ইলাহ (ইবাদাত লাভের অধিকারী) হবে অন্যজন, এটা একেবারেই বুদ্ধি বিরোধী কথা। মানুষের লাভ ও ক্ষতি, তার অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া, তার ভাগ্য ভাঙা-গড়া বরং তার নিজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বই যার ক্ষমতার অধীন তার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করা এবং তার সামনে নত হওয়া মানুষের প্রকৃতিরই দাবী। এটিই তার ইবাদাতের মৌল কারণ। মানুষ যখন একথাটি বুঝতে পারে তখন আপনা আপনি সে একথাটিও বুঝতে পারে যে, ক্ষমতার অধিকারীর ইবাদাত না করা এবং ক্ষমতাহীনের ইবাদাত করা দু'টোই বুদ্ধি ও প্রকৃতির সুস্পষ্ট বিরোধী। কর্তৃত্বশালী ইবাদাত লাভের হকদার হন। কর্তৃত্বহীন সত্তারা এর হকদারও হয় না। তাদের ইবাদাত করে এবং তাদের

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۝ دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ۝ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝

আমি দুনিয়ার আকাশকে[৫] তারকারাজির সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে তাকে সুরক্ষিত রেখেছি।[৬] এ শয়তানরা উর্ধ জগতের কথা শুনতে পারে না, সবদিক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত ও তাড়িত হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি। তবুও যদি তাদের কেউ তার মধ্য থেকে কিছু হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয় তাহলে একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তার পেছনে ধাওয়া করে।[৭]

এখন এদেরকে জিজ্ঞেস করো, এদের সৃষ্টি বেশী কঠিন, না আমি যে জিনিসগুলো সৃষ্টি করে রেখেছি সেগুলোর?[৮] এদেরকে তো আমি সৃষ্টি করেছি আঠাল কাদামাটি দিয়ে।[৯] তুমি তো (আল্লাহর কুদরাতের মহিমা দেখে) অবাক হচ্ছো এবং এরা তার প্রতি করছে বিদ্রূপ। তাদেরকে বুঝালেও তারা বোঝে না।

কাছে কিছু চেয়ে কোন লাভও হয় না। কারণ আমাদের কোন আবেদনের ভিত্তিতে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। তাদের সামনে বিনয়, দীনতা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে মাথা নত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ঠিক তেমনিই নির্বুদ্ধিতার কাজ যেমন কোন ব্যক্তি কোন শাসনকর্তার সামনে হাজির হয়ে তার কাছে আর্জি পেশ করার পরিবর্তে অন্য প্রার্থীরা যারা সেখানে আবেদনপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্য থেকে কারো সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

৫. দুনিয়ার আকাশ বলতে বুঝানো হয়েছে নিকটবর্তী আকাশকে, কোন দূরবীনের সাহায্য ছাড়াই খালি চোখে যে আকাশকে আমরা দেখতে পাই। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে বিশ্বকে আমরা দেখি এবং আমাদের পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে যেসব বিশ্ব এখনো আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি সেগুলো সবই দূরবর্তী

আকাশ। এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে "সামা" বা আকাশ কোন নির্দিষ্ট জিনিসের নাম নয়। বরং প্রাচীনতমকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মানুষ এ শব্দটি এবং এর সমার্থক শব্দাবলীকে উর্ধ জগতের জন্য ব্যবহার করে আসছে।

৬. অর্থাৎ উর্ধজগত নিছক মহাশূন্য নয়। যে কেউ চাইলেই তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। বরং এর বাঁধন অত্যন্ত মজবুত। এর বিভিন্ন অংশকে এমন সুদৃঢ় সীমান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়েছে যার ফলে কোন বিদ্রোহী শয়তানের পক্ষে সে সীমানাগুলো অতিক্রম করা সম্ভব নয়। বিশ্ব–জাহানের প্রত্যেকটি গ্রহ নক্ষত্রের নিজস্ব একটি কক্ষপথ ও আকাশ (Sphere) আছে। তার মধ্য থেকে কারো বের হয়ে আসা যেমন অত্যন্ত কঠিন তেমনি বাইর থেকে কারো তার মধ্যে প্রবেশ করাও সহজ নয়। বাইরের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে নিছক মহাশূন্য ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু আসলে সে মহাশূন্যের মধ্যে অসংখ্য ও অগণিত অংশকে এমন শক্তিশালী ও সুদৃঢ় সীমানা দিয়ে সংরক্ষিত করা হয়েছে যার মোকাবিলায় লৌহ প্রাচীর কিছুই নয়। মানুষের কাছের প্রতিবেশী চাঁদে পৌঁছুতে মানুষকে যেসব বিচিত্র সমস্যা ও বহুমুখী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা থেকে এ ব্যাপারে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য জীব অর্থাৎ জিনদের উর্ধজগতে প্রবেশ করার পথেও এমনি ধরনের বাধা–প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

৭. এ বিষয়টি বুঝতে হলে একটি কথা অবশ্যই দৃষ্টি সমক্ষে থাকতে হবে। সে সময় আরবে জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা ছিল। বিভিন্ন স্থানে গণক ও জ্যোতিষীরা বসে ভবিষ্যদ্বাণী করতো। অদৃশ্যের সংবাদ দিত। হারিয়ে যাওয়া জিনিসের সন্ধান দিত। লোকেরা নিজেদের অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা জানার জন্য তাদের দ্বারস্থ হতো। এ গণকদের দাবী ছিল, জিন ও শয়তানরা তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তারা তাদেরকে সব ধরনের খবর এনে দেয়। এ পরিবেশে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন এবং তিনি কুরআন মজীদের আয়াত শুনাতে শুরু করেন। তাতে অতীতের ইতিহাস এবং ভবিষ্যতে যেসব অবস্থার সৃষ্টি হবে তার খবর দেয়া হয়েছিল। এ সংগে তিনি জানিয়ে দেন, একজন ফেরেশ্‌তা আমার কাছে এসব আয়াত নিয়ে আসেন এতে তাঁর বিরোধীরা সংগে সংগেই তাঁকে গণক বলে পরিহাস করতে থাকে। তারা লোকদেরকে বলতে থাকে, অন্যান্য গণকদের মতো তাঁর সম্পর্কও এমন কোন শয়তানের সাথে রয়েছে যে উর্ধজগত থেকে আড়ি পেতে কিছু শুনে তাঁর কাছে নিয়ে আসে এবং তিনি তাকে আল্লাহর অহী বানিয়ে পেশ করে দেন। এ অপবাদের জবাবে আল্লাহ যে সত্য বিবৃত করছেন তা এই যে, শয়তানরা তো উর্ধজগতে পৌঁছতেই পারে না। ফেরেশ্‌তাদের কথা শোনা এবং তা নিয়ে এসে কাউকে বলার ক্ষমতা তাদের নেই। আর যদি ঘটনাক্রমে সামান্য একটু ছিটে ফোঁটা তথ্য কোন শয়তানের কানে পড়ে যায় তাহলে সে তা নিয়ে নিচে নেমে আসার আগেই একটি দ্রুতগামী অগ্নিশিখা তার পিছু নেয়। অন্যকথায় এর অর্থ হচ্ছে ফেরেশ্‌তাদের মাধ্যমে বিশ্ব–জাহানের যে বিশাল ব্যবস্থা চলছে তা পুরোপুরি শয়তানদের হস্তক্ষেপ মুক্ত। তাতে হস্তক্ষেপ করাতো দূরের কথা সে সম্পর্কে কিছু জানার ক্ষমতাও তাদের নেই। (আরো বেশী জানতে হলে তাফহীমুল কুরআন সূরা আল হাজ্‌র, ৮ থেকে ১২ টীকা দেখুন।)

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

কোনো নিদর্শন দেখলে উপহাস করে উড়িয়ে দেয় এবং বলে, "এ তো স্পষ্ট যাদু।[১০] আমরা যখন মরে একেবারে মাটি হয়ে যাবো এবং থেকে যাবে শুধুমাত্র হাড়ের পিঞ্জর তখন আমাদের আবার জীবিত করে উঠানো হবে, এমনও কি কখনো হতে পারে? আর আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকেও কি উঠানো হবে?" এদেরকে বলো, হাঁ, এবং তোমরা (আল্লাহর মোকাবিলায়) অসহায়।[১১]

ব্যস, একটিমাত্র বিকট ধমক হবে এবং সহসাই এরা স্বচক্ষে (সেই সবকিছু যার খবর দেয়া হচ্ছে) দেখতে থাকবে।[১২] সে সময় এরা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এতো প্রতিফল দিবস—"এটা সে ফায়সালার দিন যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।"[১৩]

৮. আখেরাত সম্পর্কে মক্কার কাফেররা যে সন্দেহ পেশ করতো এটি তার জওয়াব। তাদের মতে আখেরাত সম্ভব নয়। কারণ যেসব মানুষ মরে গেছে তাদের আবার দ্বিতীয়বার জন্মলাভ করা অসম্ভব। এর জবাবে আখেরাতের সম্ভাবনার যুক্তি পেশ করতে গিয়ে আল্লাহ সর্বপ্রথম তাদের সামনে এ প্রশ্ন রাখেন, তোমাদের মতে যদি মৃত মানুষদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা অনেক কঠিন কাজ হয়ে থাকে এবং এ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আমার না থেকে থাকে তাহলে বলো, এ পৃথিবী ও আকাশ এবং এদের মধ্যে যে অসংখ্য জিনিস রয়েছে এগুলো সৃষ্টি করা কি সহজ কাজ? তোমাদের বুদ্ধি কোথায় হারিয়ে গেছে? যে আল্লাহর জন্য এ বিশাল বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করা কঠিন কাজ ছিল না এবং যিনি তোমাদের নিজেদেরকে একবার সৃষ্টিও করেছেন তাঁর ব্যাপারে তোমরা কেমন করে ভাবতে পারলে যে, তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে তিনি অক্ষম?

৯. অর্থাৎ এ মানুষ তো কোন বিরাট জিনিস নয়। মাটি দিয়ে একে তৈরি করা হয়েছে এবং এ মাটি দিয়ে আবার তৈরি করা যেতে পারে। আঠাল কাদামাটি দিয়ে মানুষ তৈরি করার অর্থ এও হতে পারে যে, প্রথম মানুষটিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল মাটি দিয়ে এবং তারপর মানুষের বংশধারা ঐ প্রথম মানুষটির শুক্রবীজ থেকে অস্তিত্বলাভ করেছে। এর

অর্থ এও হতে পারে যে, প্রত্যেকটি মানুষ আঠাল কাদামাটির তৈরি। কারণ মানুষের অস্তিত্বের সমস্ত উপাদান মাটি থেকেই লাভ করা হয়। যে বীর্যে তার জন্ম তা খাদ্য থেকে তৈরি এবং গর্ভসঞ্চার থেকে শুরু করে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তার সমগ্র অস্তিত্ব যেসব উপাদানে তৈরি হয় তার খাদ্যই তার সবটুকু সরবরাহ করে। এ খাদ্য পশু ও জীবজন্তু থেকে সরবরাহকৃত হোক বা উদ্ভিদ থেকে মূলত এর উৎস হচ্ছে মাটি, যা পানির সাথে মিশে মানুষের খাদ্য হওয়ার এবং তরকারী ও ফল উৎপন্ন করার যোগ্যতা অর্জন করে এবং জীবজন্তু লালন করারও যোগ্যতা অর্জন করে, যাদের দুধ ও গোশ্‌ত মানুষ আহার করে।

কাজেই যুক্তির বুনিয়াদ এরি ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, এ মাটি যদি জীবন গ্রহণ করার যোগ্যতা না রাখতো তাহলে তোমরা কেমন করে জীবিত আকারে দুনিয়ার বুকে বিরাজ করছো? আর যদি তার মধ্যে জীবন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে থাকে, যেমন তোমাদের অস্তিত্বই এ সম্ভাবনার দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ পেশ করছে, তাহলে আগামীকাল এ একই মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি অসম্ভব হবে কেন?

১০. অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক জগতের কথা। এ ব্যক্তি বলছে কোন ঐন্দ্রজালিক জগতের কথা। সেখানে মৃতরা পুনরুজ্জীবিত হবে। আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে। জান্নাত আবাদ করা হবে। জাহান্নামীদের শাস্তি বিধান করা হবে। অথবা এর এ অর্থও হতে পারে যে, এ ব্যক্তি মন ভুলানো কথা বলছে। এর এ কথাগুলোই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, কেউ এর ওপর যাদু করে দিয়েছে, যার ফলে এ সুস্থ-সচেতন ব্যক্তিটি এখন এ ধরনের আবোল-তাবোল কথা বলছে।

১১. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে যা ইচ্ছা তাই বানাতে পারে। যখন তিনি চাইলেন তখনই তাঁর একটি ইশারাতেই তোমরা অস্তিত্ব লাভ করলে। যখন তিনি চাইবেন তখনই তাঁর একটি ইংগিতেই তোমরা মৃত্যু বরণ করবে। আবার যখন তিনি চাইবেন সাথে সাথেই তাঁর একটি ইংগিতই তোমাদেরকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে।

১২. অর্থাৎ এ ঘটনা সংঘটিত হবার সময় যখন এসে যাবে তখন দুনিয়াকে পুনরায় উত্থিত করা কোন কঠিন কাজ হবে না। একটিমাত্র বিকট ধমক ঘুমন্তদেরকে জাগিয়ে উঠিযে দেবার জন্য যথেষ্ট হবে। "বিকট ধমক" শব্দটি এখানে বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের এমন কিছু ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে যা থেকে বুঝা যায়, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ মরে গিয়েছিল সবাই যেন শুয়ে ঘুমোচ্ছে এবং হঠাৎ কেউ ধমক দিয়ে বললো, "উঠে পড়ো" আর সংগে সংগেই মুহূর্তের মধ্যে তারা সবাই দাঁড়িয়ে গেলো।

১৩. হতে পারে মু'মিনরা তাদেরকে একথা বলে। এও হতে পারে, এটি ফেরশ্‌তাদের উক্তি। এও হতে পারে, হাশরের ময়দানের সমগ্র পরিবেশ সে সময় সমকালীন পরিস্থিতির মাধ্যমে একথা বলছিল। আবার এও হতে পারে, এটা তাদের নিজেদেরই দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ নিজেদের মনে মনে তারা নিজেদেরকেই সম্বোধন করে বলছিল, এ দুনিয়ায় সারা জীবন তোমরা একথা মনে করতে থেকেছো যে, ফায়সালা করার দিন কখনো আসবে না, কিন্তু এখন তোমাদের সর্বনাশের সময় এসে গেছে, যেদিনকে মিথ্যা বলতে সেদিনটি আজ তোমাদের সামনে উপস্থিত।

أُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾

২ রুকূ’

(হুকুম দেয়া হবে) ঘেরাও করে নিয়ে এসো সব জালেমকে,[১৪] তাদের সাথিদেরকে[১৫] এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদদের তারা বন্দেগী করতো তাদেরকে[১৬] তারপর তাদের সবাইকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দাও। আর এদেরকে একটু থামাও, এদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে। "তোমাদের কি হয়েছে, এখন কেন পরস্পরকে সাহায্য করো না? আরে, আজ তো এরা নিজেরাই নিজেদেরকে (এবং একজন অন্যজনকে) সমর্পণ করে দিয়ে যাচ্ছে।"[১৭] এরপর এরা একে অন্যের দিকে ফিরবে এবং পরস্পর বিতর্ক শুরু করে দেবে। (আনুগত্যকারীরা তাদের নেতাদেরকে) বলবে, "তোমরা তো আমাদের কাছে আসতে সোজা দিক দিয়ে।"[১৮]

১৪. জালেম বলতে কেবল তাদেরকে বুঝানো হয়নি যারা অন্যের প্রতি জুলুম করেছে। বরং কুরআনের পরিভাষায় এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই জালেম যে আল্লাহর মোকাবিলায় বিদ্রোহ, সীমালংঘন ও নাফরমানির পথ অবলম্বন করেছে।

১৫. মূলে ازواج (আয্‌ওয়াজ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ তাদের এমন সব স্ত্রীও হতে পারে যারা এ বিদ্রোহে তাদের সহযোগী ছিল। আবার এমনসব লোকও হতে পারে যারা তাদেরই মতো বিদ্রোহী সীমালংঘনকারী ও নাফরমান ছিল। এ ছাড়া এর অর্থ এও হতে পারে যে, এক এক ধরনের অপরাধীকে আলাদা আলাদা জোটের আকারে একত্র করা হবে।

১৬. এখানে মাবুদদের অর্থ দু' ধরনের মাবুদ। এক, এমনসব মানুষ ও শয়তান যাদের নিজেদের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা এ ছিল যে, লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের বন্দেগী করুক। দুই, এমনসব মূর্তি, গাছ, পাথর ইত্যাদি যাদের পূজায় দুনিয়াবাসীরা লিপ্ত ছিল। এর মধ্যে প্রথম ধরনের মাবুদরা নিজেরাই অপরাধীদের অন্তরভুক্ত হবে এবং শাস্তির জন্য তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখানো হবে। আর দ্বিতীয় ধরনের মাবুদদেরকে তাদের ইবাদাতকারীদের সাথে এ জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে যে, তারা এদেরকে দেখে সবসময় লজ্জা অনুভব করবে এবং নিজেদের নির্বুদ্ধিতার অনুশোচনা করতে থাকবে। এরা ছাড়া তৃতীয় আর এক ধরনের মাবুদ হচ্ছে, দুনিয়ায় যাদেরকে পূজা করা হয়েছে কিন্তু

قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ۝ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ إِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ۝ فَأَغْوَيْنٰكُمْ إِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ۝ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۝ إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝ إِنَّهُمْ كَانُوْٓا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۝

তারা জবাব দেবে, "না, তোমরা নিজেরাই মু'মিন ছিলে না। তোমাদের ওপর আমাদের কোন জোর ছিল না। বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে বিদ্রোহী। শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের রবের এ ফরমানের হকদার হয়ে গেছি যে, আমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ করবো। কাজেই আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম কারণ আমরা নিজেরাই বিভ্রান্ত ছিলাম।"[১৭]

এভাবে তারা সবাই সেদিন শাস্তিতে শরীক হবে।[২০] আমি অপরাধীদের সাথে এমনটিই করে থাকি। এরা ছিল এমন সব লোক যখন এদেরকে বলা হতো, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই" তখন এরা অহংকার করতো এবং বলতো, "আমরা কি একজন উন্মাদ কবির জন্য আমাদের মাবুদদেরকে ত্যাগ করবো?"

তারা কখনো তাদের পূজা–উপাসনা করার প্রতি ইংগিত করেনি। বরং তারা সবসময় মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পূজা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন ফেরেশ্‌তা, আম্বিয়া ও আউলিয়া। এ ধরনের মাবুদদেরকে মোটেই অন্যান্য মাবুদদের মতো তাদের উপাসনাকারীদের সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না।

১৭. প্রথম বাক্যটি বলা হবে অপরাধীদেরকে সম্বোধন করে। দ্বিতীয় বাক্যটি উপস্থিত এমনসব সাধারণ ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে বলা হবে যারা সে সময় জাহান্নামের পথে অপরাধীদের রওয়ানা হবার দৃশ্য দেখতে থাকবে। এ বাক্যটি নিজেই জানিয়ে দিচ্ছে সে সময় অবস্থাটা কেমন হবে। বড় বড় তাগড়া অপরাধীদের কোমরের বল শেষ হয়ে যাবে। কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তারা কান ধরে জাহান্নামের দিকে চলে যেতে থাকবে। কোথাও কোন 'জাহাঁপনা' ধাক্কা খেতে থাকবে এবং দরবারীদের মধ্য থেকে কেউ সেই "মহামতি মহামহিমকে" উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে না। কোথাও কোন বিশ্ব বিজয়ী ও কোন ডিরেক্টর চরম লাঞ্ছনা সহকারে চলে যেতে থাকবে এবং তার পরাক্রমশালী সেনাদল নিজেরাই তাকে দণ্ড দেবার জন্য এগিয়ে দেবে। কোথাও কোন পীর সাহেব বা গুরুজী অথবা হোলি ফাদার জাহান্নামের শাস্তি লাভ করবে এবং মুরীদদের

بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٩﴾

অথচ সে সত্য নিয়ে এসেছিল এবং রসূলদেরকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল[২১] (এখন তাদেরকে বলা হবে) তোমরা নিশ্চিতভাবেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে এবং পৃথিবীতে তোমরা যে সমস্ত কাজ করতে তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হচ্ছে।

একজনও "হুজুরে আলা'র মর্যাদাহানির কথা ভাববে না। কোথাও কোন জাতীয় নেতা বড়ই হীনতার মধ্যে জাহান্নামের পথে যাত্রা করবে এবং দুনিয়ায় যেসব লোক তার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের ঝাণ্ডা বুলন্দ করে বেড়াতো তারা সবাই তার দিক থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নেবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যে প্রেমিক দুনিয়ায় তার প্রেমাস্পদের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল সেও তার প্রেমাস্পদের দুরবস্থার দিকে ভ্রুক্ষেপই করবে না। এ অবস্থার চিত্র এঁকে মহান আল্লাহ আসলে একথা বুঝাতে চান যে, দুনিয়ায় মানুষের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক খোদাদ্রোহিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তা কিভাবে আখেরাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে এবং এখানে যারা নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত হয়ে আছে সেখানে তাদের অহংকারের দেয়াল কিভাবে মিসমার হয়ে যাবে।

১৮. মূলে বলা হয়েছে ঃ كُنْتُمْ تَأْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ "তোমরা আমাদের কাছে আসতে ইয়ামীনের পথে।" ইয়ামীন শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে বলা হয়। যদি একে শক্তি অর্থে বলা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে আমরা দুর্বল ছিলাম, তোমরা আমাদের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছিলে তাই তোমরা নিজেদের শক্তি ব্যবহার করে আমাদের গোমরাহীর দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে। যদি একে কল্যাণ অর্থে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, তোমরা কল্যাণকামী সেজে আমাদের ধোঁকা দিয়েছো। তোমরা আমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছিলে, যে পথে তোমরা আমাদের চালাচ্ছো এটিই সত্য ও কল্যাণের পথ। তাই আমরা ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিলাম। আর যদি একে কসম অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে তোমরা কসম খেয়ে খেয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করতে যে, তোমরা যা পেশ করছো তা-ই সত্য।

১৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা, ৫১, ৫২, ৫৩ টীকা।

২০. অর্থাৎ নেতা ও অনুসারী এবং গোমরাহ ও গোমরাহকারী উভয়ই একই শাস্তি লাভ করবে। অনুসারীদের এ ওযর মেনে নেয়া হবে না যে, তারা নিজেরা গোমরাহ হয়নি বরং তাদেরকে গোমরাহ করা হয়েছিল। অন্যদিকে নেতাদের এ ওযরও গ্রহণ করা হবে না যে, গোমরাহ লোকেরা নিজেরাই সরল-সত্য পথের প্রত্যাশী ছিল না।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝٤٠ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۝٤١ فَوَاكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ ۝٤٢ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝٤٣ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝٤٤ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۝٤٥ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ۝٤٦ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۝٤٧ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ۝٤٨ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۝٤٩

কিন্তু আল্লাহর নির্বাচিত বান্দারা (এ অশুভ পরিণাম) মুক্ত হবে। তাদের জন্য রয়েছে জ্ঞাত রিযিক,[২২] সব রকমের সুস্বাদু জিনিস[২৩] এবং নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত, যেখানে তাদেরকে মর্যাদা সহকারে রাখা হবে। বসবে তারা আসনে মুখোমুখি। শরাবের[২৪] ঝরণা[২৫] থেকে পানপাত্র ভরে ভরে তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে।[২৬] উজ্জ্বল শরাব, পানকারীদের জন্য হবে সুস্বাদু। তা তাদের কোন শারীরিক ক্ষতি করবে না এবং তাতে তাদের বুদ্ধিও ভ্রষ্ট হবে না।[২৭] আর তাদের কাছে থাকবে আনত নয়না[২৮] সুলোচনা নারীগণ,[২৯] এমন নাজুক যেমন হয় ডিমের খোসার নিচে লুকানো ঝিল্লি।[৩০]

২১. রসূলদেরকে সত্য বলে মেনে নেয়ার তিনটি অর্থ রয়েছে এবং এ তিনটি অর্থই এখানে প্রযুক্ত। এক, তিনি পূর্ববর্তী এমন কোন রসূলের বিরোধিতা করেননি যার অনুসারীদের তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকতো। বরং তিনি আল্লাহর সমস্ত পূর্ববর্তী রসূলকে সত্য বলতেন। দুই, তিনি কোন নতুন ও অভিনব কথা আনেননি। বরং শুরু থেকে আল্লাহর সব রসূল যে কথা বলে আসছিলেন তিনিও সে একই কথা পেশ করতেন। তিন, পূর্ববর্তী রসূলগণ তাঁর সম্পর্কে যেসব খবর দিয়েছিলেন তিনি সেগুলোর সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র ছিলেন।

২২. অর্থাৎ এমন রিযিক যার সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। যা পাওয়ার ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। যে ব্যাপারে তারা একেবারে নিশ্চিন্ত যে, তা তারা চিরকাল পেতে থাকবে। যে ব্যাপারে কি পাওয়া যাবে কি না পাওয়া যাবে, এ ধরনের কোন অনিশ্চয়তা নেই।

২৩. এর মধ্যে এদিকেও একটি সূক্ষ্ম ইশারা রয়েছে যে, জান্নাতে আহার্য দ্রব্যাদি খাদ্য হিসেবে নয় বরং স্বাদ উপভোগের জন্য ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ সেখানে খাবার এ উদ্দেশ্যে খাওয়া হবে না যে, শরীরের ক্ষয় হয়ে যাওয়া অংশগুলোর শূন্যতা পূরণ করা হবে। কারণ সে চিরন্তন জীবনে শরীরের অংশগুলোর কোন ক্ষয়ই হবে না। মানুষের সেখানে ক্ষুধাও লাগবে না। এ দুনিয়ায় শরীরের অংশের ক্ষয়ের কারণে মানুষের ক্ষুধা পায়। আর শরীর নিজেকে জীবিত রাখার জন্য সেখানে খাদ্যও চাইবে না। এ কারণে জান্নাতের খাদ্যের জন্য فواكه (ফাওয়াকেহ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থের মধ্যে "খাদ্যে পরিণত হওয়া" এর পরিবর্তে "স্বাদ উপভোগ করা" এর অর্থ অধিকতর লক্ষণীয়।

২৪. আসলে এখানে শরাব শব্দটি সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। বরং শুধুমাত্র كَأْس (পানপাত্র) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আরবী ভাষায় كَأْس শব্দটি ব্যবহার করে সবসময় শরাব অর্থই গ্রহণ করা হয়। যে পেয়ালায় শরাবের পরিবর্তে দুধ বা পানি থাকে অথবা যে পেয়ালায় কিছুই থাকে না তাকে كَاس (কাস) বলা হয় না। "কাস" শব্দটি একমাত্র তখনই বলা হয় যখন তার মধ্যে মদ থাকে।

২৫. অর্থাৎ দুনিয়ায় ফল ও খাদ্য বস্তু পচিয়ে যে শরাব তৈরি করা হয় এ শরাব তেমন ধরনের হবে না। বরং তা প্রাকৃতিকভাবে ঝরণা থেকে উৎসারিত হবে এবং নদীর আকারে প্রবাহিত হবে। সূরা মুহাম্মাদে এ বিষয়বস্তুটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ

"আর শরাবের নদী, যা পানকারীদের জন্য হবে সুস্বাদু।"

২৬. শরাবের পানপাত্র নিয়ে ঘুরে ঘুরে জান্নাতীদের মধ্যে কারা পরিবেশন করবে সেকথা এখানে বলা হয়নি। এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে অন্যান্য স্থানে ঃ

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ

"আর তাদের খিদমত করার জন্য ঘুরবে তাদের খাদেম ছেলেরা যারা এমন সুন্দর যেমন ঝিনুকে লুকানো মোতি।" (আত্ তূর, ২৪)

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا

"আর তাদের খিদমত করার জন্য ঘুরে ফিরবে এমন সব বালক যারা হামেশা বালকই থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে মোতি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।"

(আদ দাহ্‌র, ১৯)

তারপর এর বিস্তারিত বর্ণনা হযরত আনাস (রা) ও হযরত সামুরাহ ইবনে জুন্‌দুবের (রা) বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসগুলো থেকে পাওয়া যায়। সেগুলোতে বলা হয়েছে "মুশরিকদের সন্তানরা জান্নাতবাসীদের সেবক হবে।" (আবু দাউদ তায়ালিসী, তাবারানী ও বায্‌যার) এ হাদীসগুলো সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হলেও অন্যান্য বহু হাদীস থেকেও জানা যায়, যে শিশুরা বয়প্রাপ্ত না হয়ে মারা যায় তারা জান্নাতে যাবে। তাছাড়া একথাও হাদীস থেকে জানা যায় যে, যেসব শিশুর পিতামাতা জান্নাতবাসী হবে তারা নিজেদের বাপ-মায়ের সাথে থাকবে, যাতে তাদের চোখ শীতল হয়। এরপর অবশ্যই এমন সব শিশু থেকে যায় যাদের বাপ-মা জান্নাতী হবে না। কাজেই তাদের ব্যাপারে একথা যুক্তিসংগত মনে হয় যে, তাদেরকে জান্নাতবাসীদের খাদেম বানিয়ে দেয়া হবে। (এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনার জন্য "ফাত্হুল বারী" ও "উম্‌দাতুল কারী"র জানায়েয অধ্যায়ের 'মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে' অনুচ্ছেদে, "রাসায়েল ও মাসায়েল" ৩ খন্ড ১৭৭-১৮৭ পৃষ্ঠা দেখুন।)

২৭. অর্থাৎ দুনিয়ার শরাবে যে দু'ধরনের দোষ থাকে তা হবে তার স্পর্শ মুক্ত। দুনিয়ার শরাবের এক ধরনের দোষ হচ্ছে, মানুষ তার কাছে আসতেই প্রথমে তার পচা দুর্গন্ধ নাকে

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾

তারপর তারা একজন অন্যজনের দিকে ফিরে অবস্থা জিজ্ঞেস করবে। তাদের একজন বলবে, "দুনিয়ায় আমার ছিল এক সংগী, সে আমাকে বলতো, তুমিও কি সত্য বলে মেনে নেবার দলে?[৩১] যখন আমরা মরে যাবো, মাটির সাথে মিশে যাবো এবং অস্থি পিঞ্জরই থেকে যাবে তখন সত্যিই কি আমাদের শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে? তোমরা কি দেখতে চাও সে এখন কোথায় আছে?" এ বলে যেমনি সে নিচের দিকে ঝুঁকবে তখনই দেখবে তাকে জাহান্নামের অতল গভীরে।

পৌঁছে যায়। তারপর তার স্বাদ মানুষের জিহ্বাকে তিক্ত ও বিস্বাদ করে দেয়। এরপর গলার নিচে নামার সাথে সাথেই তা পেট চেপে ধরে। তারপর তা মাথায় চড়তে থাকে এবং মাথায় চক্কর দিতে থাকে। এরপর তা যকৃত বা কলিজাকে প্রভাবিত করে এবং মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর তার খারাপ প্রভাব পড়তে থাকে। তারপর যখন নেশা খতম হয়ে যেতে থাকে তখন মানুষ নিদ্রালুতা ও অবসাদে আক্রান্ত হয়। এসব হচ্ছে শারীরিক ক্ষতি। দ্বিতীয় ধরনের দোষ হচ্ছে, শরাব পান করে মানুষ বকবক করতে থাকে, উল্টা পাল্‌টা আজে–বাজে অর্থহীন কথা বলতে থাকে, এগুলো শরাবের মানসিক ক্ষতি। দুনিয়ায় মানুষ কেবলমাত্র আনন্দ লাভের জন্য এ সমস্ত ক্ষতি বরদাশ্‌ত করে। আল্লাহ বলেন, জান্নাতের শরাবে আনন্দলাভ করা যাবে পূর্ণভাবে (لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ) কিন্তু উপরোক্ত দু'ধরনের ক্ষতির কোনটারই সম্ভাবনা সেখানে থাকবে না।

২৮. অর্থাৎ নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না।

২৯. সম্ভবত এরা সেসব মেয়ে হবে যারা প্রাপ্ত বয়স্কা হবার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে এবং যাদের পিতামাতা জান্নাতলাভের অধিকারী হয়নি। অনুমানের ভিত্তিতে একথা বলা যেতে পারে যে, এ ধরনের ছেলেদেরকে যেমন জান্নাতবাসীদের সেবায় নিযুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা হামেশা বালকই থাকবে ঠিক তেমনি এ ধরনের মেয়েদেরকে জান্নাতবাসীদের জন্য হূরে পরিণত করা হবে এবং তারা চিরকাল উঠতি বালিকাই থাকবে। অবশ্য এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন।

৩০. মূলে বলা হয়েছে كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ "যেন তারা গোপন বা সংরক্ষিত ডিম" তাফসীর বিশারদগণ এ শব্দগুলোর বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। কিন্তু সঠিক ব্যাখ্যা সেটিই যেটি হযরত উম্মে সালামাহ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

قَالَ تَاللّٰهِ إِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ﴿٦١﴾ أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ أَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٦٦﴾

এবং তাকে সম্বোধন করে বলতে থাকবে, "আল্লাহর কসম, তুই তো আমাকে ধ্বংসই করে দিতে চাচ্ছিলি। আমার রবের মেহেরবাণী না হলে আজ আমিও যারা পাকড়াও হয়ে এসেছে তাদের অন্তরভুক্ত হতাম।[৩২] *আচ্ছা, তাহলে কি এখন আমরা আর মরবো না? আমাদের যে মৃত্যু হবার ছিল তা প্রথমেই হয়ে গেছে? এখন আমাদের কোন শাস্তি হবে না?"*[৩৩]

নিশ্চিতভাবেই এটিই মহান সাফল্য। এ ধরনের সাফল্যের জন্যই কাজ করতে হবে তাদের যারা কাজ করে। বলো, এ ভোজ ভালো, না যাক্কুম গাছ?[৩৪] *আমি এ গাছটিকে জালেমদের জন্য ফিতনায় পরিণত করে দিয়েছি।*[৩৫] *সেটি একটি গাছ, যা বের হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে। তার ফুলের কলিগুলো যেন শয়তানদের মুণ্ডু।*[৩৬] *জাহান্নামের অধিবাসীরা তা খাবে এবং তা দিয়ে পেট ভরবে।*

থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীমকে (সা) এ আয়াতটির অর্থ জিজ্ঞেস করি। জবাবে তিনি বলেন, তাদের কোমলতা ও নাজুকতা এমন ঝিল্লির মত হবে যা ডিমের খোসা ও তার সাদা অংশের মাঝখানে থাকে। (ইবনে জারীর)

৩১. অর্থাৎ তোমরাও কি এমন দুর্বল বিশ্বাসীদের দলে ভিড়লে যারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের মতো অযৌক্তিক কথা মেনে নিয়েছে?

৩২. এ থেকে অনুমান করা যায়, আখেরাতে মানুষের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বাকশক্তি কোন্ ধরনের হবে। জান্নাতে বসে এক ব্যক্তি যখন চাইবে কোন টেলিভিশন যন্ত্রের সহায়তা ছাড়াই সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে এমন এক ব্যক্তিকে দেখে নেবে যে তার থেকে নাজানি কত হাজার মাইল ব্যবধানে জাহান্নামের আযাবের মধ্যে আছে। তারপর এখানেই শেষ নয়, তারা দু'জনই কেবল দু'জনকে দেখতে পাচ্ছে না বরং তাদের মধ্যে

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾

তারপর পান করার জন্য তারা পাবে ফুটন্ত পানি। আর এরপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে। এ অগ্নিময় দোজখের দিকে।[৩৭] *এরা এমনসব লোক যারা নিজেদের বাপ–দাদাদেরকে পথভ্রষ্ট পেয়েছে এবং তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে ছুটে চলেছে।*[৩৮] *অথচ তাদের পূর্বে বহু লোক পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে আমি সতর্ককারী রসূল পাঠিয়েছিলাম। এখন দেখো সে সতর্ককৃত লোকদের কি পরিণাম হয়েছিল। এ অশুভ পরিণতির হাত থেকে কেবলমাত্র আল্লাহর সে বান্দারাই রেহাই পেয়েছে যাদেরকে তিনি নিজের জন্য স্বতন্ত্র করে নিয়েছেন।*

কোন টেলিফোন বা রেডিও যোগাযোগ ছাড়াই তারা সরাসরি কথার আদান প্রদানও করছে। এত দূরের ব্যবধান থেকে তারা কথা বলবে এবং পরস্পরের কথা শুনবে।

৩৩. বর্ণনাভংগী পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, নিজের জাহান্নামী বন্ধুর সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ এ জান্নাতী লোকটি তার নিজের সাথে কথা বলতে থাকবে এবং এ তিনটি বাক্য তার মুখ থেকে এমনভাবে বের হবে যেন কোন ব্যক্তি নিজেকে সব ধরনের প্রত্যাশা ও অনুমানের উর্ধের অবস্থায় পেয়ে চরম বিস্ময় ও আনন্দ বিহ্বলতার মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে যাচ্ছে। এ ধরনের কথায় কোন বিশেষ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয় না এবং এখানে মানুষ যে প্রশ্ন করে তার উদ্দেশ্য আসলে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা হয় না। বরং সেখানে মানুষের নিজের মনের অনুভূতি প্রকাশ ঘটে তার নিজের ভাষায়। এ জান্নাতী লোকটি জাহান্নামী লোকটির সাথে কথা বলতে বলতে সহসা অনুভব করতে থাকবে যে, তার সৌভাগ্য তাকে কোথায় নিয়ে এসেছে। এখন মৃত্যুও নেই, শাস্তিও নেই। সমস্ত কষ্টের অবসান ঘটেছে এবং সে এখন চিরন্তন জীবনের অধিকারী হয়েছে। এ অনুভূতির ভিত্তিতে সে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে, আমি এখন এ মর্যাদায় উপনীত হয়েছি?

৩৪. যাক্কুম এক ধরনের গাছ। তিহামা এলাকায় এ গাছ দেখা যায়। এর স্বাদ হয় তিতা, গন্ধ বিরক্তিকর এবং ভাঙলে এর মধ্য থেকে এক ধরনের দুধের মতো পদার্থ বের হয় যা গায়ে লাগলে গা ফুলে ওঠে ও ফোস্কা পড়ে।

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾

৩ রুকূ’

(ইতিপূর্বে)[৩৯] নূহ আমাকে ডেকেছিল,[৪০] তাহলে দেখো, আমি ছিলাম কত ভালো জওয়াবদাতা। আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করি ভয়াবহ যন্ত্রণা থেকে,[৪১] শুধু তার বংশধরদেরকেই টিকিয়ে রাখি[৪২] এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তারই প্রশংসা ছেড়ে দেই। সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।[৪৩] সৎকর্মশীলদেরকে আমি এমনই প্রতিদান দিয়ে থাকি। আসলে সে ছিল আমার মু’মিন বান্দাদের অন্তরভুক্ত। তারপর অন্যদলকে আমি ডুবিয়ে দেই।

৩৫. অর্থাৎ অস্বীকারকারীরা একথা শুনে কুরআনের নিন্দা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদ্রূপ করার একটি নতুন সুযোগ পেয়ে যায়। এর ফলে তারা ঠাট্টা করে বলতে থাকে, নাও এখন নতুন কথা শোনো, জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নাকি আবার গাছ জন্মাবে।

৩৬. এখানে এরূপ ভুল বুঝাবুঝি হওয়া চাই না যে, শয়তানের মাথা কে দেখেছে যে যাক্কুম গাছের ফুলকে তার সাথে তুলনা করা হয়েছে? আসলে এটি একটি কাল্পনিক উপমা। সাধারণভাবে প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যে এর সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন আমরা একটি মেয়ের পরমা সুন্দরী হবার ধারণা প্রকাশ করার জন্য বলি, বাহ্ মেয়েটি পরীর মতো সুন্দরী। অন্যদিকে কোন মেয়ের চরম কদাকার রূপ বর্ণনা করার জন্য বলি, মেয়েটি যেন একটি পেত্নী। কোন ব্যক্তির নূরানী চেহারার বর্ণনা দেবার জন্য বলে থাকি, ঠিক ফেরেশ্‌তার মতো চেহারা। আর কেউ যদি অত্যন্ত ভয়াল ভীষণ আকৃতি নিয়ে সামনে আসে তাহলে আমরা বলি, তাকে ঠিক শয়তানের মতো দেখাচ্ছে।

৩৭. এ থেকে বুঝা যায় যে, জাহান্নামবাসীরা যখন ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে যেতে থাকবে তখন তাদেরকে হাঁকিয়ে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে রয়েছে যাক্কুম গাছ ও টগবগে ফুটন্ত পানির ঝরণা। তারপর সেখান থেকে খানাপিনা শেষ করার পর তাদেরকে আবার তাদের জাহান্নামে ফিরিয়ে আনা হবে।

৩৮. অর্থাৎ তারা নিজেদের বুদ্ধি ব্যবহার করে তাদের বাপ-দাদাদের থেকে যে রীতি-রেওয়াজ চলে আসছে তা সঠিক কিনা সেকথা কোনদিন চিন্তা করেনি। ব্যাস, যে পথে অন্যদেরকে চলতে দেখেছে চোখ বন্ধ করে তারা সে পথেই চলতে থেকেছে।

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَٰهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَئِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾

আর নূহের পথের অনুসারী ছিল ইবরাহীম। যখন সে তার রবের সামনে হাজির হয় "বিশুদ্ধ চিত্ত" নিয়ে।[৪৪] যখন বলে সে তার পিতা ও তার জাতিকে[৪৫] "এগুলো কি জিনিস যার ইবাদাত তোমরা করছো? আল্লাহকে বাদ দিয়ে কি তোমরা মিথ্যা বানোয়াট মাবুদ চাও? সমস্ত বিশ্ব-জগতের রব আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?"[৪৬]

৩৯. এ বিষয়বস্তুটির সম্পর্ক রয়েছে পেছনের রুকূ'র শেষ বাক্যগুলোর সাথে। সেগুলোর ওপর চিন্তা-ভাবনা করলে এ কাহিনীটি এখানে কেন শুনানো হচ্ছে তা বুঝা যায়।

৪০. এখানে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ফরিয়াদের কথা বলা হয়েছে। দীর্ঘকাল নিজের কওমকে সত্য দীনের দাওয়াত দেবার পর শেষে হতাশ হয়ে তিনি মহান আল্লাহর কাছে এ ফরিয়াদ করেছিলেন। সূরা কামারে এ ফরিয়াদের শব্দগুলো নিম্নোক্তভাবে এসেছে فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ "সে তার রবকে ডেকে বললো, আমি পরাজিত হয়ে গেছি, তুমি আমাকে সাহায্য করো।" (আল কামার, ১০ আয়াত)

৪১. অর্থাৎ একটি চরিত্রহীন ও জালেম জাতির ক্রমাগত বিরোধিতার কারণে তিনিই যে ভয়াবহ যন্ত্রণা, ক্লেশ ও কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এর মধ্যে এ বিষয়টির প্রতিও একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, নূহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সাথিদেরকে যেভাবে সেই মহাক্লেশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, ঠিক তেমনি শেষ পর্যন্ত আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী-সাথিদেরকেও মক্কাবাসীরা যে মহাক্লেশের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তা থেকে উদ্ধার করবো।

৪২. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, যারা হযরত নূহের বিরোধিতা করছিল তাদের বংশধারা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে এবং হযরত নূহেরই বংশধারাকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। দুই, সমস্ত মানব বংশধারাকে খতম করে দেয়া হয়েছে এবং সামনের দিকে কেবলমাত্র নূহ আলাইহিস সালামের সন্তানদের মাধ্যমে এ দুনিয়ার জনবসতিকে বিস্তৃতি দান করা হয়েছে। সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ এ দ্বিতীয় অর্থটিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কুরআন মজীদের শব্দাবলী এ অর্থটির ব্যাপারে সুস্পষ্ট নয়। আসল ব্যাপারটা কি তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

৪৩. অর্থাৎ আজ সারা দুনিয়ায় হযরত নূহের দুর্নাম করার কেউ নেই। নূহের প্লাবনের পর থেকে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে দনিয়াবাসীরা তাঁর সুনামই করে চলছে।

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾
فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

তারপর[৪৭] সে তারকাদের দিকে একবার তাকালো[৪৮] এবং বললো, আমি অসুস্থ।[৪৯] কাজেই তারা তাকে ত্যাগ করে চলে গেলো।[৫০] তাদের পেছনে সে চুপিচুপি তাদের দেবতাদের মন্দিরে ঢুকে পড়লো এবং বললো, "আপনারা খাচ্ছেন না কেন?"[৫১] কি হলো আপনাদের, কথা বলছেন না কেন?" এরপর সে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং ডান হাত দিয়ে খুব আঘাত করলো।

৪৪. রবের সামনে হাজির হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাঁর দিকে রুজু হওয়া এবং সবার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র তাঁর দিকে মুখ করা। আর বিশুদ্ধ চিত্ত (قلب سليم) মানে হচ্ছে "সঠিক ও নিষ্কলুষ অন্তকরণ"। অর্থাৎ সব রকমের বিশ্বাসগত ও নৈতিক ত্রুটিমুক্ত অন্তর। যেখানে কুফরী ও শিরক এবং সন্দেহ-সংশয়ের লেশ মাত্রও নেই। যার মধ্যে নাফরমানী ও বিদ্রোহের কোন সামান্যতম অনুভূতিও পাওয়া যায় না। যার মধ্যে কোন প্রকার প্যাঁচ ও জটিলতা নেই। যা সব ধরনের অসৎ প্রবণতা ও অপবিত্র কামনা-বাসনার সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত। যার মধ্যে কারো বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ ও অকল্যাণ কামনা পাওয়া যায় না এবং যার নিয়তে কোনপ্রকার ত্রুটি ও কৃত্রিমতা নেই।

৪৫. হযরত ইবরাহীমের (আ) এ ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, ৫০-৫৫; মারয়াম, ২৬-২৭; আল আম্বিয়া, ৫১-৬৬ ; আশ্ শূ'আরা, ৫০-৬৪ এবং আল 'আনকাবূত, ২৫-৪৮ টীকা।

৪৬. অর্থাৎ আল্লাহকে তোমরা কী মনে করেছো? তোমরা কি মনে করো, এসব কাঠ-পাথরের তৈরি দেবতারা তাঁর সমজাতীয় হতে পারে? অথবা এরা তাঁর গুণাবলী ও ক্ষমতায় শরীক হতে পারে? আর তোমরা কি এ বিভ্রান্ত চিন্তারও শিকার হয়েছো যে, তাঁর সাথে এত বড় গোস্তাখী করার পর তোমরা তাঁর পাকড়াও থেকে রেহাই পেয়ে যাবে?

৪৭. এখন একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা এসেছে সূরা আল আম্বিয়া, ৫১-৭৩ এবং আল 'আনকাবূতে, ১৬-২৭ আয়াতে।

৪৮. ইবনে আবি হাতেম প্রসিদ্ধ তাবে'ঈ মুফাস্সির কাতাদাহর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, আরবরা نَظَرَ فِى النُّجُوم (সে তারকাদের দিকে তাকালো) শব্দাবলী প্রবাদ বাক্য হিসেবে ব্যবহার করে তার যে অর্থ গ্রহণ করে তা হচ্ছে এই যে, সে ভাবনা-চিন্তা করলো অথবা সে চিন্তা করতে লাগলো। আল্লামা ইবনে কাসীর এ উক্তিটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এমনিতেও প্রায়ই দেখা যায়, যখন কোন ব্যক্তির সামনে চিন্তার কোন বিষয় আসে তখন সে আকাশের দিকে অথবা ওপরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারপর ভেবে-চিন্তে জবাব দেয়।

فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ﴿٩٤﴾ قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ﴿٩٥﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ ﴿٩٧﴾ فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾

(ফিরে এসে) তারা দৌড়ে তার কাছে এলো।[৫২] *সে বললো, "তোমরা কি নিজেদেরই খোদাই করা জিনিসের পূজা করো? অথচ আল্লাহই তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যে জিনিসগুলো তৈরি করো তাদেরকেও।" তারা পরস্পর বললো, "এর জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করো এবং একে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দাও।" তারা তার বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করেছি।*[৫৩]

ইবরাহীম বললো,[৫৪] *"আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি,*[৫৫] *তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। হে পরওয়ারদিগার! আমাকে একটি সৎকর্মশীল পুত্র সন্তান দাও।"*[৫৬]

৪৯. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর জীবনে তিনটে মিথ্যা বলেছিলেন বলে যে কথা বলা হয়ে থাকে এটি তার একটি। অথচ একথাটিকে মিথ্যা বা বাস্তব বিরোধী বলার জন্য প্রথমে কোন উপায়ে একথা জানা উচিত যে, সে সময় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কোন প্রকারের কোন কষ্ট ও অসুস্থতা ছিল না এবং তিনি নিছক বাহানা করে একথা বলেছিলেন। যদি এর কোন প্রমাণ না থেকে থাকে, তাহলে অযথা কিসের ভিত্তিতে একে মিথ্যা গণ্য করা হবে? এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমি তাফহীমুল কুরআন সূরা আল আম্বিয়া, ৬০ টীকায় করেছি এবং আরো কিছু আলোচনা রাসায়েল ও মাসায়েল ২ খণ্ডের ২০–২৪ পৃষ্ঠায় এসে গেছে।

৫০. আসল ব্যাপার কি ছিল তা এ বাক্য নিজেই প্রকাশ করছে। মনে হচ্ছে সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন জাতীয় মেলায় যাচ্ছিল। হযরত ইবরাহীমের পরিবারের লোকেরা তাঁকেও সংগে যেতে অনুরোধ করে থাকবে। তিনি আমার শরীর খারাপ, আমি যেতে পারবো না, বলে ওযর পেশ করে দিয়ে থাকবেন। এখন যদি একথাটা একেবারে অসত্য বা বাস্তব বিরোধী হতো, তাহলে ঘরের লোকেরা তাঁকে বলতো, শরীর–স্বাস্থ্য তো ভালোই আছে দেখতে পাচ্ছি, তাহলে আবার খামখা বাহানা করছো কেন? কিন্তু যখন তারা এ ওজর গ্রহণ করে তাঁকে পেছনে রেখে চলে গেলো তখন এ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে একথা প্রকাশ পায় যে, নিশ্চয়ই হযরত ইবরাহীম সে সময় সর্দি, কাশি অথবা এ ধরনের কোন সাধারণ রোগে ভুগছিলেন, যার ফলে পরিবারের লোকেরা তাঁকে রেখে চলে যেতে রাজি হয়ে যায়।

৫১. এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, মন্দিরে মূর্তিদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাবার জিনিস রাখা হয়েছিল।

৫২. এখানে ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। সূরা আল আম্বিয়ায় এর যে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে তাতে বলা হয়েছে, যখন তারা ফিরে এসে তাদের মন্দিরে সমস্ত মূর্তি ভেঙে পড়ে আছে দেখলো তখন চারদিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো। কিছু লোক বললো, ইবরাহীম নামের এক যুবক মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে নানান কথা বলে বেড়ায়। একথায় জমায়েতের লোকেরা বললো তাকে ধরে আনো। সে অনুসারে একটি দল দৌড়ে তাঁর কাছে এলো এবং তাঁকে সমবেত জনতার সামনে হাজির করলো।

৫৩. সূরা আল আম্বিয়ার ৬৯ আয়াতের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

"আমি বললাম, হে আগুন! শীতল হয়ে যাও এবং নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য।"

সূরা আল আনকাবূতের ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَاَنْجٰهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ (তারপর আল্লাহ থাকে আগুন থেকে উদ্ধার করলেন) এ থেকে প্রমাণ হয়, তারা হযরত ইবরাহীমকে (আ) আগুনে নিক্ষেপ করেছিল এবং তারপর আল্লাহ তাঁকে তা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন। "তারা তাঁর বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপ নিতে চাচ্ছিল কিন্তু আমি তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করেছি" আয়াতের এ শব্দগুলোকে এ অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে না যে, তারা হযরত ইবরাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। বরং ওপরে উল্লেখিত আয়াতের সাথে মিলিয়ে দেখলে তার এ অর্থটিই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, তারা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতে চাচ্ছিল কিন্তু তা করতে পারেনি। অলৌকিকভাবে বেঁচে যাবার ফলে হযরত ইবরাহীমের (আ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়ে গেলো এবং মুশরিকদেরকে আল্লাহ হেয়প্রতিপন্ন করলেন। এ ঘটনাটি বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরাইশদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া যে, তোমরা যে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তান হবার গর্ব করে থাকো তাঁর নীতি তা ছিল না যা তোমরা অবলম্বন করেছো বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম যে নীতি অবলম্বন করেছেন সেটিই ছিল তাঁর নীতি। এখন যদি তোমরা তাঁকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য এমন ধরনের চক্রান্ত করো যা হযরত ইবরাহীমের জাতি তাঁর বিরুদ্ধে করেছিল, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরাই হেয়প্রতিপন্ন হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয়-প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের নেই।

৫৪. আগুন থেকে সুস্থ শরীরে স্বাচ্ছন্দে বেরিয়ে আসার পর যখন হযরত ইবরাহীম (আ) দেশ থেকে বের হয়ে যাবার ফায়সালা করলেন তখন চলার সময় একথাগুলো বলেন।

৫৫. এর অর্থ হচ্ছে, আমি আল্লাহর জন্য বের হয়ে পড়ছি। কারণ আমি আল্লাহর হয়ে গেছি, তাই আমার জাতি আমার শত্রু হয়ে গেছে। নয়তো আমার ও তার মধ্যে কোন দুনিয়াবী ঝগড়া ছিল না এবং এর ভিত্তিতে আমাকে স্বদেশ ত্যাগ করতে হচ্ছে না। তাছাড়া

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْۤ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّاۤ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰۤاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾

(এ দোয়ার জবাবে) আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।[৫৭] সে পুত্র যখন তার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে পৌঁছুলো তখন (একদিন) ইবরাহীম তাকে বললো, "হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি তোমাকে আমি যবেহ করছি,[৫৮] এখন তুমি বল তুমি কি মনে কর?"[৫৯] সে বললো, "হে আব্বাজান! আপনাকে যা হুকুম দেয়া হচ্ছে[৬০] তা করে ফেলুন, আপনি আমাকে ইনশাআল্লাহ সবরকারীই পাবেন।" শেষ পর্যন্ত যখন এরা দু'জন আনুগত্যের শির নত করে দিল এবং ইবরাহীম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল[৬১] এবং আমি আওয়াজ দিলাম,[৬২] "হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়ে দিয়েছো।[৬৩] আমি সৎকর্মকারীদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি[৬৪] নিশ্চিতভাবেই এটি ছিল একটি প্রকাশ্য পরীক্ষা।"[৬৫]

দুনিয়ায় আমার যাবার মতো কোন ঠিকানা নেই। সমগ্র দেহ-প্রাণকে তাকদীরের হাতে ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর ভরসায় বের হয়ে পড়ছি। যেদিকে তিনি নিয়ে যাবেন সেদিকেই চলে যাবো।

৫৬. এ দোয়া থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে একথা জানা যায় যে, হযরত ইবরাহীম সে সময় সন্তানহীন ছিলেন। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, তিনি কেবলমাত্র নিজের এক স্ত্রী ও এক ভাতিজাকে (হযরত লূত) সাথে নিয়ে দেশ থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। সে সময় স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে এ কামনার উদ্ভব হয়ে থাকবে যে, আল্লাহ যেন তাঁকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দান করেন, যে এ প্রবাস জীবনে তাঁর দুঃখ লাঘব করতে সাহায্য করবে।

৫৭. দোয়া করতে করতেই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, এ থেকে একথা মনে করার কোন কারণ নেই। কুরআন মজীদেরই অন্য স্থানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ

"আল্লাহর শোকর, তিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন।"
(ইবরাহীম, ৩৯)

এ থেকে প্রমাণ হয়, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়া এবং এ সুসংবাদের মধ্যে বহু বছরের ব্যবধান ছিল। বাইবেল বর্ণনা করছে, হযরত ইসমাঈলের (আ) জন্মের সময় হযরত ইবরাহীমের (আ) বয়স ছিল ৮৬ বছর। (আদি পুস্তক ১৬ ঃ ১৬) অন্যদিকে হযরত ইসহাকের জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল একশত বছর (৫ ঃ ২১)

৫৮. একথা মনে রাখতে হবে, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে দেখেননি যে, তিনি পুত্রকে যবেহ করে ফেলেছেন। বরং তিনি দেখেছিলেন, তিনি তাকে যবেহ করছেন। যদিও তিনি তখন স্বপ্নের এ অর্থই নিয়েছিলেন যে, তিনি পুত্রকে যবেহ করবেন। এ কারণে তিনি ঠাণ্ডা মাথায় পুত্রকে কুরবানী করে দেবার জন্য একেবারেই তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বপ্ন দেখাবার মধ্যে মহান আল্লাহ যে সূক্ষ্ম বিষয় সামনে রেখেছিলেন তা সামনের ১০৫ আয়াতে তিনি নিজেই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

৫৯. পুত্রকে একথা জিজ্ঞেস করার এ অর্থ ছিল না যে, তুমি রাজি হয়ে গেলে আল্লাহর হুকুম তামিল করবো অন্যথায় করবো না। বরং হযরত ইবরাহীম আসলে দেখতে চাচ্ছিলেন, তিনি যে সৎসন্তানের জন্য দোয়া করেছিলেন সে যথার্থই কতটুকু সৎ। যদি সে নিজে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষে প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে এর অর্থ হয়, দোয়া পুরোপুরি কবুল হয়েছে এবং পুত্র নিছক শারীরিক দিক দিয়েই তাঁর সন্তান নয় বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও তাঁর সুসন্তান।

৬০. এ শব্দগুলো পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, নবী–পিতার স্বপ্নকে পুত্র নিছক স্বপ্ন নয় বরং আল্লাহর হুকুম মনে করেছিলেন। এখন যদি যথার্থই এটি আল্লাহর হুকুম না হতো তাহলে অবশ্যই আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বা ইংগিতের মাধ্যমে বলে দিতেন যে, ইবরাহীম–পুত্র ভুলে একে হুকুম মনে করে নিয়েছে। কিন্তু পূর্বাপর আলোচনায় এর কোন ইংগিত নেই। এ কারণে নবীদের স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন নয় বরং তাও হয় এক ধরনের অহী, মুসলমানরা এ বিশ্বাস পোষণ করে। একথা সুস্পষ্ট, যে কথার মাধ্যমে এতবড় একটি নিয়ম আল্লাহর শরীয়াতের অন্তরভুক্ত হতে পারে তা যদি সত্য ভিত্তিক না হতো বরং নিছক একটি বিভ্রান্তি হতো তাহলে আল্লাহ তার প্রতিবাদ করতেন না, এটা হতো একটি অসম্ভব ব্যাপার। কুরআনকে যারা আল্লাহর কালাম বলে মানে তাদের পক্ষে আল্লাহর এ ধরনের ভুল হয়ে যেতে পারে একথা মেনে নেয়া একেবারেই অসম্ভব।

৬১. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) যবেহ করার জন্য পুত্রকে চিৎ করে শোয়াননি বরং উপুড় করে শুইয়ে দিয়েছেন, যাতে যবেহ করার সময় পুত্রের মুখ দেখে কোন প্রকার স্নেহ–মমতার বসে তাঁর হাত কেঁপে না যায়। তাই তিনি নিচের দিক থেকে হাত রেখে ছুরি চালাতে চাচ্ছিলেন।

৬২. ব্যাকরণবিদদের একটি দল বলেন, এখানে "এবং" শব্দটি "তখন" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বাক্যটি হবে—"যখন এরা দু'জন আনুগত্যের শির নত করে দিল এবং ইবরাহীম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল তখন আমি আওয়াজ দিলাম।" কিন্তু অন্য একটি দল বলেন, এখানে "যখন" শব্দটির জওয়াব উহ্য রয়ে গেছে এবং তাকে শ্রোতার মনের

একটি বড় কুরবানীর বিনিময়ে আমি এ শিশুটিকে ছাড়িয়ে নিলাম[৬৬] এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে চিরকালের জন্য তার প্রশংসা রেখে দিলাম। শান্তি বর্ষিত হোক ইব্‌রাহীমের প্রতি। আমি সৎকর্মকারীদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চিতভাবেই সে ছিল আমার মুসলিম বান্দাদের অন্তরভুক্ত। আর আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, সে ছিল সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী। আর বরকত দিলাম তাকে ও ইসহাককে,[৬৭] এখন এ দু'জনের বংশধরদের মধ্য থেকে কতক সৎকর্মকারী আবার কতক নিজেদের প্রতি সুস্পষ্ট জুলুমকারী।[৬৮]

কল্পনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কারণ কথা এত বড় ছিল যে, তাকে শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করার পরিবর্তে কল্পনারই জন্য ছেড়ে দেয়া বেশী সংগত ছিল। আল্লাহ যখন দেখে থাকবেন বুড়ো বাপ তার বুড়ো বয়সের আকাংখায় চেয়ে পাওয়া পুত্রকে নিছক তাঁর সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরবানী করে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেছেন এবং পুত্রও নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেছে, তখন এ দৃশ্য দেখে রহমতের দরিয়া কেমন নাজানি উথলে উঠে থাকবে এবং দুই পিতা-পুত্রের প্রতি মালিকের প্রেম কেমন নাজানি বাঁধনহারা হয়ে গিয়ে থাকবে, তা কেবল কল্পনাই করা যেতে পারে। কথায় তার অবস্থা যতই বর্ণনা করা হোক না কেন তা ব্যক্ত করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। বরং বর্ণনায় তার আসল দৃশ্যের অতি অল্পই ফুটে উঠবে।

৬৩. অর্থাৎ তুমি পুত্রকে যবেহ করে দিয়েছো এবং তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেছে, এটা তো আমি তোমাকে দেখাইনি। বরং আমি দেখিয়েছিলাম, তুমি যবেহ করছো। তুমি সে স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়ে দিলে। কাজেই এখন তোমার সন্তানের প্রাণবায়ু বের করে নেয়া আমার লক্ষ নয়। আসল উদ্দেশ্য যা কিছু ছিল তা তোমার সংকল্প, উদ্যোগ ও প্রস্তুতিতেই সফল হয়ে গেছে।

৬৪. অর্থাৎ যারা সৎকর্মের পথ অবলম্বন করে তাদেরকে আমি খামখা কষ্টের মধ্যে ফেলে দেবার এবং দুঃখ ও ক্লেশের মুখোমুখি করার জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন করি না। বরং তাদের উন্নত গুণাবলী বিকশিত করার এবং তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করার জন্যই তাদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করি। তারপর পরীক্ষার খাতিরে তাদেরকে যে সংকট

সাগরে নিক্ষেপ করি তা থেকে নিরাপদে উদ্ধারও করি। তাই দেখো, পুত্রের কুরবানীর জন্য তোমার উদ্যোগ প্রবণতা ও প্রস্তুতিই তোমাকে এমন মর্যাদা দানের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে, যা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য যথার্থই পুত্র উৎসর্গকারী লাভ করতে পারতো। এভাবে আমি তোমার পুত্রের প্রাণও রক্ষা করলাম এবং তোমাকে এ উচ্চ মর্যাদাও দান করলাম।

৬৫. অর্থাৎ তোমার হাতে তোমার পুত্রকে যবেহ করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং দুনিয়ার কোন জিনিসকে তুমি আমার মোকাবিলায় বেশী প্রিয় মনে করো কিনা, সে পরীক্ষা নেয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

৬৬. "বড় কুরবানী" বলতে বাইবেল ও ইসলামী বর্ণনা অনুসারে একটি ভেড়া। সে সময় আল্লাহর ফেরেশ্‌তা হযরত ইবরাহীমের সামনে এটি পেশ করেন পুত্রের পরিবর্তে একে যবেহ করার জন্য। একে "বড় কুরবানী" বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এটি ইবরাহীমের ন্যায় আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দার জন্য ইবরাহীম পুত্রের ন্যায় ধৈর্যশীল ও প্রাণ উৎসর্গকারী পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে ছিল এবং আল্লাহ একে একটি নজীর বিহীন কুরবানীর নিয়ত পুরা করার অসিলায় পরিণত করেছিলেন। এ ছাড়াও একে "বড় কুরবানী" গণ্য করার আর একটি বড় কারণ দিয়েছেন যে, এ তারিখে সারা দুনিয়ার সমস্ত মু'মিন পশু কুরবানী করবে এবং বিশ্বস্ততা ও প্রাণ উৎসর্গীতার এ মহান ঘটনার স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করতে থাকবে।

৬৭. এখানে এসে আমাদের সামনে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর যে পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং যিনি স্বতস্ফূর্তভাবে নিজেকে এ কুরবানীর জন্য পেশ করে দিয়েছিলেন তিনি কে ছিলেন? সর্বপ্রথম এ প্রশ্নের জবাব আমাদের সামনে আসছে বাইবেল থেকে ঃ

> "ঈশ্বর আব্রাহামের পরীক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হে আব্রাহাম ....তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইস্‌হাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও এবং তথাকার যে এক পর্ব্বতের কথা আমি তোমাকে বলিব, তাহার উপরে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর।"
>
> (আদিপুস্তক ২২ ঃ ১-২)

এ বর্ণনায় একদিকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ হযরত ইসহাকের কুরবানী চেয়েছিলেন আবার অন্যদিকে একথাও বলা হচ্ছে, তিনি একমাত্র পুত্র ছিলেন। অথচ বাইবেলের নিজেরই অন্যান্য বর্ণনা থেকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হয় যে, হযরত ইসহাক একমাত্র পুত্র ছিলেন না। তাই বাইবেলের নিম্নোক্ত বিস্তারিত বক্তব্যটি একবার দেখুন ঃ

> "আব্রামের স্ত্রী সারী নিঃসন্তানা ছিলেন, এবং হাগার নামে তার এক মিস্রীয় দাসী ছিল। তাহাতে সারী আব্রামকে কহিলেন, দেখ সদাপ্রভু আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন; বিনয় করি, তুমি আমার দাসীর কাছে গমন কর, কি জানি ইহা দ্বারা আমি পুত্রবতী হইতে পারিব। তখন আব্রাম সারীর বাক্যে সম্মত হইলেন। এইরূপে কানান দেশে আব্রাম দশ বৎসর বাস করিলে পর আব্রামের স্ত্রী সারী আপন দাসী মিস্রীয়া হাগারকে লইয়া আপন স্বামী আব্রামের সহিত বিবাহ দিলেন। পরে আব্রাম হাগারের কাছে গমন করিলে সে গর্ভবতী হইল।" (আদি পুস্তক ১৬ ঃ ১-৪)

"সদাপ্রভুর দূত তাহাকে আরও কহিলেন, দেখ, তোমার গর্ভ হইয়াছে, তুমি পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম ইশ্মায়েল [ঈশ্বর শুনেন] রাখিবে।" (আদিপুস্তক ১৬ ঃ ১১)

"আব্রামের ছেয়াশী বৎসর বয়সে হাগার আব্রামের নিমিত্তে ইশ্মায়েলকে প্রসব করিল।" (১৬ ঃ ১৬)

"আর ঈশ্বর আব্রাহামকে কহিলেন, তুমি তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলিয়া ডাকিওনা, তাহার নাম সারা [রানী] হইল.........তাহা হইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব;.........তুমি তাহার নাম ইস্হাক [হাস্য] রাখিবে,......আগামী বৎসরের এই ঋতুতে সারা তোমার নিমিত্তে যাহাকে প্রসব করিবে, ...পরে আব্রাহাম আপনপুত্র ইশ্মায়েলকে ও ....গৃহে যত পুরুষ ছিল, সেই সকলকে লইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই দিনে তাহাদের লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন করিলেন। আব্রাহামের লিঙ্গাগ্রের ত্বক ছেদন কালে তাঁহার বয়স নিরানব্বই বৎসর। আর তাঁহার পুত্র ইশ্মায়েলের লিঙ্গাগ্রের ত্বক ছেদন কালে তাহার বয়স তের বৎসর।" (আদি পুস্তক ১৭ঃ ১৫-২৫)

"আব্রাহামের একশত বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র ইসহাকের জন্ম হয়।"

(আদিপুস্তক ২১ ঃ ৫)

এ থেকে বাইবেলের বর্ণনার বৈপরীত্য পরিষ্কার সামনে এসে যায়। একথা সুস্পষ্ট, ১৪ বছর পর্যন্ত হযরত ইসমাঈল (আ) হযরত ইবরাহীমের (আ) একমাত্র সন্তান ছিলেন। এখন যদি একমাত্র পুত্রের কুরবানী চাওয়া হয়ে থাকে তাহলে তা হযরত ইসহাকের নয় বরং ইসমাঈলের কুরবানী ছিল। কারণ তিনিই ছিলেন একমাত্র সন্তান। আর যদি হযরত ইসহাকের কুরবানী চাওয়া হয়ে থাকে তাহলে আবার একথা বলা ঠিক নয় যে, একমাত্র সন্তানের কুরবানী চাওয়া হয়েছিল।

এরপর আমরা ইসলামী বর্ণনাগুলোর প্রসংগে আসতে পারি। সেখানে দেখি ভীষণ মতবিরোধ। মুফাস্সিরগণ সাহাবা ও তাবেঈগণের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তাতে একটি দলের উক্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীমের পুত্র হযরত ইসহাক। এ দলে রয়েছেন নিম্নোক্ত মনীষীগণ ঃ

হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবু হুরাইরাহ (রা), কাতাদাহ, ইকরামাহ, হাসান বাসরী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, মুজাহিদ, শা'বী, মাসরূক, মাকহূল, যুহরী, আতা, মুকাতিল, সুদ্দী, কা'ব আহবার, যায়েদ ইবনে আসলাম এবং আরো অনেকে।

দ্বিতীয় দলটি বলেন, তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল। এ দলে রয়েছেন নিম্নোক্ত মনীষীগণ ঃ

হযরত আবুবকর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবু হুরাইরাহ (রা), হযরত মু'আবীয়াহ (রা), ইকরামাহ, মুজাহিদ, ইউসুফ ইবনে মেহরান, হাসান বাসরী, মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কুরযী, শা'বী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, দ্বাহ্হাক, মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন

(মুহাম্মাদ আল বাকের), রাবী' ইবনে আনাস, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং আরো অনেকে।

এ দু'টি তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এর মধ্যে অনেকগুলো নাম উভয় তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ একজন মনীষী বিভিন্ন সময় দু'টি ভিন্ন উক্তি করেছেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে ইকরামাহ এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীমের পুত্র হযরত ইসহাক। কিন্তু তাঁরই থেকে আতা ইবনে আবী রাবাহ একথা উদ্ধৃত করেছেন : زعمت اليهود انه اسحق وكذبت اليهود (ইহুদীদের দাবী হচ্ছে, তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক কিন্তু ইহুদীরা মিথ্যা বলেছে) অনুরূপভাবে হযরত হাসান বাসরী থেকে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি হযরত ইসহাকের কুরবানীর প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু আমর ইবনে উবাইদ বলেন, হাসান বাসরীর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না যে, হযরত ইবরাহীমের (আ) যে পুত্রকে যবেহ করার হুকুম হয়েছিল তিনি ছিলেন হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম।

এ বর্ণনার বিভিন্নতার ফলে মুসলিম আলেমগণের একটি দল পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে হযরত ইসহাকের পক্ষে রায় দিয়েছেন। যেমন ইবনে জারীর ও কাযী ঈয়ায। অনেকে চূড়ান্তভাবে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, হযরত ইসমাঈলকেই যবেহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেমন ইবনে কাসীর। আবার কেউ কেউ সংশয়াপন্ন। যেমন জালালুদ্দীন সুয়ূতী। কিন্তু গবেষণা ও অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসমাঈলকেই যবেহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর সপক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তি রয়েছে :

এক : ওপরে কুরআন মজীদের এ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, স্বদেশ থেকে হিজরাত করার সময় হযরত ইবরাহীম (আ) একটি সৎকর্মশীল পুত্রের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। এর জবাবে আল্লাহ তাঁকে একটি ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। বক্তব্যের অন্তরনিহিত অর্থ পরিষ্কার একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ দোয়া ঠিক তখন করা হয়েছিল যখন তিনি ছিলেন সন্তানহীন। আর যে সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল সেটি ছিল তাঁর প্রথম সন্তান। তারপর কুরআনের বক্তব্যের ধারাবাহিক বর্ণনা থেকে একথাও প্রকাশ হয় যে, সে শিশুটিই যখন পিতার সাথে দৌড় ঝাঁপ করার যোগ্য হয়ে গেলো তখন তাকে যবেহ করার ইশারা করা হলো। এখন একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত যে, হযরত ইবরাহীমের (আ) প্রথম সন্তান ছিলেন হযরত ইসমাঈল। হযরত ইসহাক প্রথম সন্তান ছিলেন না, কুরআনে হযরত ইবরাহীমের সন্তানদের ধারাবাহিকতার বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ (ابراهيم : ٣٩)

দুই : কুরআন মজীদে যেখানে হযরত ইসহাকের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে সেখানে তাঁর জন্য "গোলামুন আলীমুন" (জ্ঞানবান বালক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে : فَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ (الزاريات : ٢٨) এবং لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ (الحجر : ٥٣) কিন্তু এখানে যে সন্তানটির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তার জন্য "গোলামুন হালীমুন" (ধৈর্যশীল বালক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, দুই পুত্রের দু'টি পৃথক বৈশিষ্ট

ছিল এবং যবেহ করার হুকুমটি জ্ঞানবান সন্তানের জন্য ছিল না, ছিল ধৈর্যশীল সন্তানের জন্য।

তিন ঃ কুরআন মজীদে হযরত ইসহাকের সুসংবাদ দেবার সাথে সাথেই এ সুসংবাদও দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর গৃহে ইয়াকূবের মতো পুত্র সন্তান জন্ম নেবে ঃ

فَبَشَّرْنَاهَا بِاسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ (هود : ٧١)

এখন একথা পরিষ্কার যে, সন্তান জন্মের খবর দেবার সাথে সাথেই তার ওখানে একটি সুযোগ্য পুত্রসন্তানের জন্মেরও খবর দেয়া হয়ে গিয়ে থাকে, তার ব্যাপারে যদি হযরত ইবরাহীমকে এ স্বপ্ন দেখানো হয় যে, তিনি তাকে যবেহ করছেন, তাহলে হযরত ইবরাহীম কখনো একথা বুঝতে পারতেন না যে, তাঁর এ পুত্রকে কুরবানী করে দেবার ইংগিত করা হচ্ছে। আল্লামা ইবনে জারীর এ যুক্তিটির জবাবে বলেন, সম্ভবত এ স্বপ্নটি হযরত ইবরাহীমকে এমন এক সময় দেখানো হয় যখন হযরত ইসহাকের গৃহে হযরত ইয়াকুবের জন্ম হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে এটি ঐ যুক্তির একটি অত্যন্ত দুর্বল জবাব। কুরআন মজীদের শব্দ হচ্ছে ঃ "যখন ছেলেটি বাপের সাথে দৌড় ঝাঁপ করার যোগ্য হয়ে গেলো" ঠিক এ সময়ই এ স্বপ্নটি দেখানো হয়েছিল। যে ব্যক্তি মুক্ত মনে এ শব্দগুলো পড়বে তার সামনে ভেসে উঠবে আট দশ বছরের একটি ছেলের ছবি। কোন জোয়ান ব্যক্তি যিনি সন্তানের পিতা তাঁর সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে বলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

চার ঃ কুরআনে আল্লাহ সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করার পর শেষে বলছেন, "আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছি, সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী।" এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, যে পুত্রকে যবেহ করার ইংগিত দেয়া হয়েছিল, এটি সে পুত্র নয়। বরং পূর্বে অন্য কোন পুত্রের সুসংবাদ দেয়া হয়। তারপর যখন সে পিতার সাথে দৌড়াদৌড়ি ও চলাফেরা করার যোগ্যতা অর্জন করে তখনই তাকে যবেহ করার হুকুম হয়। তারপর যখন হযরত ইবরাহীম এ পরীক্ষায় সফলকাম হয়ে যান তখন তাঁকে আর এক সন্তান অর্থাৎ ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়। ঘটনার এ বিন্যাস চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করে যে, যে পুত্রটিকে যবেহ করার হুকুম হয়েছিল তিনি হযরত ইসহাক ছিলেন না। বরং তাঁর কয়েক বছর আগে সে পুত্রের জন্ম হয়েছিল। আল্লামা ইবনে জারীর এ সুস্পষ্ট যুক্তিটি এ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, প্রথমে কেবলমাত্র হযরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল, তারপর যখন তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন তখন তাঁর নবী হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলো। কিন্তু এটি তাঁর প্রথম জবাবটি থেকেও দুর্বলতর। সত্যই যদি ব্যাপার এটাই হতো, তাহলে আল্লাহ এভাবে বলতেন না ঃ "আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দেই, সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে একজন নবী।" বরং তিনি বলতেন, আমি তাকে এ সুসংবাদ দেই যে, তোমার এ পুত্র একজন নবী হবেন সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে।

পাঁচ ঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত যে, হযরত ইসমাঈলের বিনিময়ে যে ভেড়াটি যবেহ করা হয়েছিল তার শিং কা'বাঘরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের (রা) যামানা পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যখন হরম শরীফে ইবনে যুবাইরকে (রা) অবরোধ করে এবং কা'বাঘর ভেঙে ফেলে তখন এ শিংও নষ্ট হয়ে যায়।

ইবনে আব্বাস ও আমের শা'বী উভয়ই এ মর্মে সাক্ষ দেন যে, তারা নিজেরা কা'বাঘরে এ শিং দেখেছিলেন (ইবনে কাসীর) এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরবানীর এ ঘটনা সিরিয়ায় নয়, মক্কা মু'আয্যমায় সংঘটিত হয়েছিল এবং হযরত ইসমাঈলের সাথেই ঘটেছিল। তাইতো হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নির্মিত কা'বাঘরে তার স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল।

ছয় ঃ শত শত বছর থেকে আরবীয় বর্ণনাসমূহে ও কিংবদন্তীতে একথা সংরক্ষিত ছিল যে, কুরবানীর এ ঘটনা ঘটেছিল মিনায়। আর এটা শুধুমাত্র কিংবদন্তীই ছিল না বরং সে সময় থেকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানা পর্যন্ত হজ্জের কর্মকাণ্ডের মধ্যে এ কাজটিও নিয়মিতভাবে শামিল হয়ে আসছিল যে, এ মিনা নামক স্থানে যেখানে হযরত ইবরাহীম কুরবানী করেছিলেন প্রত্যেক ব্যক্তি সেখানে গিয়ে পশু কুরবানী করতো। তারপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন হলো তখন তিনিও এ পদ্ধতি অব্যাহত রাখেন। এমন কি আজো হজ্জের সময় যিলহজ্জের দশ তারিখে মিনায় কুরবানী করা হয়। সাড়ে চার হাজার বছরের এ অবিচ্ছিন্ন কার্যক্রম একথার অনস্বীকার্য প্রমাণ পেশ করে যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ কুরবানীর উত্তরাধিকারী ছিল বনী ইসমাঈল, বনী ইসহাক নয়। হযরত ইসহাকের বংশে এ ধরনের কোন রেওয়াজ কোন দিন জারি থাকেনি, যাতে সমস্ত জাতি একসাথে কুরবানী করতো এবং তাকে হযরত ইবরাহীমের কুরবানীর স্মৃতি বলা হতো।

এগুলো এমন ধরনের যুক্তি যেগুলো সামনে রাখার পর একথা বিস্ময়কর মনে হচ্ছে যে, স্বয়ং উম্মতে মুসলিমার মধ্যে হযরত ইসহাকের আল্লাহর জন্য কুরবানী হবার ধারণা কেমন করে বিস্তার লাভ করলো। ইহুদীরা যদি হযরত ইসমাঈলকে এ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে তাদের দাদা হযরত ইসহাকের সাথে একে সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা করে, তাহলে এটি একটি বোধগম্য বিষয় হয় কিন্তু মুসলমানদের একটি বিরাট দল তাদের এ প্রতারণা গ্রহণ করলো কেমন করে? এ প্রশ্নের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী জবাব দিয়েছেন আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে। তিনি বলেন ঃ

"প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহই জানেন। তবে বাহ্যত মনে হয়, এ সমস্ত উক্তি (হযরত ইসহাকের আল্লাহর জন্য কুরবানী হবার পক্ষে যেগুলো বলা হয়েছে) কা'ব আহবার থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি যখন হযরত উমরের (রা) আমলে মুসলমান হন তখন মাঝে মধ্যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রাচীন কিতাবসমূহের বাণী তাঁদেরকে পড়ে শুনাতেন এবং হযরত উমর (রা) সেসব শুনতেন। এ কারণে অন্য লোকেরাও তাঁর কথা শুনতে শুরু করে এবং তিনি যেসব ভালো–মন্দ বর্ণনা করতেন সেগুলো তারা বর্ণনা করতে শুরু করে। অথচ এ উম্মতের জন্য তাঁর এ তথ্য সম্ভারের মধ্য থেকে কোন জিনিসেরই প্রয়োজন ছিল না।"

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযীর একটি রেওয়ায়াত এ প্রশ্নটির ওপর আরো কিছুটা আলোকপাত করে। তিনি বর্ণনা করেন, একবার আমার উপস্থিতিতে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের (র) সামনে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আল্লাহর জন্যে যবেহ করা হয়েছিল কাকে, হযরত ইসহাককে না হযরত ইসমাঈলকে? সে সময় এমন এক ব্যক্তিও মজলিসে হাজির ছিলেন যিনি পূর্বে ইহুদী আলেমদের অন্তরভুক্ত ছিলেন এবং পরে সাচ্চা দিলে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি বলেন, "হে আমীরুল মু'মেনীন! আল্লাহর কসম, তিনি

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

৪ রুকূ'

আমি অনুগ্রহ করেছি মূসা ও হারূনের প্রতি। তাদের উভয়কে ও তাদের জাতিকে উদ্ধার করেছি মহাক্লেশ থেকে।[৬৯] *তাদেরকে সাহায্য করেছি, যার ফলে তারাই বিজয়ী হয়েছে। তাদের উভয়কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট কিতাব দান করেছি। উভয়কে সঠিক পথ দেখিয়েছি এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তাদের উভয়ের সম্পর্কে সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছি। মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম। সৎকর্মশীলদের আমি অনুরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি। আসলে তারা আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তরভুক্ত ছিল।*

ইসমাঈল ছিলেন। ইহুদীরা একথা জানে কিন্তু আরবদের প্রতি হিংসাবশত তারা দাবী করে যে, হযরত ইসহাককে আল্লাহর জন্য যবেহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। (ইবনে জারীর) এ দু'টি কথাকে মিলিয়ে দেখলে জানা যায়, আসলে এটা ছিল ইহুদী প্রচারণার প্রভাব এবং মুসলমানদের মধ্যে এ প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। আর মুসলমানরা যেহেতু তাত্বিক বিষয়ে সবসময় বিদ্বেষ ও স্বার্থপ্রীতি মুক্ত থেকেছে তাই তাদের অনেকেই প্রাচীন সহীফাগুলোর বরাত দিয়ে ঐতিহাসিক বর্ণনার ছদ্মাবরণে ইহুদীরা যেসব বর্ণনা পেশ করতো সেগুলোকে নিছক একটি তাত্বিক সত্য মনে করে গ্রহণ করে নেয় এবং একথা চিন্তা করেনি যে, এর মধ্যে তত্বের পরিবর্তে বিদ্বেষ ও স্বার্থপ্রীতি সক্রিয় রয়েছে।

৬৮. যে উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীমের কুরবানীর কাহিনী এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এ বাক্যটি তার সমগ্র অবয়বের ওপর আলোকপাত করে। হযরত ইবরাহীমের দুই পুত্রের বংশ থেকে দু'টি সুবিশাল জাতির সৃষ্টি হয়। একটি বনী ইসরাঈল জাতি। তাদের মধ্যে জন্ম হয় দুনিয়ার দু'টি বড় ধর্মমত (ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ)। তারা পৃথিবীর অনেক বড় ও বিস্তৃত অংশকে নিজেদের অনুসারী করে। দ্বিতীয়টি বনী ইসমাঈল জাতি। কুরআন নাযিলের সময় তারা ছিল সমগ্র আরববাসীর নেতা ও অনুসরণযোগ্য। সে সময় মক্কা মু'আয্যমার কুরাইশ গোত্র তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী ছিল। ইবরাহীমী বংশধারার এ দু'টি শাখা যে উন্নতি, বিস্তৃতি ও খ্যাতি অর্জন করে তা সম্ভব হয় হযরত

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾

আর ইলিয়াসও অবশ্যই রসূলদের একজন ছিল।[৭০] স্মরণ করো যখন সে তার জাতিকে বলেছিল, "তোমরা ভয় করো না? তোমরা কি বা'আলকে[৭১] ডাকো এবং পরিত্যাগ করো শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহকে, যিনি তোমাদের ও তোমাদের আগের পেছনের বাপ-দাদাদের রব?" কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো কাজেই এখন নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে শাস্তির জন্য পেশ করা হবে, তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া।[৭২] আর ইলিয়াসের সম্পর্কে সুখ্যাতি আমি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অব্যাহত রেখেছি।[৭৩]

ইবরাহীম ও তাঁর দুই মহান মর্যাদা সম্পন্ন পুত্রের সাথে তাদের রক্ত সম্পর্কের কারণে। নয়তো দেখা যায়, দুনিয়ায় এমন কত শত পরিবারের উদ্ভব হয়েছে এবং কালক্রমে অপরিচিতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এখন মহান আল্লাহ এ পরিবারের ইতিহাসের সবচেয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল কর্মকাণ্ড বর্ণনা করার পর এ উভয় দলকে এ অনুভূতি দান করছেন যে, তোমরা দুনিয়ায় যা কিছু মর্যাদা লাভ করেছো, এসবের মূলে রয়েছে তোমাদের বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইহিমুস সালাম প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর আনুগত্য, নিঃস্বার্থ আন্তরিকতা ও আল্লাহর হুকুমের জন্য উৎসর্গিত প্রাণের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। তিনি তাদেরকে বলেন, আমি তাদেরকে যে বরকত ও সমৃদ্ধি দান করেছিলাম এবং নিজের দয়া ও অনুগ্রহের যে বারিধারা তাদের প্রতি বর্ষণ করেছিলাম তা চোখ বন্ধ করে বর্ষণ করিনি। আমি এমনি সহসাই কোন কারণ ছাড়াই এক ব্যক্তি ও তাঁর দুই পুত্রকে বাছাই করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যের ঝরণাধারা প্রবাহিত করিনি। বরং তাঁরা নিজেদের প্রকৃত মালিক ও প্রভুর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার কিছু প্রমাণ পেশ করেছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে এসব অনুগ্রহের হকদার হয়েছিলেন। এখন তোমরা নিছক তাদের আওলাদ এ অহংকারের ভিত্তিতে সেসব অনুগ্রহ ও নিয়ামতের হকদার হতে পারো না। আমি তো অবশ্যই দেখবো, তোমাদের মধ্যে কে সৎকর্মশীল এবং কে জালেম ও পাপাচারী। তারপর যে যেমনটি হবে তার সাথে ঠিক তেমনি ধরনেরই ব্যবহার করা হবে।

৬৯. অর্থাৎ ফেরাউন ও তার জাতি তাদেরকে যে ভয়াবহ বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল তা থেকে।

৭০. হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলের নবীদের অন্তরভুক্ত ছিলেন। কুরআন মজীদে মাত্র দু'জায়গায় তাঁর আলোচনা এসেছে। এ জায়গায় এবং সূরা আল আন'আমের ৮৫ আয়াতে। আধুনিক গবেষকগণ খৃষ্টপূর্ব ৮৭৫ থেকে ৮৫০ এর মধ্যবর্তী সময়টাকে তাঁর সময় হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি ছিলেন জিল'আদ-এর অধিবাসী (প্রাচীন যুগে জিল'আদ বলা হতো বর্তমান জর্দান রাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলীয় জিলাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ইয়ারমুক নদীর দক্ষিণে অবস্থিত এলাকাকে)। বাইবেলে তাঁকে এলিয় তিশ্‌বী (Elijah the Tishbite) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী নিচে দেয়া হলো :

হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামের ইন্তেকালের পরে তাঁর পুত্র রহব'আম (Rehoboam)-এর অযোগ্যতার ফলে বনী ইসরাঈল রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগে ছিল বাইতুল মাকদিস ও দক্ষিণ ফিলিস্তীন। এটি ছিল দাউদের পরিবারের অধিকারভুক্ত। আর উত্তর ফিলিস্তীন সমন্বয়ে গঠিত দ্বিতীয় ভাগটিতে ইসরাঈল নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পরে সামেরীয়া তার কেন্দ্রীয় স্থান হিসেবে গণ্য হয়। যদিও উভয় রাষ্ট্রের অবস্থাই ছিল দোদুল্যমান কিন্তু ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রথম থেকেই এমন মারাত্মক বিকৃতির পথে এগিয়ে চলছিল যার ফলে তার মধ্যে শিরক, মূর্তিপূজা, জুলুম, নিপীড়ন, ফাসেকী ও চরিত্রহীনতা বেড়ে চলছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন ইসরাঈলের বাদশাহ আখিয়াব (Ahab) সাইদা (বর্তমান লেবানন)-এর রাজকন্যা ইজবেলকে বিয়ে করে তখন এ বিকৃতি ও বিপর্যয় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ মুশরিক রাজকন্যার সংস্পর্শে এসে আখিয়াব নিজেও মুশরিক হয়ে যায়। সে সামেরীয়ায় বা'আল-এর মন্দির ও যজ্ঞবেদী নির্মাণ করে। এক আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে বা'আলের পূজার প্রচলন করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালায় এবং ইসরাঈলের শহরগুলোতে প্রকাশ্যে বা'আলের নামে বলিদানের প্রচলন করে।

এহেন সময় হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম অকস্মাত জনসমক্ষে হাজির হন। তিনি জালআদ থেকে এসে আখিয়াবকে এ মর্মে নোটিস দেন যে, তোমার পাপের কারণে এখন ইসরাঈল রাজ্যে এক বিন্দুও বৃষ্টি হবে না, এমনকি কুয়াসা ও শিশিরও পড়বে না। আল্লাহর নবীর এ উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হলো এবং সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টি একদম বন্ধ থাকলো। শেষ পর্যন্ত আখিয়াবের হুঁশ হলো। সে হযরত ইলিয়াসের সন্ধান করে তাঁকে ডেকে পাঠালো। তিনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করার আগে ইসরাঈলের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ও বা'আলের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে ভালোভাবে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি হুকুম দিলেন, একটি সাধারণ সমাবেশে বা'আলের পূজারীও এসে তার উপাস্য দেবতার নামে বলিদান করবে এবং আমিও আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নামে কুরবানী করবো। দু'টি কুরবানীর মধ্য থেকে মানুষের হাতে লাগানো আগুন ছাড়াই অদৃশ্য আগুন দ্বারা যেটিই ভস্মীভূত হবে তার উপাস্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। আখিয়াব একথা মেনে নিল। ফলে কারমাল (Carmel) পর্বতে বা'আলের সাড়ে আটশো পূজারী একত্র হলো। ইসরাঈলীদের সাধারণ সমাবেশে তাদের সাথে হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালামের মোকাবিলা হলো। এ মোকাবিলায় বা'আল পূজকরা পরাজিত হলো। হযরত ইলিয়াস সবার সামনে একথা প্রমাণ

করে দিলেন যে, বা'আল একটি মিথ্যা খোদা এবং আসল খোদা হচ্ছেন সেই এক ও একক খোদা যাঁর পক্ষ থেকে তিনি নবী নিযুক্ত হয়ে এসেছেন। এরপর হযরত ইলিয়াস সেই জনসমাবেশে বা'আলের পূজারীদের হত্যা করান এবং তারপর বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন। তাঁর দোয়া সংগে সংগেই কবুল হয়ে যায় এবং সমগ্র ইসরাঈল রাজ্যে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়।

কিন্তু এসব মু'জিযা দেখেও স্ত্রৈণ আখিয়াব তার মূর্তিপূজক স্ত্রীর গোলামী থেকে বের হয়ে আসেনি। তার স্ত্রী ইজবেল হযরত ইলিয়াসের দুশমন হয়ে গেলো এবং সে কসম খেয়ে বসলো, যেভাবে বা'আলের পূজারীদের হত্যা করা হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবেই হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালামকেও হত্যা করা হবে। এ অবস্থায় হযরত ইলিয়াসকে দেশত্যাগ করতে হলো। কয়েক বছর তিনি সিনাই পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় নিলেন। এ সময় তিনি আল্লাহর কাছে যে ফরিয়াদ করেছিলেন বাইবেল তাকে এভাবে উদ্ধৃত করছে ঃ

"আমি বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভূর পক্ষে অতিশয় উদ্যোগী হইয়াছি ; কেননা ইস্রায়েল সন্তানগণ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিয়াছে, তোমার যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিয়াছে ও তোমার ভাববাদিগণকে খড়গ দ্বারা বধ করিয়াছে ; আর আমি, কেবল একা আমিই অবশিষ্ট রহিলাম, আর তাহারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে।"

[১—রাজাবলি ১৯ ঃ ১০]

এ সময়ই বায়তুল মাকদিসের ইহুদী শাসক ইয়াহুরাম (Jehoram) ইসরাঈলের বাদশাহ্ আখিয়াবের মেয়েকে বিয়ে করলো এবং ইতিপূর্বে ইসরাঈলে যেসব বিকৃতি বিস্তার লাভ করেছিল এ মুশরিক শাহজাদীর প্রভাবে ইয়াহুদিয়া রাষ্ট্রেও তা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। হযরত ইলিয়াস এখানেও নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করলেন এবং ইয়াহুরামকে একটি পত্র লিখলেন। বাইবেলে এ পত্র এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"তোমার পিতা দায়ূদের ঈশ্বর সদাপ্রভূ এইভাবে এই কথা কহেন, তুমি আপন পিতা যিহোশাফটের পথে ও যিহূদা-রাজ আসার পথে গমন কর নাই; কিন্তু ইস্রায়েলের রাজাদের পথে গমন করিয়াছ এবং আহাব-কুলের ক্রিয়ানুসারে যিহূদাকে ও যিরূশালেম নিবাসীদিগকে ব্যভিচার করাইয়াছ; আরও তোমা হইতে উত্তম যে তোমার পিতৃকুলজাত ভ্রাতৃগণ, তাহাদিগকে বধ করিয়াছ ; এই কারণ দেখ, সদাপ্রভূ তোমার প্রজাদিগকে, তোমার সন্তানদিগকে, তোমার ভার্য্যাদিগকে ও তোমার সমস্ত সম্পত্তি মহা আঘাতে আহত করিবেন। আর তুমি অন্ত্রের পীড়ায় অতিশয় পীড়িত হইবে, শেষে সেই পীড়ায় তোমার অন্ত্র দিন দিন বাহির হইয়া পড়িবে।" [২—রাজাবলি ২১ ঃ ১২—১৫]

এ পত্রে হযরত ইলিয়াস যা কিছু বলেছিলেন তা পূর্ণ হলো। প্রথমে ইয়াহুরামের রাজ্য বহিরাগত আক্রমণকারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হলো এবং তার স্ত্রীদেরকে পর্যন্ত শত্রুরা পাকড়াও করে নিয়ে গেলো। তারপর সে নিজে অন্ত্ররোগে মারা গেলো। কয়েক বছর পর হযরত ইলিয়াস আবার ইসরাঈলে পৌঁছে গেলেন। তিনি আখিয়াব ও তার পুত্র আখ্যিয়াহকে সত্য সঠিক পথে আনার জন্য লাগাতার প্রচেষ্টা চালালেন। কিন্তু সামেরীয়ার রাজ পরিবারে যে পাপ একবার জেঁকে বসেছিল তা আর কোনভাবেই বের হলো না। শেষে

হযরত ইলিয়াসের বদ্‌দোয়ায় আখিয়াবের পরিবার ধ্বংস হয়ে গেলো এবং তারপর আল্লাহ তাঁর নবীকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিলেন। এ ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য বাইবেলের নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলো দেখুন ঃ [১—রাজাবলি, অধ্যায় ১৭, ১৮, ১৯, ২১; ২—রাজাবলি অধ্যায় ১ ও ২ এবং ২—বংশাবলি, অধ্যায় ২১]

৭১. বা'আল-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রভু, সরদার ও মালিক। স্বামীর প্রতিশব্দ হিসেবেও এ শব্দটি বলা হতো এবং কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা বাকারার ২২৮, সূরা নিসার ১২৭, সূরা হূদের ৭২ এবং সূরা নূরের ৩১ আয়াতসমূহ। কিন্তু প্রাচীন যুগে সিরিয়ার বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী এ শব্দটিকে উপাস্য ও প্রভু অর্থে ব্যবহার করতো এবং তারা একটি বিশেষ দেবতাকে বা'আল নামে চিহ্নিত করে রেখেছিল। বিশেষ করে লেবাননের ফনিকি সম্প্রদায়ের (Phoenicians) সবচেয়ে বড় পুরুষ দেবতা ছিল বা'আল এবং তার স্ত্রী আশারাত (Ashtoreth) ছিল তাদের সবচেয়ে বড় দেবী। বা'আল বলতে সূর্য বা বৃহস্পতি গ্রহ বুঝায় এবং আশারাত বলতে চাঁদ বা শুক্রগ্রহ বুঝায় এ ব্যাপারে গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যাই হোক না কেন একথা ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রমাণিত যে, ব্যবিলন থেকে নিয়ে মিসর পর্যন্ত সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় বা'আল পূজা বিস্তার লাভ করেছিল। বিশেষ করে লেবানন, সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের মুশরিক জাতিগুলো আপাদমস্তক এর মধ্যে ডুবে ছিল। বনী ইসরাঈল যখন মিসর থেকে বের হবার পর ফিলিস্তীন ও পূর্ব জর্দানে এসে বসবাস শুরু করলো এবং তাওরাতের কঠোর নিষেধাজ্ঞাগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে তারা ঐ মুশরিক জাতিগুলোর সাথে বিয়ে-শাদী ও সামাজিক সম্পর্ক কায়েম করতে শুরু করলো তখন তাদের মধ্যেও এ রোগ বিস্তার লাভ করতে লাগলো। বাইবেলের বর্ণনা মতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রথম খলিফা হযরত ইউশা' বিন নূনের ইন্তেকালের পরপরই বনী ইসরাঈলের মধ্যে এ নৈতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়ের সূচনা হয়ে গিয়েছিল ঃ

"ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতে লাগিল; এবং বাল দেবগণের সেবা করিতে লাগিল।..........তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া বাল দেবের ও অষ্টারেৎ দেবীদের সেবা করিত।" [বিচারকর্তৃগণ ২ ঃ ১১—১৩]

"ফলে ইস্রায়েল-সন্তানগণ কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়গণের মধ্যে বসতি করিল ; আর তাহারা তাহাদের কন্যাগণকে বিবাহ করিত, তাহাদের পুত্রগণের সহিত আপন আপন কন্যাদের বিবাহ দিত ও তাহাদের দেবগণের সেবা করিত।" [বিচারকর্তৃগণ ৩ ঃ ৫—৬]

সে সময় ইসরাঈলীদের মধ্যে বা'আল পূজার এত বেশী প্রচলন হয়ে পড়েছিল যে, বাইবেলের বর্ণনা মতে তাদের একটি জনপদে প্রকাশ্যে বা'আলের যজ্ঞবেদী নির্মিত হয়েছিল এবং সেখানে বলিদান করা হতো। আল্লাহর অনুগত জনৈক ইসরাঈলী এটা বরদাশ্‌ত করতে পারলো না। সে রাতের বেলা চুপিচুপি যজ্ঞবেদীটি ভেঙে ফেললো। পরদিন জনতার একটি বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। তারা শিরকের এ আড্ডাখানা উচ্ছেদকারী ব্যক্তির হত্যার দাবী করতে লাগলো। (বিচারকর্তৃগণ ৬ ঃ ২৫—৩২) শেষ পর্যন্ত এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটালেন হযরত সামুয়েল, তালূত এবং হযরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমুস সালাম। তাঁরা কেবল বনী ইসরাঈলেরই সংস্কার করলেন না, নিজেদের রাজ্যেও

سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾ وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٣﴾ اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣٤﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٣٦﴾ وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالَّيْلِ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٨﴾

ইলিয়াসের প্রতি সালাম।[৭৪] সৎকর্মশীলদের আমি অনুরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি। যথার্থই সে আমার মু'মিন বান্দাদের একজন ছিল।

আর লূতও তাদের একজন ছিল যাদেরকে রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়। স্মরণ করো যখন আমি তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করি, এক বুড়ি ছাড়া যে পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তরভুক্ত ছিল।[৭৫] তারপর বাকি সবাইকে ধ্বংস করে দেই। এখন তোমরা দিনরাত তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা অতিক্রম করে যাও।[৭৬] তোমরা কি বোঝ না?

শিরক ও মূর্তিপূজা নির্মূল করলেন। কিন্তু হযরত সুলাইমানের মৃত্যুর পর এ ফিত্‌নাটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং বিশেষ করে উত্তর ফিলিস্তীনের ইসরাঈল রাষ্ট্রটি বা'আল পূজার বন্যার বিপুল স্রোতে ভেসে গেলো।

৭২. অর্থাৎ এ শাস্তির বাইরে একমাত্র তারাই থাকবে যারা হযরত ইলিয়াসের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেনি এবং যাদেরকে আল্লাহ এ জাতির মধ্য থেকে তাঁর বন্দেগীর জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন।

৭৩. বনী ইসরাঈল হযরত ইলিয়াসকে তাঁর জীবদ্দশায় যেভাবে নির্যাতিত করেছিল তার কাহিনী ওপরে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু পরে তারা তাঁর এমনই ভক্তে—অনুরক্তে পরিণত হয় যে, হযরত মূসার (আ) পরে অতি অল্প লোককেই তারা তাঁর চেয়ে মহিমান্বিত বলে মেনে নিয়ে থাকবে। তাদের সেখানে একথা ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালামকে একটি ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় (২—রাজাবলি, ২ অধ্যায়) এবং তিনি আবার দুনিয়ায় আসবেন। বাইবেলের মালাখি পুস্তকে বলা হয়েছে ঃ

"দেখ, সদাপ্রভূর সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন আসিবার পূর্বে আমি তোমাদের নিকট এলিয় ভাববাদীকে প্রেরণ করিব।" (৪ ঃ ৫)

হযরত ইয়াহইয়া ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের আগমনকালে ইহুদিরা সাধারণত তিনজন আগমনকারীর প্রতীক্ষারত ছিল। তাদের একজন হচ্ছেন হযরত ইলিয়াস (আ) ও দ্বিতীয়জন হযরত ঈসা মসীহ (আ) এবং তৃতীয়জন হচ্ছেন "এ নবী" (অর্থাৎ মুহাম্মাদ

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا
أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

৫ রুকূ'

আর অবশ্যই ইউনুস রসূলদের একজন ছিল।[৭৭] স্মরণ করো যখন সে একটি বোঝাই নৌকার দিকে পালিয়ে গেলো,[৭৮] তারপর লটারীতে অংশগ্রহণ করলো এবং তাতে হেরে গেলো। শেষ পর্যন্ত মাছ তাকে গিলে ফেললো এবং সে ছিল ধিকৃত।[৭৯] এখন যদি সে তাস্‌বীহকারীদের অন্তরভুক্ত না হতো,[৮০] তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এ মাছের পেটে থাকতো।[৮১]

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। যখন হযরত ইয়াহইয়ার (আ) নবুওয়াত শুরু হয় এবং তিনি লোকদেরকে সত্যধর্মে দীক্ষিত করতে থাকেন তখন ইহুদীদের ধর্মীয় নেতারা তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি মসীহ? তিনি জবাব দেন, না। আবার জিজ্ঞেস করে, আপনি কি ইলিয়াহ? তিনি জবাব দেন, না। তারপর জিজ্ঞেস করে, আপনি কি "সেই নবী"? তিনি জবাব দেন, আমি সেই নবীও নই। তখন তারা বলে, আপনি যদি মসীহ না হন; ইলিয়াহ না হন এবং সেই নবী না হন, তাহলে আপনি সত্যধর্মে দীক্ষা দিচ্ছেন কেন? (যোহন ১ ঃ ১৯—২৬) তারপর কিছুকাল পরে যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের তৎপরতা ব্যাপকতা লাভ করলো তখন ইহুদীরা মনে করলো, সম্ভবত ইলিয়াহ নবী এসে গেছেন। (মার্ক ৬ ঃ ১৪—১৫) হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাহাবীদের মধ্যে এ ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল যে, ইলিয়াহ নবীর আগমন ঘটবে। কিন্তু হযরত ঈসা (আ) একথা বলে তাদের ভুল ধারণা দূর করে দেন যে, "ইলিয়াহ তো এসে গেছেন, লোকেরা তাঁকে চিনেনি এবং তাঁর সাথে যা ইচ্ছা ব্যবহার করেছে।" এর ফলে হযরত ঈসার (আ) সাহাবীগণ জানতে পারেন, আগমনকারী ছিলেন হযরত ইয়াহইয়া, আটশো বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হযরত ইলিয়াস নন।" (মথি ১১ ঃ ১৪ এবং ১৭ ঃ ১০—১৩)

৭৪. মূল শব্দগুলো হচ্ছে سَلَامٌ عَلَى اِلْ يَاسِيْن এ সম্পর্কে কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, এটি হযরত ইলিয়াসের দ্বিতীয় নাম। যেমন হযরত ইব্‌রাহীমের দ্বিতীয় নাম ছিল আব্রাহাম। আর অন্য কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে আরববাসীদের মধ্যে ইব্‌রানী (হিব্রু) ভাষার শব্দাবলীর বিভিন্ন উচ্চারণের প্রচলন ছিল। যেমন মীকাল ও মীকাইল এবং মীকাইন একই ফেরেশতাকে বলা হতো। একই ঘটনা ঘটেছে হযরত ইলিয়াসের নামের ব্যাপারেও। স্বয়ং কুরআন মজীদে একই পাহাড়কে একবার "তূরে সাইনা" বলা হচ্ছে এবং অন্যত্র বলা হচ্ছে, "তূরে সীনীন।"

৭৫. এখানে হযরত লূতের (আ) স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে, যে হিজরাতের হুকুম আসার পর তার মহান স্বামীর সাথে যায়নি বরং নিজের সম্প্রদায়ের সাথে থাকে এবং আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়।

৭৬. এ বিষয়ের দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, কুরাইশ ব্যবসায়ীরা সিরিয়া ও ফিলিস্তীন যাবার পথে লূতের সম্প্রদায়ের বিধ্বস্ত জনপদ যেখানে অবস্থিত ছিল দিনরাত সে এলাকা অতিক্রম করতো।

৭৭. কুরআন মজীদে এ তৃতীয়বার হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এর আগে সূরা ইউনুস ও সূরা আম্বিয়ায় তাঁর আলোচনা এসেছে এবং আমি তার ব্যাখ্যা করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস, ৯৮—১০০ টীকা এবং সূরা আল আম্বিয়া, ৮২—৮৫ টীকা)

৭৮. মূলে ابق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি কেবলমাত্র তখনই ব্যবহার করা হয় যখন গোলাম তার প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে যায়। الاباق هرب العبد من سيده অর্থাৎ "ইবাক অর্থ হচ্ছে প্রভুর কাছ থেকে গোলামের পালিয়ে যাওয়া।" (লিসানুল আরব)

৭৯. এ বাক্যগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে ঘটনার যে চিত্রটি সামনে ভেসে ওঠে তা হচ্ছে ঃ

এক ঃ হযরত ইউনুস যে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন তা তার ধারণ ক্ষমতার চাইতে বেশী বোঝাই (Overloaded) ছিল।

দুই ঃ নৌকায় লটারী অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্ভবত এমন সময় হয় যখন সামুদ্রিক সফরের মাঝখানে মনে করা হয় যে, নৌকা তার ধারণ ক্ষমতার বেশী বোঝা বহন করার কারণে সকল যাত্রীর জীবন বিপদের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। কাজেই লটারীতে যার নাম উঠবে তাকেই পানিতে নিক্ষেপ করা হবে, এ উদ্দেশ্যে লটারী করা হয়।

তিন ঃ লটারীতে হযরত ইউনুসের নামই ওঠে। তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় এবং একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলে।

চার ঃ হযরত ইউনুসের এ পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে প্রভুর (অর্থাৎ মহান আল্লাহ) অনুমতি ছাড়াই তাঁর কর্মস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। "আবাকা" শব্দটি এ অর্থই প্রকাশ করছে, ওপরের ৭৮ টীকায় এ ব্যাখ্যাই করা হয়েছে। "মুলীম" শব্দটিও একথাই বলছে। মুলীম এমন অপরাধীকে বলা হয় যে নিজের অপরাধের কারণে নিজেই নিন্দিত হবার হকদার হয়ে গেছে, তাকে নিন্দা করা হোক বা না হোক।

(يقال قد الام الرجل اذا اتى مايلام عليه من الامر وان لم يلم - ابن جرير)

৮০. এর দু'টি অর্থ হয় এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম পূর্বেই আল্লাহ থেকে গাফিল লোকদের অন্তরভুক্ত ছিলেন না বরং তিনি তাদের অন্তরভুক্ত ছিলেন যারা ছিলেন আল্লাহর চিরন্তন প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণাকারী। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যখন তিনি মাছের পেটে পৌছুলেন তখন আল্লাহরই

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَاۤءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾ وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾

শেষ পর্যন্ত আমি তাকে বড়ই রুগ্ন অবস্থায় একটি তৃণলতাহীণ বিরান প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম[৮২] এবং তার ওপর একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করলাম।[৮৩] এরপর আমি তাকে এক লাখ বা এরচেয়ে বেশী লোকদের কাছে পাঠালাম।[৮৪] তারা ঈমান আনলো এবং আমি একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত তাদেরকে টিকিয়ে রাখলাম।[৮৫]

দিকে রুজূ' করলেন এবং তারই প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকলেন। সূরা আল আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

"তাই সে অন্ধকারের মধ্যে তিনি ডেকে উঠলেন, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, পাক–পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধী।"

৮১. এর অর্থ এ নয় যে, এ মাছটি কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকতো এবং হযরত ইউনুস (আ) কিয়ামত পর্যন্ত তার পেটে বেঁচে থাকতেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত এ মাছের পেটই তাঁর কবরে পরিণত হতো। প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরগণ এ আয়াতটির এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

৮২. অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আ) যখন তাঁর অপরাধ স্বীকার করে নিলেন এবং একজন মু'মিন ও ধৈর্যশীল বান্দার ন্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা গাইতে লাগলেন তখন আল্লাহর হুকুমে মাছ তাঁকে উপকূলে উদ্‌গীরণ করলো। উপকূল ছিল একটি বিরাণ প্রান্তর। সেখানে সবুজের কোন চিহ্ন ছিল না এবং এমন কোন জিনিসও ছিল না যা হযরত ইউনুসকে ছায়াদান করতে পারে। সেখানে খাদ্যেরও কোন সংস্থান ছিল না।

এখানে এসে অনেক বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের দাবীদারকে একথা বলতে শুনা গেছে যে, মাছের পেটে ঢুকে যাবার পর কোন মানুষের জীবিত বের হয়ে আসা অসম্ভব। কিন্তু বিগত শতকের শেষের দিকে এ তথাকথিত বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদীতার কেন্দ্র ভূমির (ইংল্যাণ্ড) উপকূলের সন্নিকটে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাটি তাদের দাবী খণ্ডন করে। "১৮৯১ সালের আগষ্ট মাসে Star of the East নামক জাহাজে চড়ে কয়েকজন মৎস্য শিকারী তিমি শিকারের উদ্দেশ্যে গভীর সমুদ্রে যায়। সেখানে তারা ২০ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া ও ১০০ টন ওজনের একটি বিশাল মাছকে আহত করে। কিন্তু তার সাথে লড়াই করার সময় জেম্‌স বার্টলে নামক একজন মৎস শিকারীকে তার সাথীদের চোখের সামনেই মাছটি গিলে ফেলে। একদিন পরে জাহাজের লোকেরা মাছটিকে মৃত অবস্থায় পায়। বহুকষ্টে সেটিকে তারা জাহাজে ওঠায় এবং তারপর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তার পেট কাটলে জেম্‌স তার মধ্য থেকে জীবিত বের হয়ে আসে। এ ব্যক্তি মাছের পেটে পুরা ৬০ ঘন্টা থাকে।" (উর্দূ ডাইজেষ্ট, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪) চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে, সাধারণ অবস্থায়

প্রাকৃতিকভাবে যদি এমনটি হওয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে অস্বাভাবিক অবস্থায় আল্লাহর মু'জিযা হিসেবে এমনটি হওয়া কেমন করে অসম্ভব হতে পারে?

৮৩. মূলে বলা হয়েছে شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ইয়াকতীন আরবী ভাষায় এমন ধরনের গাছকে বলা হয় যা কোন গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না বরং লতার মতো ছড়িয়ে যেতে থাকে। যেমন লাউ, তরমুজ, শশা ইত্যাদি। মোটকথা সেখানে অলৌকিকভাবে এমন একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করা হয়েছিল যার পাতাগুলো হযরত ইউনুসকে ছায়া দিচ্ছিল এবং ফলগুলো একই সংগে তাঁর জন্য খাদ্য সরবরাহ করছিল এবং পানিরও যোগান দিচ্ছিল।

৮৪. "এক লাখ বা এর বেশী" বলার মানে এ নয় যে, এর সঠিক সংখ্যার ব্যাপারে আল্লাহর সন্দেহ ছিল। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ তাদের জনবসতি দেখতো তাহলে সে এ ধারণাই করতো যে, এ শহরের জনসংখ্যা এক লাখের বেশীই হবে, কম হবে না। সম্ভবত হযরত ইউনুস যে শহরটি ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন এটি সেই শহরই হবে। তাঁর চলে যাবার পর সে শহরের লোকেরা আযাব আসতে দেখে যে ঈমান এনেছিল তার অবস্থা ছিল এমন তাওবার মতো যা কবুল করে নিয়ে তাদের ওপর থেকে আযাব হটিয়ে দেয়া হয়েছিল। এখন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে পুনরবার তাদের কাছে পাঠানো হলো, যাতে তারা নবীর প্রতি ঈমান এনে যথারীতি মুসলমান হয়ে যায়। এ বিষয়টি বুঝার জন্য সূরা ইউনুসের ৯৮ আয়াতটি সামনে থাকা দরকার।

৮৫. হযরত ইউনুসের (আ) এ ঘটনা সম্পর্কে আমি সূরা ইউনুস ও সূরা আম্বিয়ার ব্যাখ্যায় যা কিছু লিখেছি সে সম্পর্কে কেউ কেউ আপত্তি উঠিয়েছেন। তাই সংগতভাবেই এখানে অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণের উক্তিও উদ্ধৃত করছি ঃ

বিখ্যাত মুফাস্‌সির কাতাদা সূরা ইউনুসের ৯৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ "এমন কোন জনপদ দেখা যায়নি যার অধিবাসীরা কুফরী করেছে এবং আযাব এসে যাবার পরে ঈমান এনেছে আর তারপর তাদেরকে রেহাই দেয়া হয়েছে। একমাত্র ইউনুসের সম্প্রদায় এর ব্যতিক্রম। তারা যখন তাদের নবীর সন্ধান করে তাঁকে না পেয়ে অনুভব করলো আযাব নিকটে এসে গেছে তখন আল্লাহ তাদের মনে তাওবার প্রেরণা সৃষ্টি করলেন।" (ইবনে কাসীর, ২ খণ্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

একই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলূসী লিখছেন, এ জাতির কাহিনী হচ্ছে ঃ "হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মসুল এলাকায় নিনেভাবাসীদের কাছে আগমন করেছিলেন। তারা ছিল কাফের ও মুশরিক। হযরত ইউনুস তাদেরকে এক ও লা-শরীক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ও মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার আহবান জানান। তারা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। হযরত ইউনুস তাদেরকে জানিয়ে দেন, তৃতীয় দিন আযাব আসবে এবং তৃতীয় দিন আসার আগেই অর্ধ রাতে তিনি জনপদ থেকে বের হয়ে পড়েন। তারপর দিনের বেলা যখন এ জাতির মাথার ওপর আযাব পৌঁছে যায়.........এবং তাদের বিশ্বাস জন্মে যে, তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তারা নিজেদের নবীকে খুঁজতে থাকে কিন্তু তাঁকে খুঁজে পায় না। শেষ পর্যন্ত তারা সবাই নিজেদের ছেলেমেয়ে, পরিবার-পরিজন ও গবাদি পশু নিয়ে খোলা প্রান্তরে বের হয়ে আসে

এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও তাওবা করে। ....আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা করেন এবং তাদের দোয়া কবুল করেন।" (রূহুল মা'আনী, ১১ খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা)

সূরা আম্বিয়ার ৮৭ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলূসী লিখেছেন ঃ "হযরত ইউনুসের নিজের জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বের হয়ে যাওয়া ছিল হিজরাতের কাজ। কিন্তু তাঁকে এর হুকুম দেয়া হয়নি।" (রূহুল মা'আনী, ১৭ খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) তারপর তিনি হযরত ইউনুসের দোয়ার বাক্যাংশ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ "অর্থাৎ আমি অপরাধী ছিলাম। নবীদের নিয়মের বাইরে গিয়ে হুকুম আসার আগেই হিজরাত করার ব্যাপারে আমি তাড়াহুড়া করেছিলাম। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে এটি ছিল তাঁর নিজের গোনাহের স্বীকৃতি এবং তাওবার প্রকাশ, যাতে আল্লাহ তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।" (রূহুল মা'আনী, ১৭ খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)

এ আয়াতটির টীকায় মওলানা আশরাফ আলী থানবী লিখেছেন ঃ "তাঁর নিজের জাতি তাঁর প্রতি ঈমান না আনায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যান এবং জাতির ওপর থেকে আযাব হটে যাবার পরও নিজে তাদের কাছে ফিরে আসেননি। আর এ সফরের জন্য আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষাও করেননি।" (বায়ানুল কুরআন)

এ আয়াতের টীকায় মওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী লিখেছেন ঃ "জাতির কার্যকলাপে ক্ষিপ্ত হয়ে ক্রুদ্ধচিত্তে শহর থেকে বের হয়ে যান। আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করেননি এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে, তিন দিনের মধ্যে তোমাদের ওপর আযাব নেমে আসবে।.......... اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ বলে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন এ মর্মে যে, অবশ্যই আমি তাড়াহুড়া করেছি, তোমার হুকুমের অপেক্ষা না করেই জনপদের অধিবাসীদের ত্যাগ করে বের হয়ে পড়ি।"

সূরা সা–ফ্ফা–তের ওপরে উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী লিখেছেন ঃ হযরত ইউনুসের অপরাধ ছিল, তাঁর যে জাতি তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল আল্লাহ তাকে ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, এ আযাব নির্ঘাত এসে যাবে। তাই তিনি সবর করেননি। জাতিকে দাওয়াত দেবার কাজ বাদ দিয়ে বাইরে বের হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ দাওয়াতের কাজ সবসময় জারী রাখাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। কারণ আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস না করার সম্ভাবনা তখনো ছিল।" (তাফসীরে কবীর, ৭ খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আলূসী اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ সম্পর্কে লিখেছেনঃ "আবাকা–এর আসল মানে হচ্ছে, প্রভুর কাছ থেকে দাসের পালিয়ে যাওয়া। যেহেতু হযরত ইউনুস তাঁর রবের অনুমতি ছাড়াই নিজের জাতির কাছ থেকে পলায়ন করেছিলেন তাই তাঁর জন্য এ শব্দটির ব্যবহার সঠিক হয়েছে। "তারপর সামনের দিকে তিনি আরো লিখেছেন ঃ "তৃতীয় দিনে হযরত ইউনুস আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে গেলেন। এখন তাঁর জাতি তাঁকে না পেয়ে তাদের বড়দের, ছোটদের ও গবাদি পশুগুলো নিয়ে বের হয়ে পড়লো। আযাব অবতীর্ণ হবার বিষয়টি তাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল। তারা আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করলো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলো। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিলেন।" (রূহুল মা'আনী, ২৩ খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা)

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾ اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾ اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٦﴾ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾

তারপর তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করো,[৮৬] (তোমাদের মন কি একথায় সায় দেয় যে,) তোমাদের রবের জন্য তো হচ্ছে কন্যারা এবং তাদের জন্য পুত্ররা?[৮৭] সত্যই কি আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে মেয়ে হিসেবে সৃষ্টি করেছি এবং তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে একথা বলছে? ভালো করেই শুনে রাখো, আসলে তারা তো মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহর সন্তান আছে এবং যথার্থই তারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ কি নিজের জন্য পুত্রের পরিবর্তে কন্যা পছন্দ করেছেন? তোমাদের কি হয়ে গেছে, কিভাবে ফায়সালা করছো? তোমরা কি সচেতন হবে না? অথবা তোমাদের কাছে তোমাদের এসব কথার সপক্ষে কোন পরিষ্কার প্রমাণপত্র আছে? তাহলে আনো তোমাদের সে কিতাব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৮৮]

মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী وَهُوَ مُلِيْمٌ -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন : "অভিযোগ এটিই ছিল যে, ইজতিহাদী ভুলের দরুন আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করে জনপদ থেকে বের হয়ে পড়েন এবং আযাবের দিন নির্ধারণ করে দেন।"

আবার সূরা আল কলম–এর

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ

আয়াতের টীকায় মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী লিখেছেন : "অর্থাৎ মাছের পেটে প্রবেশকারী পয়গম্বরের (হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম) মতো মিথ্যা আরোপকারীদের ব্যাপারে সংকীর্ণমনতা ও ভীতি–আশংকার প্রকাশ ঘটাবে না।" তারপর একই আয়াতের وَهُوَ مَكْظُوْمٌ বাক্যাংশের টীকায় তিনি লিখেছেন : "অর্থাৎ জাতির বিরুদ্ধে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। বিরক্ত হয়ে দ্রুত আযাবের জন্য দোয়া এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন।"

মুফাস্‌সিরগণের এসব বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনটি ভুলের কারণে হযরত ইউনুসের (আ) ওপর অসন্তোষ ও ক্রোধ নেমে আসে। এক, তিনি নিজেই আযাবের

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾

তারা আল্লাহ ও ফেরেশ্‌তাদের[৮৯] মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করে রেখেছে। অথচ ফেরেশ্‌তারা ভালো করেই জানে তাদেরকে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত করা হবে (এবং তারা বলে,) "আল্লাহ সেসব দোষ থেকে মুক্ত যেগুলো তাঁর একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া অন্যেরা তাঁর ওপর আরোপ করে। কাজেই তোমরা ও তোমাদের এ উপাস্যরা কাউকে আল্লাহ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না, সে ব্যক্তিকে ছাড়া যে জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশকারী হবে।[৯০] আর আমাদের অবস্থা তো হচ্ছে এই যে, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের একটি স্থান নির্ধারিত রয়েছে[৯১] এবং আমরা সারিবদ্ধ খাদেম ও তাসবীহ পাঠকারী।"

তারা তো আগে বলে বেড়াতো, হায়! পূর্ববর্তী জাতিরা যে "যিকির" লাভ করেছিল তা যদি আমাদের কাছে থাকতো তাহলে আমরা হতাম আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা।[৯২]

দিন নির্দিষ্ট করে দেন। অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন ঘোষণা হয়নি। দুই, সেদিন আসার আগেই হিজরাত করে দেশ থেকে বের হয়ে যান। অথচ আল্লাহর হুকুম না আসা পর্যন্ত নবীর নিজ স্থান ত্যাগ করা উচিত নয়। তিন, সে জাতির ওপর থেকে আযাব হটে যাওয়ার পর তিনি নিজে তাদের মধ্যে ফিরে যাননি।

৮৬. এখান থেকে আর একটি বিষয় শুরু হচ্ছে। প্রথম বিষয়টি ১১ আয়াত থেকে শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের সামনে এ প্রশ্ন রাখা হয়েছিল ঃ "তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাদেরকে সৃষ্টি করা বেশী কঠিন কাজ, না আমি যেগুলো সৃষ্টি করে রেখেছি সেগুলো?" এখন তাদেরই সামনে এ দ্বিতীয় প্রশ্ন আনা হচ্ছে। প্রথম প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল কাফেরদেরকে তাদের এ ভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া যে, তারা মৃত্যু পরের জীবন ও শাস্তি–পুরস্কারকে অসম্ভব মনে করতো এবং এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বিদ্রূপ করতো। এখন এ দ্বিতীয় প্রশ্নটি তাদের এ মূর্খতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার জন্য পেশ করা হচ্ছে যে, তারা বলতো আল্লাহর সন্তান আছে এবং অনুমানের ঘোড়া দাবড়িয়ে যাকে ইচ্ছা তাকেই আল্লাহর সন্তান বলে আখ্যায়িত করতো।

৮৭. হাদীস থেকে জানা যায়, আরবের কুরাইশ, জুহাইনিয়া, বনী সালেমাহ, খুযা'আহ, বনী মূলাহ এবং অন্যান্য গোত্র বিশ্বাস করতো, ফেরেশ্তারা আল্লাহর কন্যা। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের এ জাহেলী আকীদার কথা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন সূরা আন নিসা, ১১৭; আন নাহ্ল, ৫৭—৫৮; বনী ইসরাঈল, ৪০; আয্ যুখ্রুফ, ১৬—১৯ এবং আন নাজ্ম, ২১—২৭ আয়াতসমূহ।

৮৮. অর্থাৎ ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করার জন্য দু'টি বুনিয়াদই হতে পারে। এ ধরনের কথা তারা বলতে পারে প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতে অথবা এ ধরনের দাবী যারা করে তাদের কাছে আল্লাহর এমন কোন কিতাব থাকতে হবে যাতে আল্লাহ নিজেই ফেরেশ্তাদেরকে নিজের কন্যা বলে উল্লেখ করে থাকবেন। এখন এ বিশ্বাসের প্রবক্তারা যদি কোন প্রত্যক্ষ দর্শনের দাবী করতে না পারে এবং এমন কোন কিতাবও তাদের কাছে না থাকে, যাতে একথা বলা হয়েছে, তাহলে নিছক উড়ো কথার ভিত্তিতে একটি দীনী বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করে নেয়া এবং বিশ্ব–জাহানের মালিকের সাথে সুস্পষ্ট হাস্যকর কথা সম্পৃক্ত করে দেয়ার চাইতে বড় মূর্খতা ও বোকামি আর কী হতে পারে।

৮৯. মূলে 'মালাইকা'র (ফেরেশ্তাবৃন্দ) পরিবর্তে 'আল জিন্নাহ' (الْجِنَّة) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন শ্রেষ্ঠ তাফসীরকারের মতে এখানে 'জিন' শব্দটি তার আভিধানিক অর্থের (অর্থাৎ গুপ্ত সৃষ্টি) প্রেক্ষিতে 'মালাইকা' তথা ফেরেশ্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ ফেরেশ্তাও আসলে একটি গোপন জীবই। পরবর্তী বিষয়বস্তু এখানে জিন শব্দটি ফেরেশ্তা অর্থে ব্যবহার করারই দাবী জানায়।

৯০. এ আয়াতের দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "কাজেই তোমরা ও তোমাদের এ ইবাদাত, এর ভিত্তিতে তোমরা কাউকে ফিত্নার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারো না কিন্তু একমাত্র তাকে যে............।" এ দ্বিতীয় অনুবাদের প্রেক্ষিতে এর অর্থ হবে, হে পথভ্রষ্টের দল! এই যে, তোমরা আমাদের পূজা করছো এবং আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তান গণ্য করছো, এর মাধ্যমে তোমরা আমাদেরকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারো না। এর মাধ্যমে তো কেবলমাত্র এমন নির্বোধই ফিত্নার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে পারে, যে সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। অন্য কথায় বলা যায়, ফেরেশ্তারা তাদেরকে বলছে ঃ "পাতো এ ফাঁদ অন্য পাখির জন্য।"

৯১. অর্থাৎ আল্লাহর সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, আমাদের অবস্থা তো হচ্ছে এই যে, আমাদের মধ্যে যার জন্য যে মর্যাদা ও স্থান নির্ধারিত হয়েছে তা থেকে সামান্যতমও এদিক ওদিক করার ক্ষমতা কারো নেই।

৯২. একই বিষয়বস্তু সূরা ফাতিরের ৪২ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

কিন্তু (যখন সে এসে গেছে) তখন তারা তাকে অস্বীকার করেছে। এখন শিগ্‌গির তারা (তাদের এ নীতির ফল) জানতে পারবে। আমার প্রেরিত বান্দাদেরকে আমি আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করা হবে এবং আমার সেনাদলই বিজয়ী হবে।[৯৩] কাজেই হে নবী! কিছু সময় পর্যন্ত তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও এবং দেখতে থাকো, শীঘ্রই তারা নিজেরাও দেখে নেবে।[৯৪] তারা কি আমার আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করছে? যখন তা নেমে আসবে তাদের আঙিনায়, সেদিনটি হবে যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্য বড়ই অশুভ। ব্যস, তাদেরকে কিছুকালের জন্য ছেড়ে দাও এবং দেখতে থাকো, শিগ্‌গির তারা নিজেরাও দেখে নেবে।

তারা যেসব কথা তৈরি করছে তা থেকে পাক-পবিত্র তোমার রব, তিনি মর্যাদার অধিকারী। আর সালাম প্রেরিতদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনেরই জন্য।

৯৩. আল্লাহর সেনাদল বলতে এমন ঈমানদারদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর রসূলের আনুগত্য করে এবং তাঁর সহযোগী হয়। তাছাড়া এমন অদৃশ্য শক্তিও এর অন্তরভুক্ত হয় যাদের সাহায্যে মহান আল্লাহ সত্যপন্থীদেরকে সাহায্য-সহায়তা দান করে থাকেন।

এ সাহায্য ও বিজয়ের অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, প্রত্যেক যুগে আল্লাহর প্রত্যেক নবী এবং তাঁর প্রত্যেক অনুসারী দল রাজনৈতিক বিজয়ই লাভ করবেন। বরং এ বিজয় বহু ধরনের হবে। রাজনৈতিক বিজয়ও এর মধ্যে একটি। যেখানে আল্লাহর নবীগণ এ ধরনের প্রাধান্য লাভ করেননি সেখানেও তাঁদের নৈতিক প্রাধান্য প্রমাণিত হয়েই থাকবে। যেসব

জাতি তাদের কথা মানেনি এবং তাদের দেয়া হিদায়াতের বিরোধী পথ অবলম্বন করেছে তারা শেষ পর্যন্ত বরবাদই হয়ে গেছে। মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার যে দর্শনই মানুষ তৈরি করেছে এবং যে বিকৃত জীবনাচরণই জোরপূর্বক প্রচলন করা হয়েছে তা সবই কিছুদিন পর্যন্ত টিকে থাকার পর শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু হাজার হাজার বছর থেকে আল্লাহর নবীগণ যে সত্যগুলোকে প্রকৃত সত্য হিসেবে পেশ করে এসেছেন তা আগেও ছিল অপরিবর্তনীয় এবং আজো অপরিবর্তিত রয়েছে। কেউ তাকে স্বস্থান থেকে নড়াতে পারেনি।

৯৪. অর্থাৎ বেশীদিন যেতে না যেতেই তারা নিজেদের পরাজয় ও তোমার বিজয় স্বচক্ষে দেখে নেবে। একথা যেভাবে বলা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এ আয়াতগুলো নাযিল হবার পর বড়জোড় ১৪/১৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে থাকবে মক্কার কাফেররা নিজেদের চোখেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর নিজের শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ দেখে নিয়েছে এবং তারপর এর কিছুকাল পরেই তারা দেখে নিয়েছে, ইসলাম কেবলমাত্র আরবের ওপরেই নয় বরং বিশাল পারশ্য ও রোমান সাম্রাজ্যের ওপরও বিজয়ী হয়েছে।

৩৮

নামকরণ

সূরা শুরুর হরফ 'সা–দ'কে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়-কাল

যেমন সামনের দিকে বলা হবে, কোন কোন হাদীস অনুযায়ী দেখা যায়, এ সূরাটি এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুআয্‌যমায় প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়া শুরু করেছিলেন এবং এ কারণে কুরাইশ সরদারদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ হিসেবে প্রায় নবুওয়াতের চতুর্থ বছরটি এর নাযিল হবার সময় হিসেবে গণ্য হয়। অন্যান্য হাদীসে একে হযরত উমরের (রা) ঈমান আনার পরের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। আর হযরত উমর হাব্‌শায় হিজরাত অনুষ্ঠিত হবার পর ঈমান আনেন, একথা সবার জানা। আর এক ধরনের হাদীস থেকে জানা যায়, আবু তালেবের শেষ রোগগ্রস্ততার সময় যে ঘটনা ঘটে তারই ভিত্তিতে এ সূরা নাযিল হয়। একে যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর নাযিলের সময় হিসেবে ধরতে হয় নবুওয়াতের দশম বা দ্বাদশ বছরকে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ইমাম আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবাহ, ইবনে আবী হাতেম ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ যেসব হাদীস উদ্ধৃত করেছেন সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ যখন আবু তালেব রোগাক্রান্ত হলেন এবং কুরাইশ সরদাররা অনুভব করলো, এবার তাঁর শেষ সময় এসে গেছে, তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলো, বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলা উচিত। তিনি আমাদের ও তাঁর ভাতিজার ঝগড়া মিটিয়ে দিয়ে গেলে ভালো! নয়তো এমনও হতে পারে, তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যাবে এবং আমরা তাঁর পরে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে কোন কঠোর ব্যবহার করবো আর আরবের লোকেরা এ বলে আমাদের খোঁটা দেবে যে, যতদিন বৃদ্ধ লোকটি জীবিত ছিলেন ততদিন এরা তাঁর মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে, এখন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাতিজার গায়ে হাত দিয়েছে। একথায় সবাই একমত হয়। ফলে প্রায় ২৫ জন কুরাইশ সরদার আবু তালেবের কাছে হাজির হয়। এদের অন্যতম ছিল আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, উমাইয়াহ ইবনে খাল্‌ফ, আস ইবনে ওয়ায়েল, আস্‌ওয়াদ ইবনুল

মুত্তালিব, উকবাহ ইবনে আবী মু'আইত, উতবাহ ও শাইবাহ। তারা যথারীতি প্রথমে আবু তালেবের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিযোগ পেশ করে তারপর বলে, আমরা আপনার কাছে একটি ইনসাফপূর্ণ আপোষের কথা পেশ করতে এসেছি। আপনার ভাতিজা আমাদেরকে আমাদের ধর্মের ওপর ছেড়ে দিক আমরাও তাকে তার ধর্মের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। সে যে মাবুদের ইবাদাত করতে চায় করুক, তার বিরুদ্ধে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সে আমাদের মাবুদদের নিন্দা করবে না এবং আমরা যাতে আমাদের মাবুদদেরকে ত্যাগ করি সে প্রচেষ্টা চালাবে না। এ শর্তের ভিত্তিতে আপনি তার সাথে আমাদের সন্ধি করিয়ে দিন। আবু তালেব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকলেন। তাঁকে বললেন, ভাতিজা! এই যে তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার কাছে এসেছে। তাদের আকাংখা, তুমি একটি ইনসাফপূর্ণ আপোষের ভিত্তিতে তাদের সাথে একমত হয়ে যাবে। এভাবে তোমার সাথে তাদের বিবাদ খতম হয়ে যাবে। তারপর কুরাইশ সরদাররা তাঁকে যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলো তিনি তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ "চাচাজান! আমি তো তাদের সামনে এমন একটি কালেমা পেশ করছি তাকে যদি তারা মেনে নেয় তাহলে সমগ্র আরব জাতি তাদের হুকুমের অনুগত হয়ে যাবে এবং অনারবরা তাদেরকে কর দিতে থাকবে।"[১] একথা শুনে প্রথমে তো তারা হতভম্ব হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারছিল না এমন লাভজনক কথার প্রতিবাদ করবে কি বলে। কাজেই নিজেদের বক্তব্য কিছুটা গুছিয়ে

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি বিভিন্ন বর্ণনাকারী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। একটি হাদীসে বলা হয়েছে তিনি বলেছেন ঃ

اريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدى اليهم بها العجم الجزية

(অর্থাৎ আমি তাদের সামনে এমন একটি কালেমা পেশ করছি তা পাঠ করলে তারা সমগ্র আরব জয় করে ফেলবে এবং অনারবরা তাদেরকে জিযিয়া দেবে।) অন্য একটি হাদীসের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

ادعوهم الى ان يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها ارعجم

(অর্থাৎ আমি তাদেরকে এমন একটি কালেমা পড়ার ডাক দিচ্ছি যা পাঠ করলে তারা সমগ্র আরব জয় করবে এবং অনারবরা তাদের শাসনাধীন হবে।) অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি আবু তালেবের পরিবর্তে কুরাইশ সরদারদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم

অন্য একটি হাদীসের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

ارأيتم ان اعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم

বর্ণনাগুলোর এ শাব্দিক পার্থক্য সত্ত্বেও বক্তব্য সবগুলোর একই। অর্থাৎ নবী করীম (সা) তাদেরকে বলেন, যদি আমি এমন একটি কালেমা তোমাদের সামনে পেশ করি যা গ্রহণ করে তোমরা আরব ও আজমের মালিক হয়ে যাবে তাহলে বলো, এটি বেশী ভালো, না তোমরা ইনসাফের নামে যে কথাটি আমার সামনে পেশ করছো সেটি বেশী ভালো? তোমরা এ কালেমাটি মেনে নেবে অথবা যে অবস্থার মধ্যে তোমরা এখন পড়ে রয়েছো তার মধ্যেই তোমাদের পড়ে থাকতে দেবো এবং নিজের জায়গায় বসে আমি নিজের আল্লাহর ইবাদাত করতে থাকবো—কোন্‌টির মধ্যে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে?

নিয়ে তারা বলতে শুরু করলো, তুমি একটি কালেমা বলছো কেন আমরা তো এমন দশটি কালেমা বলতে রাজি কিন্তু সেই কালেমাটি কি তাতো একবার বলো। তিনি বললেন ঃ লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ। একথা শুনেই তারা সবাই একসাথে উঠে দাঁড়ালো এবং সে কথাগুলো বলতে বলতে চলে গেলো যা আল্লাহ এ সূরার শুরুতে উদ্ধৃত করেছেন।

ওপরে যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে ইবনে সা'দ তাবকাতে ঠিক তেমনিভাবেই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী এটা আবু তালেবের মৃত্যুকালীন রোগগ্রস্ততার সময়কার ঘটনা নয় বরং এটা এমন এক সময়ের ঘটনা যখন নবী করীম (সা) তাঁর সাধারণ দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন এবং মক্কায় অনবরত খবর ছড়িয়ে পড়ছিল যে, আজ অমুক ব্যক্তি মুসলমান হয়ে গেছে এবং কাল অমুক ব্যক্তি। সে সময় কুরাইশ সরদাররা একের পর এক কয়েকটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আবু তালেবের কাছে পৌঁছেছিল। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ প্রচার কাজ থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছিল। এ প্রতিনিধি দলগুলোরই একটির সাথে উল্লিখিত আলাপ আলোচনা হয়।

যামাখ্‌শারী, রাযী, নিশাপুরী ও অন্যান্য কতিপয় মুফাস্‌সির বলেন, এ প্রতিনিধি দল আবু তালেবের কাছে গিয়েছিল এমন এক সময় যখন হযরত উমরের (রা) ঈমান আনার ফলে কুরাইশ সরদাররা হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাদীসের কোন কিতাবে এর সমর্থন পাওয়া যায়নি এবং মুফাস্‌সিরগণও তাঁদের উৎসসমূহের বরাত দেননি। তবুও যদি এটা সঠিক হয়ে থাকে তাহলে একথা বোধগম্য। কারণ কাফের কুরাইশরা প্রথমেই এ দৃশ্য দেখে ভীত হয়ে পড়েছিল যে, ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তাদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি উঠেছেন যিনি নিজের পারিবারিক আভিজাত্য, নিষ্কলংক চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও বিচার–বিবেচনার দিক দিয়ে সমস্ত জাতির মধ্যে অদ্বিতীয়। তারপর আবু বকরের মতো লোক তাঁর ডানহাত, যাকে মক্কা ও তার আশপাশের এলাকার প্রত্যেকটি শিশুও একজন অত্যন্ত ভদ্র, বিবেচক, সত্যবাদী ও পবিত্র–পরিচ্ছন্ন মানুষ হিসেবে জানে। এখন যখন তারা দেখলো, উমর ইবনে খাত্তাবের মতো অসম সাহসী ও দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তিও এ দু'জনের সাথে মিলিত হয়েছেন তখন নিশ্চিতভাবেই তারা অনুভব করে থাকবে যে, বিপদ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে যে মজলিসের উল্লেখ করা হয়েছে তার ওপর মন্তব্য দিয়েই সূরার সূচনা করা হয়েছে। কাফের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার আলাপ–আলোচনার ভিত্তিতে আল্লাহ বলেছেন, তাদের অস্বীকারের আসল কারণ ইসলামী দাওয়াতের কোন ত্রুটি নয় বরং এর আসল কারণ হচ্ছে, তাদের আত্মম্ভরিতা, হিংসা ও একগুঁয়েমীর ওপর অবিচল থাকা। নিজেদের জ্ঞাতি–বেরাদরির এক ব্যক্তিকে আল্লাহর নবী বলে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করতে তারা প্রস্তুত নয়। তাদের পূর্বপুরুষদেরকে তারা যেমন জাহেলী ধ্যান–ধারণায় বিশ্বাসী পেয়েছে ঠিক তেমনি ধারণা–কল্পনার ওপর তারা নিজেরাও অবিচল থাকতে চায় আর যখন এ জাহেলিয়াতের আবরণ ছিন্ন করে এক ব্যক্তি তাদের সামনে আসল সত্য উপস্থাপন করেন তখন তারা উৎকর্ণ হয় এবং তাঁর কথাকে অদ্ভুত,

অভিনব ও অসম্ভব গণ্য করে। তাদের মতে, তাওহীদ ও আখেরাতের ধারণা কেবল যে, অগ্রহণযোগ্য তাই নয় বরং এটা এমন একটা ধারণা যা নিয়ে কেবল ঠাট্টা তামাশাই করা যেতে পারে।

এরপর আল্লাহ সূরার শুরুর দিকে এবং শেষ বাক্যগুলোতেও কাফেরদেরকে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, আজ তোমরা যে ব্যক্তিকে বিদ্রূপ করছো এবং যার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে জোরালো অস্বীকৃতি জানাচ্ছো, খুব শিগগির সে-ই বিজয়ী হবে এবং সে সময়ও দূরে নয় যখন যে মক্কা শহরে তোমরা তাঁকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছো, এ শহরেই তোমরা তাঁর সামনে অবনত মস্তক হবে।

এরপর একের পর এক ৯ জন পয়গম্বরের কথা বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলাইমানের (আ) কাহিনী বেশী বিস্তারিত। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ শ্রোতাদেরকে একথা হৃদয়ংগম করিয়েছেন যে, ইনসাফের আইন পুরোপুরি ব্যক্তি নিরপেক্ষ। মানুষের সঠিক মনোভাব ও কর্মনীতিই তার কাছে গ্রহণীয়। অন্যায় কথা, যে-ই বলুক না কেন, তিনি তাকে পাকড়াও করেন। ভুলের ওপর যারা অবিচল থাকার চেষ্টা করে না বরং জানার সাথে সাথেই তাওবা করে এবং দুনিয়ায় আখেরাতের জবাবদিহির কথা মনে রেখে জীবন যাপন করে তারাই তার কাছে পছন্দনীয়।

এরপর অনুগত ও বিদ্রোহী বান্দারা আখেরাতের জীবনে যে পরিণামের সম্মুখীন হবে তার চিত্র অংকন করা হয়েছে এবং এ প্রসংগে কাফেরদেরকে বিশেষ করে দু'টি কথা বলা হয়েছে। এক, আজ যেসব সরদার ও ধর্মীয় নেতাদের পেছনে মূর্খ লোকেরা অন্ধের মতো ভ্রষ্টতার দিকে ছুটে চলছে আগামীতে তারাই জাহান্নামে পৌঁছে যাবে তাদের অনুসারীদের আগে এবং তারা উভয়দল পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকবে। দুই, আজ যেসব মু'মিনকে এরা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত মনে করছে আগামীতে এরা অবাক চোখে তাকিয়ে দেখবে জাহান্নামে কোথাও তাদের নাম নিশানাও নেই এবং এরা নিজেরাই তার আযাবে পাকড়াও হয়েছে।

সবশেষে আদম (আ) ও ইবলিসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফের কুরাইশদেরকে একথা বলা যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নত হবার পথে যে অহংকার তোমাদের বাধা দিচ্ছে সে একই অহংকার আদমের সামনে নত হতে ইবলিসকে বাধা দিয়েছিল। আল্লাহ আদমকে যে মর্যাদা দিয়েছিলেন ইবলিস তাতে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল এবং আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে লানতের ভাগী হয়েছিল। অনুরূপভাবে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তাতে তোমাদের হিংসা হচ্ছে এবং আল্লাহ যাঁকে রসূল নিযুক্ত করেছেন তাঁর আনুগত্য করতে প্রস্তুত হচ্ছো না। তাই ইবলিসের যে পরিণতি হবে সে একই পরিণতি হবে তোমাদেরও।

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِی الذِّکْرِ ۝١ بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ عِزَّۃٍ وَّشِقَاقٍ ۝٢
کَمْ اَهْلَکْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِیْنَ مَنَاصٍ ۝٣

সা–দ।[১] উপদেশপূর্ণ[২] কুরআনের শপথ। বরং এরাই, যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, প্রচণ্ড অহংকার ও জিদে লিপ্ত হয়েছে।[৩] এদের পূর্বে আমি এমনি আরো কত জাতিকে ধ্বংস করেছি (এবং যখন তাদের সর্বনাশ এসে গেছে) তারা চিৎকার করে উঠেছে, কিন্তু সেটি রক্ষা পাওয়ার সময় নয়।

১. সমস্ত "মুকাত্তা'আত" হরফের মতো 'সা–দ'–এর অর্থ চিহ্নিত করা যদিও কঠিন তবুও ইবনে আব্বাস (রা) ও যাহ্‌হাকের এ উক্তিও কিছুটা মনে দাগ কাটে যে, এর অর্থ হচ্ছে, صادق فی قوله অথবা صدق محمد অর্থাৎ "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যবাদী। তিনি যা বলছেন সবই সত্য।"

২. মূল শব্দ হচ্ছে ذی الذكر এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, ذی شرف অর্থাৎ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ। দুই, ذی التذكير অর্থাৎ উপদেশে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ ভুলে যাওয়া শিক্ষা আবার স্মরণ করিয়ে দেয় এবং গাফলতি থেকে সজাগ করে দেয়।

৩. যদি ইবনে আব্বাস ও দাহ্‌হাক বর্ণিত সা–দ–এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়, তাহলে এ বাক্যের অর্থ হবে, "জ্ঞানপূর্ণ বা উপদেশমালায় পরিপূর্ণ কুরআনের কসম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য কথা উপস্থাপন করছেন। কিন্তু যারা অস্বীকার করার ওপর অবিচল রয়েছে তারা আসলে জিদ ও অহংকারে লিপ্ত হয়েছে।" আর যদি সা–দকে এমন সব হরফে মুকাত্তা'আতের অন্তরভুক্ত করা হয় যাদের অর্থ নির্ধারণ করা যেতে পারে না তাহলে এখানে বলতে হবে কসমের জবাব উহ্য রয়েছে যা "বরং" তার পরবর্তী বাক্যাংশ নিজেই একথা প্রকাশ করছে। অর্থাৎ এ অবস্থায় সম্পূর্ণ বাক্যটি এভাবে হবে, "এ অস্বীকারকারীদের অস্বীকার করার কারণ এ নয় যে, তাদের সামনে যে দীন পেশ করা হচ্ছে তার মধ্যে কোন ত্রুটি আছে অথবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে সত্য প্রকাশে কোন ত্রুটি করেছেন, বরং এর কারণ হচ্ছে কেবলমাত্র তাদের মিথ্যা অহংকার, তাদের জাহেলী আত্মম্ভরিতা এবং তাদের হঠকারিতা, আর উপদেশে পরিপূর্ণ এ কুরআন এ ব্যাপারে সাক্ষী, যা দেখে প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তি স্বীকার করবে যে, এর মধ্যে উপদেশ দেবার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা হয়েছে।"

وَعَجِبُوٓا۟ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾
أَجَعَلَ ٱلْءَالِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ
مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا۟ وَٱصْبِرُوا۟ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾
مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِى ٱلْمِلَّةِ ٱلْءَاخِرَةِ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا ٱخْتِلَٰقٌ ﴿٧﴾ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ
ٱلذِّكْرُ مِنۢ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ مِّن ذِكْرِى ۖ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا۟ عَذَابِ ﴿٨﴾

এরা একথা শুনে বড়ই অবাক হয়েছে যে, এদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন ভীতি প্রদর্শনকারী এসে গেছে।[৪] অস্বীকারকারীরা বলতে থাকে, "এ হচ্ছে যাদুকর,[৫] বড়ই মিথ্যুক, সকল খোদার বদলে সেকি মাত্র একজনকেই খোদা বানিয়ে নিয়েছে? এতো বড় বিস্ময়কর কথা!" আর জাতির সরদাররা একথা বলতে বলতে বের হয়ে গেলো,[৬] "চলো, অবিচল থাকো নিজেদের উপাস্যদের উপাসনায়। একথা তো[৭] ভিন্নতর উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে[৮] নিকট অতীতের মিল্লাতগুলোর মধ্য থেকে কারো কাছ থেকে তো আমরা একথা শুনিনি।[৯] এটি একটি মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের মধ্যে কি মাত্র এ এক ব্যক্তিই থেকে গিয়েছিল যার কাছে আল্লাহর যিক্‌র নাযিল করা হয়েছে?"

আসল কথা হচ্ছে, এরা আমার যিক্‌র–এর ব্যাপারে সন্দেহ করছে[১০] আমার আযাবের স্বাদ পায়নি বলেই এরা এসব করছে।

৪. অর্থাৎ এরা এমনই নির্বোধ যে, যখন এদের নিজেদেরই জাতি, সম্প্রদায় ও গোত্র থেকে একজন জানা–শোনা ভালো লোককে এদেরকে সতর্ক করার জন্য নিযুক্ত করা হয় তখন এ ব্যাপারটি এদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। অথচ মানুষকে সতর্ক করার জন্য যদি আকাশ থেকে কোন ভিন্ন ধরনের প্রাণী পাঠিয়ে দেয়া হতো অথবা তাদের মাঝখানে হঠাৎ যদি বাইর থেকে কোন একজন অপরিচিত ব্যক্তি এসে দাঁড়াতো এবং নিজের নবুওয়াতি চালিয়ে যেতো, তাহলে সেটাই তো অদ্ভুত মনে হবার কথা। সে অবস্থায় তারা নিসন্দেহে বলতে পারতো, আমাদের সাথে অদ্ভুত আচরণ করা হয়েছে। যে মানুষই নয়, সে আমাদের অবস্থা, আবেগ–অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা জানবে কেমন করে? কাজেই সে আমাদের পথের দিশা কেমন করে দেবে? অথবা যে অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ আমাদের মধ্যে এসে গেছে আমরা কেমন করে তার সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা যাচাই করবো এবং কেমন করে জানবো সে নির্ভরযোগ্য কিনা? তার চরিত্র ও কার্যকলাপই বা আমরা দেখলাম কোথায়? কাজেই তাকে নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য মনে করার ফায়সালা করবো কেমন করে?

৫. নবী করীমের (সা) জন্য যাদুকর শব্দটি তারা যে অর্থে ব্যবহার করতো তা হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষকে এমন কিছু যাদু করতেন যার ফলে তারা পাগলের মতো তাঁর পেছনে লেগে থাকতো। কোন সম্পর্কচ্ছেদ করার বা কোন প্রকার ক্ষতির মুখোমুখি হবার কোন পরোয়াই তারা করতো না। পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে ত্যাগ করতো। স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করতো এবং স্বামী স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যেতো। হিজরাত করার প্রয়োজন দেখা দিলে একেবারে সবকিছু সম্পর্ক ত্যাগ করে স্বদেশভূমি থেকে বের হয়ে পড়তো। কারবার শিকেয় উঠুক এবং সমস্ত জ্ঞাতি-ভাইরা বয়কট করুক—কোনদিকেই দৃকপাত করতো না। কঠিন থেকে কঠিনতর শারীরিক কষ্টও বরদাশত করে নিতো কিন্তু ঐ ব্যক্তির পেছনে চলা থেকে বিরত হতো না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, ৫ টীকা)

৬. যে সরদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে আবু তালেবের মজলিস থেকে উঠে গিয়েছিল তাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

৭. অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা যে, কালেমা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু কে মেনে নাও, তাহলে সমস্ত আরব ও আজম তোমাদের হুকুমের তাবেদার হয়ে যাবে।

৮. তাদের বক্তব্য ছিল, এটা একটা মতলবী কথা বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ এ উদ্দেশ্যে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে যে, আমরা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুকুমের তাবেদারী করবো এবং তিনি আমাদের মাথার ওপর নিজে ছড়ি ঘোরাবেন।

৯. অর্থাৎ নিকট অতীতে আমাদের নিজেদের মুরব্বি ও মনীষীরাও অতিক্রান্ত হয়েছেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরাও আমাদের দেশে এবং আশপাশের দেশে রয়েছে এবং অগ্নি উপাসকরা তো ইরান-ইরাক ও সমগ্র পূর্ব আরব ভরে আছে। তাদের কেউও আমাদের একথা বলেনি যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে মেনে নেবে এবং আর কাউকেও মানবে না। একজন এবং মাত্র একক খোদাকে কেউ যথেষ্ট মনে করতে পারে না। আল্লাহর প্রিয়পাত্রদেরকে তো সবাই মেনে চলছে। তাদের আস্তানায় গিয়ে মাথা ঠেকাচ্ছে। নজরানা ও সিন্নি দিচ্ছে। প্রার্থনা করছে। কোথাও থেকে সন্তান পাওয়া যায়। কোথাও রিযিক পাওয়া যায়। কোন আস্তানায় গিয়ে যা চাইবে তাই পাবে। দুনিয়ার বিরাট অংশ তাদের ক্ষমতা মেনে নিয়েছে। তাদের দরবারসমূহ থেকে প্রার্থীদের প্রার্থনা পূর্ণ ও সংকট নিরসন কিভাবে হয়ে থাকে, তাদের অনুগ্রহ লাভকারীরা তা জানিয়ে দিচ্ছে। এখন এ ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা এমন অভিনব কথা শুনছি যা ইতিপূর্বে কোথাও শুনিনি। এ ব্যক্তি বলছে, এদের কারো প্রভুত্বে কোন অংশ নেই এবং সমস্ত প্রভুত্ব একমাত্র এবং একচ্ছত্রভাবে আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত।

১০. অন্যকথায় বলা যায়, আল্লাহ বলেন, হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরা মূলত তোমাকে অস্বীকার করছে না বরং অস্বীকার করছে আমাকে তারাতো পূর্বেও তোমার সত্যবাদিতায় সন্দেহ করেনি। আজ তারা যে এ সন্দেহ করছে এটা আসলে যিক্‌রের কারণে। তাদেরকে উপদেশ দেবার দায়িত্ব যখন আমি তোমার ওপর সোপর্দ করেছি তখন তারা এমন এক ব্যক্তির সত্যবাদিতায় সন্দেহ করতে শুরু করেছে যার

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ⑨ أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ⑩ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ⑪ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ⑫ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْئَيْكَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ⑬ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ⑭

তোমার মহানদাতা ও পরাক্রমশালী পরওয়ারদিগারের রহমতের ভাণ্ডার কি এদের আয়ত্বাধীনে আছে? এরা কি আসমান–যমীন এবং তাদের মাঝখানের সবকিছুর মালিক? বেশ, তাহলে এরা কার্যকারণ জগতের উচ্চতম শিখরসমূহে আরোহণ করে দেখুক।[১১]

বহুদলের মধ্য থেকে এতো ছোট্ট একটি দল, এখানেই এটি পরাজিত হবে।[১২] *এরপূর্বে নূহের সম্প্রদায়, আদ, কীলকধারী ফেরাউন,*[১৩] *সামূদ, লূতের সম্প্রদায় ও আইকাবাসীরা মিথ্যা আরোপ করেছিল। তারা ছিল বিরাট দল। তাদের প্রত্যেকেই রসূলগণকে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের প্রত্যেকের ওপর আমার শাস্তির ফায়সালা কার্যকর হয়েই গেছে।*

সত্যবাদিতার তারা ইতিপূর্বে কসম খেতো। একই বিষয়বস্তু সূরা আল আন'আমের ৩৩ আয়াতেও ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন আল আন'আম, ২১ টীকা)

১১. "এটি হচ্ছে আমাদের মধ্যে কি মাত্র এ এক ব্যক্তিই থেকে গিয়েছিল যার কাছে আল্লাহর যিক্‌র নাযিল করা হয়েছে।" কাফেরদের এ উক্তির জবাব। এর জবাবে আল্লাহ বলছেন ঃ আমি কাকে নবী করবো এবং কাকে করবো না এর ফায়সালা করার দায়িত্ব আমার নিজের। এরা কবে থেকে এ ফায়সালা করার ইখতিয়ার লাভ করলো? যদি এরা এর ইখতিয়ার লাভ করতে চায়, তাহলে বিশ্ব–জাহানের শাসন কর্তৃত্বের আসন লাভ করার জন্য এরা আরশের ওপর পৌঁছে যাবার চেষ্টা করুক। এর ফলে এরা যাকে নিজেদের অনুগ্রহের হকদার মনে করবে তার ওপর অহী নাযিল করবে এবং যাকে আমি হকদার মনে করি তার ওপর অহী নাযিল করবে না। এ বিষয়বস্তু কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হয়েছে। কারণ কুরাইশ বংশীয় কাফেররা বারবার বলছিল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেমন করে নবী হয়ে গেলেন? আল্লাহ কি এ কাজের জন্য কুরাইশদের বড় বড় সরদারদের মধ্য থেকে কাউকে পেলেন না? (দেখুন বনী ইসরাঈল, ১০০ আয়াত এবং আয যুখ্‌রুফ ৩১–৩২ আয়াত)

وَمَا يَنْظُرُ هٰؤُلَاءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝ وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝ اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۝ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ۭ كُلٌّ لَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝

২ রুকূ'

এরাও শুধু একটি বিস্ফোরণের অপেক্ষায় আছে, যার পর আর দ্বিতীয় কোন বিস্ফোরণ হবে না।[১৪] আর এরা বলে, হে আমাদের রব! হিসেবের দিনের আগেই আমাদের অংশ দ্রুত আমাদের দিয়ে দাও।[১৫]

হে নবী! এরা যে কথা বলে তার ওপর সবর করো[১৬] এবং এদের সামনে আমার বান্দা দাউদের কাহিনী বর্ণনা করো,[১৭] যে ছিল বিরাট শক্তিধর,[১৮] প্রত্যেকটি ব্যাপারে ছিল আল্লাহ অভিমুখী। পর্বতমালাকে আমি বিজিত করে রেখেছিলাম তার সাথে, ফলে সকাল সাঁঝে তারা তার সাথে আমার গুণগান, পবিত্রতা ও মহিমা প্রচার করতো। পাখপাখালী সমবেত হতো এবং সবাই তার তাসবীহ অভিমুখী হয়ে যেতো।[১৯]

১২. এখানে বলতে মক্কা মু'আয্যমাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে এরা এসব কথা রচনা করছে সেখানেই একদিন এরা পরাজিত হবে। আর এখানেই একদিন এমন সময় আসবে যখন এরা নতমুখে এমন এক ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে যাকে আজ এরা তুচ্ছ মনে করে নবী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করছে।

১৩. ফেরাউনের জন্য ذی الاوتاد (কীলকধারী) এ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে, তার সালতানাত এমনই মজবুত ছিল যেন যমীনে কীলক পোঁতা রয়েছে। অথবা এই অর্থে যে, তার বিপুল সংখ্যক সৈন্য-সামন্ত যেখানেই অবস্থান করতো সেখানের চারদিকে কেবল তাঁবুর খুঁটিই পোঁতা দেখা যেতো। কিংবা এ অর্থে যে, সে যার প্রতি অসন্তুষ্ট হতো তার দেহে কীলক মেরে মেরে শাস্তি দিতো। আবার সম্ভবত কীলক বলতে মিসরের পিরামিডও বুঝানো যেতে পারে, কেননা এগুলো যমীনের মধ্যে কীলকের মতো গাঁথা রয়েছে।

১৪. অর্থাৎ আযাবের একটিমাত্র ধাক্কা তাদেরকে খতম করে দেবার জন্য যথেষ্ট হবে, দ্বিতীয় কোন ধাক্কার প্রয়োজন হবে না। এ বাক্যের দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, এরপর তারা আর কোন অবকাশ পাবে না। গরুর দুধ দোহন করার সময় এক বাঁট থেকে দুধ টেনে অন্য

এক বাঁটে হাত দেবার মাঝখানে প্রথম বাঁটটিতে দুধ নামতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু অবকাশও তারা পাবে না।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহর আযাবের অবস্থা এইমাত্র বর্ণনা করা হয়েছে এবং অন্যদিকে এ নাদানদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, এরা ঠাট্টা করে বলে, তুমি আমাদের যে বিচারদিনের ভয় দেখাচ্ছো তার আসা পর্যন্ত আমাদের ব্যাপারটি মুলতবী করে রেখো না বরং আমাদের হিসেব এখনই চুকিয়ে দাও। আমাদের অংশে যা কিছু সর্বনাশ লেখা আছে তা এখনই নিয়ে এসো।

১৬. ওপরে মক্কার কাফেরদের যেসব কথা বিবৃত হয়েছে এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাদের এ প্রলাপোক্তি যে, এ ব্যক্তি যাদুকর ও মিথ্যুক, তাদের এ আপত্তি যে, রসূল নিযুক্ত করার জন্য আল্লাহর কাছে কি কেবলমাত্র এ ব্যক্তিটিই থেকে গিয়েছিল এবং এ দোষারোপ যে, এ তাওহীদের দাওয়াত থেকে এ ব্যক্তির উদ্দেশ্য ধর্মীয় প্রচারণা নয় বরং অন্য কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে।

১৭. এ ব্যাক্যের আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে যে, "আমার বান্দা দাউদের কথা স্মরণ করো।" প্রথম অনুবাদের দিক দিয়ে অর্থ হচ্ছে এই যে, এ কাহিনীতে এদের জন্য একটি শিক্ষা রয়েছে। আর দ্বিতীয় অনুবাদের দৃষ্টিতে এর অর্থ হচ্ছে, এ কাহিনীর স্মৃতি তোমাদের ধৈর্য ধারণ করতে সাহায্য করবে। যেহেতু এ কাহিনী বর্ণনা করার পেছনে উভয় উদ্দেশ্যই রয়েছে তাই এতে এমনসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো থেকে উভয়বিধ অর্থ প্রকাশ পায়। (হযরত দাউদের ঘটনার ওপর বিস্তারিত আলোচনা এর আগে নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে এসে গেছে ঃ তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ২৭৩; বনী ইসরাঈল, ৭, ৬৩; আল আম্বিয়া ৭০–৭৩' আন্ নাম্ল, ১৮–২০ এবং সাবা, ১৪–১৬ টীকাসমূহ)

১৮. মূল শব্দাবলী হচ্ছে ঃ ذَا الْأَيْدِ "হাতওয়ালা" হাত শব্দটি কেবল আরবী ভাষাতেই নয় অন্যান্য ভাষাতেও শক্তি ও ক্ষমতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। হযরত দাউদের জন্য যখন তাঁর গুণ হিসেবে বলা হয় তিনি "হাতওয়ালা" ছিলেন তখন অবশ্যই এর অর্থ হবে, তিনি বিপুল শক্তির অধিকারী ছিলেন। এসব শক্তি বলতে নানা ধরনের শক্তি বুঝানো যেতে পারে। যেমন দৈহিক শক্তি। জালুতের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে তিনি এর প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি। এর মাধ্যমে তিনি আশপাশের মুশরিক জাতিসমূহকে পরাজিত করে একটি শক্তিশালী ইসলামী সালতানাত কায়েম করেছিলেন। নৈতিকশক্তি এর বদৌলতে তিনি শাহী মসনদে বসেও ফকিরি করে গেছেন সবসময়। আল্লাহকে ভয় করেছেন এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলেছেন। ইবাদাতের শক্তি। এর অবস্থা এই ছিল যে, রাষ্ট্র পরিচালনা, শাসন কর্তৃত্ব ও আল্লাহর পথে জিহাদের ব্যস্ততার মধ্যেও বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি হামেশা একদিন পরপর রোজা রেখেছেন এবং প্রতিদিন রাতের এক–তৃতীয়াংশ নামাযে অতিবাহিত করতেন। ইমাম বুখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আবুদ দারদার (রা) বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, যখন হযরত দাউদের (আ) কথা আলোচিত হতো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন كَانَ اَعْبَدَ الْبَشَرِ "তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশী ইবাদাতগুযার ব্যক্তি।"

১৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, ৭১ টীকা।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۝٢٠ وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝٢١ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ۝٢٢ اِنَّ هٰذَآ اَخِيْ ۗ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۗ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ۝٢٣

আমি মজবুত করে দিয়েছিলাম তার সালতানাত, তাকে দান করেছিলাম হিকমত এবং যোগ্যতা দিয়েছিলাম ফায়সালাকারী কথা বলার।[২০] তারপর তোমার কাছে কি পৌঁছেছে মামলাকারীদের খবর, যারা দেওয়াল টপকে তার মহলে পৌঁছে গিয়েছিল?[২১] যখন তারা দাউদের কাছে পৌঁছুলো, তাদেরকে দেখে সে ঘাবড়ে গেলো[২২] তারা বললো, "ভয় পাবেন না, আমরা মামলার দুইপক্ষ। আমাদের একপক্ষ অন্য পক্ষের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে যথাযথ সত্য সহকারে ফায়সালা করে দিন, বেইনসাফী করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিন। এ হচ্ছে আমার ভাই,[২৩] এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বী এবং আমার মাত্র একটি। সে আমাকে বললো, এ একটি দুম্বীও আমাকে দিয়ে দাও এবং কথাবার্তায় সে আমাকে দাবিয়ে নিল।"[২৪]

২০. অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য জটিল ও অস্পষ্ট হতো না। সমগ্র ভাষণ শোনার পর শ্রোতা একথা বলতে পারতো না যে তিনি কি বলতে চান তা বোধগম্য নয়। বরং তিনি যে বিষয়ে কথা বলতেন তার সমস্ত মূল কথাগুলো পরিষ্কার করে তুলে ধরতেন এবং আসল সিদ্ধান্ত প্রত্যাশী বিষয়টি যথাযথভাবে নির্ধারণ করে দিয়ে তার দ্ব্যর্থহীন জবাব দিয়ে দিতেন। কোন ব্যক্তি জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, বিচার-বিবেচনা ও বাকচাতুর্যের উচ্চতম পর্যায়ে অবস্থান না করলে এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না।

২১. এখানে হযরত দাউদের কথা যে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে তা আসলে এ কাহিনী শুনানো থেকে শুরু হয়েছে। এর আগে তাঁর যে উন্নত গুণাবলীর কথা ভূমিকাস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র একথা বলা যে, যাঁর সাথে এ ব্যাপারটি ঘটে গেছে সে দাউদ আলাইহিস সালাম কত বড় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

২২. সোজা পথ ব্যবহার না করে হঠাৎ দেয়াল টপকে দেশের শাসনকর্তার মহলের নির্জনকক্ষে দু'জন লোক পৌঁছে গেছে, এটাই ছিল ঘাবড়ে যাওয়ার বা ভয় পাওয়ার কারণ।

২৩. ভাই মানে মায়ের পেটের ভাই নয় বরং দীনী এবং জাতীয় ভাই।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

দাউদ জবাব দিল, "এ ব্যক্তি নিজের দুম্বীর সাথে তোমার দুম্বী যুক্ত করার দাবী করে অবশ্যই তোমার প্রতি জুলুম করেছে।[২৫] আর আসল ব্যাপার হচ্ছে, মিলেমিশে একসাথে বসবাসকারীরা অনেক সময় একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে, তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে একমাত্র তারাই এতে লিপ্ত হয় না এবং এ ধরনের লোক অতি অল্প।" (একথা বলতে বলতেই) দাউদ বুঝতে পারলো, এ তো আমি আসলে তাকে পরীক্ষা করেছি, কাজেই সে নিজের রবের কাছে ক্ষমা চাইলো, সিজদানত হলো এবং তার দিকে রুজু করলো।[২৬] তখন আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করে দিলাম এবং নিশ্চয়ই আমার কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম প্রতিদান।[২৭]

২৪. সামনের আলোচনা ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ ফরিয়াদী পক্ষ একথা বলছে না যে, এ ব্যক্তি আমার সে একটি দুম্বীও ছিনিয়ে নিয়েছে এবং নিজের দুম্বীগুলোর মধ্যে তাকে মিশিয়ে দিয়েছে। বরং সে বলছে, এ ব্যক্তি আমার কাছে আমার দুম্বী চাইছে এবং কথাবার্তায় আমাকে দাবিয়ে নিয়েছে। কারণ সে প্রতাপশালী বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং আমি একজন গরীব লোক। এর দাবী রদ করার ক্ষমতা আমার নেই।

২৫. এখানে কারো সন্দেহ করার প্রয়োজন নেই যে, হযরত দাউদ (আ) এক পক্ষের কথা শুনে নিজের সিদ্ধান্ত কেমন করে শুনিয়ে দিলেন। আসল কথা হচ্ছে, বাদীর অভিযোগ শুনে বিবাদী যখন খামূশ হয়ে থাকলো এবং প্রতিবাদে কিছুই বললো না তখন এটি স্বতস্ফূর্তভাবে তার স্বীকৃতিদানের সমর্থক হয়ে গেলো। এ কারণে হযরত দাউদ (আ) স্থির নিশ্চিত হলেন যে, ফরিয়াদী যা বলছে আসল ঘটনাই তাই।

২৬. এ জায়গায় তেলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব কিনা, এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফে'ঈ বলেন, এখানে সিজদা ওয়াজিব নয় বরং এ তো একজন নবীর তাওবা। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা বলেন, ওয়াজিব। এ প্রসংগে মুহাদ্দিসগণ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তিনটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ইকরামার বর্ণনা মতে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "যেসব আয়াত পাঠ করলে সিজদা ওয়াজিব হয় এটি তার অন্তরভুক্ত নয়। কিন্তু আমি এ

স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিজদা করতে দেখেছি।" (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ) সা'দ ইবনে জুবাইর তাঁর কাছ থেকে অন্য যে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তার শব্দাবলী হচ্ছে ঃ "সূরা 'সা–দ'–এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা করেছেন এবং বলেছেন ঃ দাউদ আলাইহিস সালাম তাওবা হিসেবে সিজদা করেছিলেন এবং আমরা শোকরানার সিজদা করি।" অর্থাৎ তাঁর তাওবা কবুল হয়েছে এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। (নাসাঈ) তৃতীয় যে হাদীসটি মুজাহিদ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেন, কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দিয়েছেন,

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"এরা ছিলেন এমনসব লোক যাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন। কাজেই তুমি এদের পথ অনুসরণ করো।"

এখন যেহেতু হযরত দাউদও একজন নবী ছিলেন এবং তিনি এ স্থানে সিজদা করেছিলেন, তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁকে অনুসরণ করে এ স্থানে সিজদা করেছেন। (বুখারী) এ তিনটি বর্ণনা হচ্ছে হযরত ইবনে আব্বাসের। আর হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার খুতবার মধ্যে সূরা সা–দ পড়েন এবং এ আয়াতে এসে পৌঁছলে মিম্বার থেকে নিচে নেমে এসে সিজদা করেন এবং তাঁর সাথে সাথে সমবেত সবাইও সিজদা করে। তারপর দ্বিতীয় আর একবার অনুরূপভাবে তিনি এ সূরাটি পড়েন এবং এ আয়াতটি শুনার সাথে সাথে লোকেরা সিজদা করতে উদ্যত হয়। তখন নবী করীম (সা) বলেন, "এটি একজন নবীর তাওবা কিন্তু আমি দেখছি তোমরা সিজদা করতে প্রস্তুত হয়ে গেছো"—একথা বলে তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসেন এবং সিজদা করেন। সমবেত সবাইও সিজদা করে। (আবু দাউদ) এসব হাদীস থেকে যদিও সিজদা ওয়াজিব হবার চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না তবুও এতটুকু কথা অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, এ স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় সিজদা করেছেন এবং সিজদা না করার তুলনায় এখানে সিজদা করাটা অবশ্যই উত্তম। বরং ইবনে আব্বাসের (রা) তৃতীয় যে বর্ণনাটি আমরা ইমাম বুখারীর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছি সেটি ওয়াজিব না হওয়ার তুলনায় ওয়াজিব হওয়ার পাল্লার দিকটি ঝুঁকিয়ে দেয়।

এ আয়াতটি থেকে যে আর একটি বিষয়বস্তু বের হয়ে আসে সেটি হচ্ছে ঃ আল্লাহ এখানে خَرَّ رَاكِعًا (রুকূ'তে অবনত হয়) শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সকল মুফাস্সির এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এর অর্থ خَرَّ سَاجِدًا (সিজদায় অবনত হয়)। এ কারণে ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সহযোগীগণ এমত পোষণ করেছেন যে, নামাযে বা নামায ছাড়া অন্য অবস্থায় সিজদার আয়াত শুনে বা পড়ে সিজদা না করে কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র রুকূ'ও করতে পারে। কারণ আল্লাহ নিজেই যখন রুকূ' শব্দ বলে সিজদা অর্থ নিয়েছেন তখন জানা গেলো রুকূ' সিজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। শাফেঈ ফকীহগণের মধ্যে ইমাম খাত্তাবীও এ মত পোষণ করেন। এ অভিমতটি একটি অভিমত হিসেবে

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

(আমি তাকে বললাম) "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, কাজেই তুমি জনগণের মধ্যে সত্য সহকারে শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করো এবং প্রবৃত্তির কামনার অনুসরণ করো না, কারণ তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী হয় অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, যেহেতু তারা বিচার দিবসকে ভুলে গেছে।"[২৮]

নির্ভুল ও যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নেই কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের কার্যক্রমের মধ্যে আমরা এর কোন নজির দেখি না যে, সিজদার আয়াত শুনে বা পড়ে সিজদা করার পরিবর্তে তাঁরা রুকূ' করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। কাজেই এ অভিমত কার্যত বাস্তবায়িত একমাত্র তখনই করা উচিত যখন সিজদা করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে। নিয়মিতভাবে এ রকম করা সঠিক হবে না। নিয়মিত এ রকম করা ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহযোগীদের উদ্দেশ্যও নয়। বরং তাঁরা কেবলমাত্র এর বৈধতার প্রবক্তা।

২৭. এ থেকে জানা যায়, হযরত দাউদের (আ) ত্রুটি তো অবশ্যই হয়েছিল এবং সেটি এমন ধরনের ত্রুটি ছিল যার সাথে দুম্বীর মামলার এক ধরনের সামঞ্জস্য ছিল। তাই তার ফায়সালা শুনাতে গিয়ে সংগে সংগেই তাঁর মনে চিন্তা জাগে, এর মাধ্যমে আমার পরীক্ষা হচ্ছে। কিন্তু এ ত্রুটি এমন মারাত্মক ধরনের ছিল না যা ক্ষমা করা যেতো না অথবা ক্ষমা করা হলেও তাঁকে উন্নত মর্যাদা থেকে নামিয়ে দেয়া হতো। আল্লাহ নিজেই এখানে সুস্পষ্টভাষায় বলছেন, যখন তিনি সিজদায় পড়ে তাওবা করেন তখন তাঁকে কেবল ক্ষমাই করে দেয়া হয়নি বরং দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি যে উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তাতেও ফারাক দেখা দেয়নি।

২৮. তাওবা কবুল করার ও মর্যাদা বৃদ্ধির সুসংবাদ দেবার সাথে সাথে মহান আল্লাহ সে সময় হযরত দাউদকে (আ) এ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেন। এ থেকে একথা আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে যায় যে, তিনি যে কাজটি করেছিলেন তাতে প্রবৃত্তির কামনার কিছু দখল ছিল, শাসন ক্ষমতার অসংগত ব্যবহারের সাথেও তার কিছু সম্পর্ক ছিল এবং তা এমন কোন কাজ ছিল যা কোন ন্যায়নিষ্ঠ শাসকের জন্য শোভনীয় ছিল না।

এখানে এসে আমাদের সামনে তিনটি প্রশ্ন দেখা দেয়। এক, সেটি কি কাজ ছিল? দুই, আল্লাহ পরিষ্কারভাবে সেটি না বলে এভাবে অন্তরালে রেখে সেদিকে ইংগিত করছেন কেন? তিন, এ প্রেক্ষাপটে তার উল্লেখ করা হয়েছে কোন্ সম্পর্কের ভিত্তিতে?

যারা বাইবেল (খৃষ্টান ও ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থ) অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের কাছে একথা গোপন নেই যে, এ গ্রন্থে হযরত দাউদের বিরুদ্ধে হিত্তীয় উরিয়ার (Uriah the Hittite) স্ত্রীর সাথে যিনা করার এবং তারপর উরিয়াকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিয়ে করার পরিষ্কার অভিযোগ আনা হয়েছে। আবার এই সংগে একথাও বলা হয়েছে যে, এ মেয়েটি যে এক ব্যক্তির স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে হযরত দাউদের হাওয়ালা করে দিয়েছিল সে-ই ছিল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের মা। এ সম্পর্কিত পুরো কাহিনীটি বাইবেলের শামুয়েল-২ পুস্তকের ১১-১২ অধ্যায়ে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। কুরআন নাযিল হবার শত শত বছর পূর্বে এগুলো বাইবেলে সন্নিবেশিত হয়েছিল। সারা দুনিয়ার ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই তাদের এ পবিত্র কিতাব পাঠ করতো অথবা এর পাঠ শুনতো সে-ই এ কাহিনীটি কেবল জানতোই না বরং এটি বিশ্বাসও করতো। তাদেরই মাধ্যমে দুনিয়ায় এ কাহিনীটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আজ অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বনী ইসরাঈল ও ইহুদী ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কিত এমন কোন একটি বইও লিখিত হয় না যেখানে হযরত দাউদের বিরুদ্ধে এই দোষারোপের পুনরাবৃত্তি করা হয় না। এ বহুল প্রচলিত কাহিনীতে একথাও লিখিত হয়েছে ঃ

"পরে সদাপ্রভূ দাউদের নিকটে নাথনকে প্রেরণ করিলেন। আর তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—এক নগরে দুইটি লোক ছিল; তাহাদের মধ্যে একজন ধনবান, আর একজন দরিদ্র। ধনবানের অতি বিস্তর মেষাদি পাল ও গোপাল ছিল। কিন্তু সেই দরিদ্রের আর কিছুই ছিল না, কেবল একটি ক্ষুদ্র মেষবৎসা ছিল, সে তাহাকে কিনিয়া পুষিতে ছিল; আর সেটি তাহার সংগে ও তাহার সন্তানদের সংগে থাকিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল; সে তাহারই খাদ্য খাইত ও তাহারই পাত্রে পান করিত, আর তাহার বক্ষস্থলে শয়ন করিত ও তাহার কন্যার মত ছিল। পরে ঐ ধনবানের গৃহে একজন পথিক আসিল, তাহাতে বাটিতে আগত অতিথির জন্য পান করণার্থে সে আপন মেষাদি পাল ও গোপাল হইতে কিছু লইতে কাতর হইল, কিন্তু সেই দরিদ্রের মেষবৎসাটি লইয়া, যে অতিথি আসিয়াছিল, তাহার জন্য তাহাই পাক করিল। তাহাতে দাউদ সেই ধনবানের প্রতি অতিশয় ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন তিনি নাথনকে কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভূর দিব্য, যে ব্যক্তি সেই কর্ম করিয়াছে, সে মৃত্যুর সন্তান; সে কিছু দয়া না করিয়া এ কর্ম্ম করিয়াছে, এই জন্য সেই মেষ বৎসার চর্তুগুণ ফিরাইয়া দিবে।

তখন নাথন দাউদকে কহিলেন, আপনিই সেই ব্যক্তি। ইস্রায়েলের ঈশ্বর, সদাপ্রভূ এই কথা কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষেক করিয়াছি এবং শৌলের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছি, আর তোমার প্রভূর বাটী তোমাকে দিয়াছি ও তোমার প্রভূর স্ত্রীগণকে তোমার বক্ষস্থলে দিয়াছি এবং ইস্রায়েলের ও জিহূদার কুল তোমাকে দিয়াছি; আর তাহা যদি অল্প হইত, তবে তোমাকে আরও অমুক অমুক বস্তু দিতাম। তুমি কেন সদাপ্রভূর বাক্য তুচ্ছ করিয়া, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিয়াছ? তুমি হিত্তীয় উরিয়কে খড়গ দ্বারা আঘাত করাইয়াছ ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া আপনার স্ত্রী করিয়াছ, আম্মোন-সন্তানদের খড়গ দ্বারা উরিয়াকে মারিয়া ফেলিয়াছ।"

(২-শমূয়েল ১২ ঃ ১-৯)

এই কাহিনী এবং এর বহুলপ্রচারের উপস্থিতিতে কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে কোন বিস্তারিত বর্ণনা দেবার প্রয়োজন ছিল না। এ ধরনের বিষয়গুলোকে আল্লাহর কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করাও আল্লাহর রীতি নয়। তাই এখানে পরদার অন্তরালে রেখে এদিকে ইংগিতও করা হয়েছে এবং এ সংগে একথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আসল ঘটনা কি ছিল এবং কিতাবধারীরা তাকে কিভাবে ভিন্নরূপ দিয়েছে। কুরআন মজীদের উপরোল্লিখিত বর্ণনা থেকে যে আসল ঘটনা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় তা হচ্ছে এই ঃ হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম উরিয়ার (অথবা এ ব্যক্তির যে নাম থেকে থাকুক) কাছে নিছক নিজের মনের এ আকাংখা পেশ করেছিলেন যে, সে যেন নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। আর যেহেতু এ আকাংখা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়নি বরং একজন মহাপরাক্রমশালী শাসক এবং জবরদস্ত দীনী গৌরব ও মাহাত্মের অধিকারী ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে প্রজামন্ডলীর একজন সদস্যের সামনে প্রকাশ করা হচ্ছিল, তাই এ ব্যক্তি কোন প্রকার বাহ্যিক বল প্রয়োগ ছাড়াই তা গ্রহণ করে নেবার ব্যাপারে নিজেকে বাধ্য অনুভব করছিল। এ অবস্থায় হযরত দাউদের (আ) আহবানে সাড়া দেবার জন্য তার উদ্যোগ নেবার পূর্বেই জাতির দু'জন সৎলোক অকস্মাৎ হযরত দাউদের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং একটি কাল্পনিক মামলার আকারে এ বিষয়টি তাঁর সামনে পেশ করলেন। প্রথমে হযরত দাউদ (আ) মনে করেছিলেন এটি যথার্থই তাঁর সামনে পেশকৃত একটি মামলা। কাজেই মামলাটির বিবরণ শুনে তিনি নিজের ফায়সালা শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু মুখ থেকে ফায়সালার শব্দগুলো বের হবার সাথে সাথেই তাঁর বিবেক তাঁকে সতর্ক করে দিল যে, এটি একটি রূপক আকারে তাঁর ও ঐ ব্যক্তির বিষয়ের সাথে মিলে যায় এবং যে কাজটিকে তিনি জুলুম গণ্য করছেন তাঁর ও ঐ ব্যক্তির বিষয়ে তার প্রকাশ ঘটছে। এ অনুভূতি মনের মধ্যে সৃষ্টি হবার সাথে সাথেই তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদা ও তাওবা করলেন এবং নিজের ঐ কাজটি থেকেও বিরত হলেন।

বাইবেলে এ ঘটনাটি এহেন কলংকিতরূপে চিত্রিত হলো কেমন করে? সামান্য চিন্তা–ভাবনা করলে একথাটিও বুঝতে পারা যায়। মনে হয়, কোন উপায়ে হযরত দাউদ (আ) ঐ ভদ্রমহিলার গুণাবলী জানতে পেরেছিলেন। তাঁর মনে আকাংখা জেগেছিল, এ ধরনের যোগ্যতাসম্পন্না মহিলার পক্ষে একজন সাধারণ অফিসারের স্ত্রী হয়ে থাকার পরিবর্তে রাজরানী হওয়া উচিত। এ চিন্তার বশবর্তী হয়ে তিনি তার স্বামীর কাছে এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, সে যেন তাকে তালাক দিয়ে দেয়। বনী ইসরাঈলী সমাজে এটা কোন নিন্দনীয় বিষয় ছিল না বলেই তিনি এতে কোন প্রকার অনিষ্টকারিতা অনুভব করেননি। তাদের সমাজে এটা অত্যন্ত মামুলি ব্যাপার ছিল যে, একজন অন্য একজনের স্ত্রীকে পছন্দ করলে নিসংকোচে তার কাছে আবেদন করতো তোমার স্ত্রীকে আমার জন্য ছেড়ে দাও। এ ধরনের আবেদনে কারো মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া হতো না। বরং অনেক সময় এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে খুশী করার জন্য নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতো। যাতে সে তাকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু একথা বলতে গিয়ে হযরত দাউদের মনে এ অনুভূতি জাগেনি যে, একজন সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে এ ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করা জুলুম ও বলপ্রয়োগের রূপধারণ না করতে পারে তবে একজন শাসকের পক্ষ থেকে যখন এ ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয় তখন তা বলপ্রয়োগমুক্ত হতে পারে না। উল্লেখিত রূপক মোকদ্দমার মাধ্যমে যখন এ দিকে

তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হলো তখন নির্দ্বিধায় তিনি নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। এভাবে একটি কথার উদ্ভব হয়েছিল এবং তা খতমও হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু পরে কোন এক সময় যখন তাঁর কোন ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা ছাড়াই ঐ ভদ্রমহিলার স্বামী এক যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলো এবং হযরত দাউদ (আ) তাকে বিয়ে করে নিলেন তখন ইহুদীদের দুষ্ট মানসিকতা কল্পকাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হলো। আর বনী ইসরাঈলীদের একটি দল যখন হযরত সুলাইমানের শত্রু হয়ে গেলো তখন তাদের এ দুষ্ট মানসিকতা দ্রুত কাজ শুরু করে দিল। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন্ নামৃল, ৫৬ টীকা) এসব উদ্যোগ ও ঘটনাবলীর প্রভাবাধীনে এ কাহিনী রচনা করা হলো যে, হযরত দাউদ (আ) নাউযুবিল্লাহ তাঁর প্রাসাদের ছাদের ওপর উরিয়ার স্ত্রীকে এমন অবস্থায় দেখে নিয়েছিলেন যখন তিনি উলংগ হয়ে গোসল করছিলেন। তিনি তাকে নিজের মহলে ডেকে এনে তার সাথে যিনা করলেন। এতে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি বনী আম্মোন এর মোকাবিলায় উরিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেনাপতি যোয়াবকে হুকুম দিলেন তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে এমন এক জায়গায় নিযুক্ত করতে যেখানে সে নিশ্চিতভাবে নিহত হবে। তারপর যখন সে মারা গেলো, তিনি তার স্ত্রীকে বিয়ে করে নিলেন। এ মহিলার গর্ভে সুলাইমানের (আলাইহিস সালাম) জন্ম হলো। এসব মিথ্যা অপবাদ জালেমরা তাদের পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছে। এভাবে বংশ পরম্পরায় এর পাঠের ব্যবস্থা করেছে। তারা এসব পড়তে থাকবে এবং নিজেদের দু'জন শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করতে থাকবে। হযরত মূসার (আ) পরে এঁরা দু'জনই ছিলেন তাদের সবচেয়ে বড় পথপ্রদর্শক।

কুরআন ব্যাখ্যাতাগণের একটি দল তো বনী ইসরাঈলের পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে এ সম্পর্কিত যেসব কিস্সা কাহিনী এসে পৌঁছেছে সেগুলো হুবহু গ্রহণ করে নিয়েছেন। ইসরাঈলী বর্ণনার মধ্য থেকে কেবলমাত্র যে অংশটুকুতে হযরত দাউদের বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দেয়া হয়েছিল এবং যেখানে ভদ্রমহিলার গর্ভবতী হয়ে যাবার উল্লেখ ছিল সে অংশটুকু তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের উদ্ধৃত বাদবাকি সমস্ত কাহিনী বনী ইসরাঈলের সমাজে যেভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল ঠিক সেভাবেই তাঁদের রচনায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দলটি দুম্বীর মোকদ্দমার সাথে সামঞ্জস্য রাখে হযরত দাউদের এমন কোন কর্মতৎপরতার কথা সরাসরি অস্বীকার করেছেন। এর পরিবর্তে তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে এ কাহিনীর এমন সব ব্যাখ্যা দেন যা একেবারেই ভিত্তিহীন, যেগুলোর কোন উৎস নেই এবং কুরআনের পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের সাথেও যার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মুফাস্সিরদের মধ্যে আবার এমন একটি দলও আছে যারা সঠিক তত্ত্ব পেয়ে গেছেন এবং কুরআনের সুস্পষ্ট ইংগিতগুলো থেকে আসল সত্যটির সন্ধান লাভ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতিপয় উক্তি অনুধাবন করুন ঃ

মাসরূক ও সাঈদ ইবনে জুবাইর উভয়েই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, "হযরত দাউদ (আ) সে ভদ্র মহিলার স্বামীর কাছে এ ইচ্ছা প্রকাশ করার চাইতে বেশী কিছু করেননি যে, তোমার স্ত্রীকে আমার জন্য ছেড়ে দাও।" (ইবনে জারীর)

আল্লামা যামাখশারী তাঁর কাশ্শাফ তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "আল্লাহ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কাহিনীটি যে আকারে বর্ণনা করেছেন তা থেকে তো একথাই

প্রকাশিত হয় যে, তিনি ঐ ব্যক্তির কাছে কেবলমাত্র এ ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন যে, সে তাঁর জন্য যেন তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে।"

আল্লামা আবু বকর জাসসাস এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ঐ ভদ্র মহিলা ঐ ব্যক্তির বিবাহিত স্ত্রী ছিল না বরং ছিল কেবলমাত্র তার বাগদত্তা বা তার সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। হযরত দাউদ সে ভদ্র মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দিলেন। এর ফলে আল্লাহর ক্রোধ বর্ষিত হলো। কারণ, তিনি তাঁর মু'মিন ভাইয়ের পয়গামের ওপর পয়গাম দিয়েছিলেন। অথচ তাঁর গৃহে পূর্ব থেকেই কয়েকজন স্ত্রী ছিল। (আহকামুল কুরআন) অন্য কয়েকজন মুফাস্সিরও এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একথাটি কুরআনের বর্ণনার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে না। কুরআন মজীদে মোকদ্দমা পেশকারীর মুখ নিসৃত শব্দাবলী হচ্ছে ঃ

لِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا

"আমার কাছে একটিমাত্র দুম্বী আছে এবং এ ব্যক্তি বলছে, ওটি আমাকে দিয়ে দাও।" একথাই হযরত দাউদ (আ) তাঁর ফায়সালায়ও বলেছেন ঃ

قَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ

"তোমার দুম্বী চেয়ে সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে।" এ রূপকটি হযরত দাউদ ও উরিয়ার কাহিনীর সাথে তখনই খাপ খেতে পারে যখন ঐ ভদ্র মহিলা হবে তার স্ত্রী। একজনের বিয়ের পয়গামের ওপর যদি অন্যজনের পয়গাম দেবার ব্যাপার হতো তাহলে রূপকটি এভাবে বলা হতো ঃ "আমি একটি দুম্বী নিতে চাইছিলাম কিন্তু সে বললো, ওটিও আমার জন্য ছেড়ে দাও।"

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রসংগে লিখেছেন ঃ "আসল ঘটনা মাত্র এতটুকুই যে, হযরত দাউদ (আ) তাঁর নিজের লোকদের মধ্য থেকে একজনকে বলেন, তোমার স্ত্রীকে আমার জন্য ছেড়ে দাও এবং গুরুত্ব সহকারে এ দাবী করেন।............... কুরআন মজীদে একথা বলা হয়নি যে, তাঁর দাবীর কারণে সে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, হযরত দাউদ তারপর সে মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তারই গর্ভে হযরত সুলাইমানের জন্ম হয়।................ যে কথার জন্য ক্রোধ নাযিল হয় সেটি এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তিনি এক মহিলার স্বামীর কাছে এ অভিলাস ব্যক্ত করেন যে, সে যেন তার স্ত্রীকে তাঁর জন্য ছেড়ে দেয়।......... এ কাজটি সামগ্রিকভাবে কোন বৈধ কাজ হলেও নবুওয়াতের মর্যাদা থেকে এটি ছিল অনেক নিম্নতর ব্যাপার। এ জন্যই তাঁর ওপর আল্লাহর ক্রোধ নাযিল হয় এবং তাঁকে উপদেশও দেয়া হয়।"

এখানে যে প্রেক্ষাপটে এ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে এ তাফসীরটিই খাপ খেয়ে যায়। বক্তব্য পরম্পরা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, কুরআন মজীদের এ স্থানে এ ঘটনাটি দু'টি উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবর করার উপদেশ দেয়া এবং এ উদ্দেশ্যে

তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ "এরা তোমার বিরুদ্ধে যা কিছু বলে সে ব্যাপারে সবর করো এবং আমার বান্দা দাউদের কথা স্মরণ করো।" অর্থাৎ তোমাকে শুধুমাত্র যাদুকর ও মিথ্যুক বলা হচ্ছে কিন্তু আমার বান্দা দাউদকে তো জালেমরা ব্যভিচার ও হত্যার ষড়যন্ত্র করার অপবাদ পর্যন্ত দিয়েছিল। কাজেই এদের কাছ থেকে তোমার যাকিছু শুনতে হয় তা বরদাশ্‌ত করতে থাকো। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হচ্ছে কাফেরদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, তোমরা সব রকমের হিসেব–নিকেশের শংকামুক্ত হয়ে দুনিয়ায় নানা ধরনের বাড়াবাড়ি করে যেতে থাকো কিন্তু যে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে তোমরা এসব কাজ করছো তিনি কাউকেও হিসেব–নিকেশ না নিয়ে ছাড়েন না। এমনকি যেসব বান্দা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ও নৈকট্যলাভকারী হয় তাঁরাও যদি কখনো সামান্যতম ভুল–ভ্রান্তি করে বসেন তাহলে বিশ্ব–জাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ তাঁদেরকেও কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন করেন। এ উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, তাদের সামনে আমার বান্দা দাউদের কাহিনী বর্ণনা করো, যিনি ছিলেন বিচিত্র গুণধর ব্যক্তিত্বের অধিকারী কিন্তু যখন তাঁর দ্বারা একটি অসংগত কাজ সংঘটিত হলো তখন দেখো কিভাবে আমি তাকে তিরস্কার করেছি।

এ সম্পর্কে আর একটি ভুল ধারণাও থেকে যায়। এটি দূর করাও জরুরী। রূপকের মাধ্যমে মোকদ্দমা পেশকারী বলছে, এ ব্যক্তির ৯৯টি দুম্বী আছে এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বী আর সেটিই এ ব্যক্তি চাচ্ছে। এ থেকে বাহ্যত এ ধারণা হতে পারে যে, সম্ভবত হযরত দাউদের ৯৯ জন স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি আর একজন মহিলাকে বিয়ে করে স্ত্রীদের সংখ্যা একশত পূর্ণ করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আসলে রূপকের প্রত্যেকটি অংশের সাথে হযরত দাউদ ও হিত্তীয় উরিয়ার ঘটনার প্রত্যেকটি অংশের ওপর অক্ষরে অক্ষরে প্রযুক্ত হওয়া জরুরী নয়। প্রচলিত প্রবাদে দশ, বিশ, পঞ্চাশ ইত্যাদি সংখ্যাগুলোর উল্লেখ কেবলমাত্র আধিক্য প্রকাশ করার জন্যই করা হয়ে থাকে সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করার জন্য এগুলো বলা হয় না। আমরা যখন কাউকে বলি, দশবার তোমাকে বলেছি তবু তুমি আমার কথায় কান দাওনি তখন এর মানে এ হয় না যে, গুণে গুণে দশবার বলা হয়েছে বরং এর অর্থ হয়, বারবার বলা হয়েছে। এমনি ধরনের ব্যাপার এখানে ঘটেছে। রূপকের আকারে পেশকৃত মোকদ্দমার মাধ্যমে সে ব্যক্তি হযরত দাউদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন যে, আপনার তো কয়েকজন স্ত্রী আছেন এবং তারপরও আপনি অন্য ব্যক্তির স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন। একথাটিই মুফাস্‌সির নিশাপুরী হযরত হাসান বসরী (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لم يكن لداؤد تسع وتسعون امرأة وانما هذا مثل

"হযরত দাউদের ৯৯টি স্ত্রী ছিল না বরং এটি নিছক একটি রূপক।"

(একাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার তাফহীমাত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। আমি এখানে যে ব্যাখ্যার প্রাধান্য দিয়েছি তার সপক্ষে বিস্তারিত দলিল প্রমাণ যারা জানতে চান তারা উক্ত গ্রন্থের ২৯ থেকে ৪৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ুন।)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

৩ রুকূ'

আমি তো আকাশ ও পৃথিবীকে এবং তাদের মাঝখানে যে জগত রয়েছে তাকে অনর্থক সৃষ্টি করিনি।[২৯] এতো যারা কুফরী করেছে তাদের ধারণা আর এ ধরনের কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হওয়া। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আর যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদেরকে আমি কি সমান করে দেবো? মুত্তাকীদেরকে কি আমি দুষ্কৃতকারীদের মতো করে দেবো?[৩০]—এটি একটি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ কিতাব,[৩১] যা (হে মুহাম্মাদ!) আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে এরা তার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলরা তা থেকে শিক্ষা নেয়।

২৯. অর্থাৎ নিছক খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি এর পেছনে কোন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নেই, কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ নেই, এর মধ্যে কোন ন্যায় ও ইনসাফ নেই এবং কোন ভালো ও মন্দ কাজের কোন ফল দেখা যায় না এমন নয়। এ উক্তি পেছনের ভাষণের সারনির্যাস এবং সামনের বিষয়বস্তুর মুখবন্ধও। পেছনের ভাষণের পর এ বাক্য বলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এ সত্যটি শ্রোতাদের মনে বসিয়ে দেয়া যে, মানুষকে এখানে লাগাম ছাড়া উটের মতো ছেড়ে দেয়া হয়নি এবং দুনিয়াতে যার যা মন চাইবে তাই করে যেতে থাকবে এ জন্য কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না এমন কোন শাসকবিহীন অবস্থাও এখানে চলছে না। সামনের দিকের বিষয়বস্তুর মুখবন্ধ হিসেবে এ বাক্য থেকে বক্তব্য শুরু করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস করে না এবং নিজে একথা মনে করে বসেছে যে, সৎকর্মকারী ও দুষ্কৃতকারী উভয়ই শেষ পর্যন্ত মরে মাটি হয়ে যাবে, কাউকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না, ভালো বা মন্দ কাজের কেউ কোন প্রতিদান পাবে না, সে আসলে দুনিয়াকে একটি খেলনা এবং এর সৃষ্টিকর্তাকে একজন খেলোয়াড় মনে করে। সে আরো মনে করে, বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা দুনিয়া সৃষ্টি করে এবং তার মধ্যে মানুষ সৃষ্টি করে একটি অর্থহীন কাজ করেছেন। একথাটিই কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। যেমন,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ۞ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۞ فَقَالَ اِنِّيۡۤ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۞ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۞

আর দাঊদকে আমি সুলাইমান (রূপ) সন্তান দিয়েছি,[৩২] সর্বোত্তম বান্দা, বিপুলভাবে নিজের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সে সময় যখন অপরাহ্নে তার সামনে খুব পরিপাটি করে সাজানো দ্রুতগতি সম্পন্ন ঘোড়া পেশ করা হলো।[৩৩] তখন সে বললো, "আমি এ সম্পদ–প্রীতি[৩৪] অবলম্বন করেছি আমার রবের স্মরণের কারণে," এমনকি যখন সে ঘোড়াগুলো দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলো তখন (সে হুকুম দিল) তাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো তারপর তাদের পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগলো।[৩৫]

"তোমরা কি মনে করেছো আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না।" (আল মু'মিনূন, ১১৫)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○ مَا خَلَقْنٰهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

"আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে এবং তাদের মাঝখানে যে বিশ্ব–জাহান রয়েছে তাদেরকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি তাদেরকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। আসলে চূড়ান্ত বিচারের দিনে তাদের সবার জন্য উপস্থিতির সময় নির্ধারিত রয়েছে।" (আদ দুখান, ৩৮–৪০)

৩০. অর্থাৎ সৎ ও অসৎ উভয় শেষ পর্যন্ত সমান হয়ে যাবে একথা কি তোমাদের মতে যুক্তিসংগত? কোন সৎলোক তার সততার কোন পুরস্কার পাবে না এবং কোন অসৎলোক তার অসৎকাজের শাস্তি ভোগ করবে না, এ ধারণায় কি তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারো? একথা সুস্পষ্ট, যদি আখেরাত না থাকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকার জবাবদিহি না হয় এবং মানুষের কাজের কোন পুরস্কার ও শাস্তি না দেয়া হয় তাহলে এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রজ্ঞা ও ইনসাফ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব–জাহানের সমগ্র ব্যবস্থা একটি অরাজক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এ ধারণার ভিত্তিতে বিচার করলে দুনিয়ায় আদৌ সৎকাজের কোন উদ্যোক্তা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার জন্য কোন প্রতিবন্ধকতাই থাকে না। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব নাউযুবিল্লাহ যদি এমনি অরাজক ব্যাপার হয় তাহলে এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি কষ্টভোগ করে নিজে সৎ জীবন যাপন করে এবং মানুষের সংস্কার

সাধনের কাজে আত্মনিয়োগ করে সে বড়ই নির্বোধ। আর যে ব্যক্তি অনুকূল সুযোগ–সুবিধা পেয়ে সব রকমের বাড়াবাড়ি করে লাভের ফল কুড়াতে থাকে এবং সব ধরনের ফাসেকী ও অশালীন কার্যকলাপের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করতে থাকে সে বুদ্ধিমান।

৩১. বরকতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, "কল্যাণ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি।" কুরআন মজীদকে বরকত সম্পন্ন কিতাব বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, এটি মানুষের জন্য একটি অত্যন্ত উপকারী কিতাব। এ কিতাবটি তার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বোত্তম বিধান দান করে। এর বিধান মেনে চলায় মানুষের লাভই হয় কেবল, কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা নেই।

৩২. হযরত সুলাইমান সম্পর্কিত আলোচনা ইতিপূর্বে নিম্নোক্ত স্থানগুলোতে এসেছে ঃ তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ১০৪; বনী ইসরাঈল, ৭; আল আম্বিয়া, ৭০–৭৫; আন নামৃল, ১৮–৫৬ টীকাসমূহে এবং সাবা, ১২–১৪ আয়াতসমূহে।

৩৩. মূলে বলা হয়েছে اَلصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ এর অর্থ হচ্ছে এমনসব ঘোড়া, যেগুলো দাঁড়িয়ে থাকার সময় অত্যন্ত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, লাফালাফি দাপাদাপি করে না এবং যখন দৌড়ায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড়ায়।

৩৪. মূলে خَيْر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবীতে এ শব্দটির ব্যবহার হয় বিপুল সম্পদ অর্থে এবং ঘোড়ার জন্য পরোক্ষ অর্থেও এর ব্যবহার হয়। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যেহেতু ঐ ঘোড়াগুলোকে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য রেখেছিলেন তাই তিনি "খাইর" শব্দের মাধ্যমে তাদেরকে চিহ্নিত করেছেন।

৩৫. এ আয়াতগুলোর অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের মধ্যে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে।

একটি দল এগুলোর অর্থ বর্ণনা করে বলেন ঃ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ঘোড়া দেখাশুনা ও তাদের দৌড় প্রতিযোগিতায় এতবেশী মশগুল হয়ে পড়েছিলেন যার ফলে আসরের নামাযের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। অথবা কারো কারো কথা মতে নিজের কোন বিশেষ ওযীফা পড়তে ভুলে গিয়েছিলেন। এ ওযীফাটি তিনি পাঠ করতেন আসর ও মাগরিবের নামাযের মাঝামাঝি সময়। কিন্তু সেদিন সূর্য ডুবে গিয়েছিল অথচ তিনি নামায পড়তে বা ওযীফা পাঠ করতে পারেননি। ফলে তিনি হুকুম দিলেন ঃ ঘোড়াগুলো ফিরিয়ে আনো। আর সেগুলো ফিরে আসার পর হযরত সুলাইমান (আ) তরবারির আঘাতে সেগুলোকে হত্যা করতে বা অন্য কথায় আল্লাহর জন্য কুরবানী করতে লাগলেন। কারণ, সেগুলো তাঁকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছিল। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে এ আয়াতগুলোর অনুবাদ এভাবে করা হয়েছে ঃ "তখন সে বললো, আমি এ সম্পদের প্রতি আসক্তি এত বেশী পছন্দ করেছি যার ফলে আমার রবের স্মরণ (আসরের নামায বা বিশেষ ওযীফা) থেকে গাফেল হয়ে গেছি, এমনকি (সূর্য পশ্চিমাকাশের অন্তরালে) লুকিয়ে পড়েছে। (তখন সে হুকুম দিল) ফিরিয়ে আনো ঐ (ঘোড়া) গুলোকে। (আর যখন সেগুলো ফিরে এলো) তখন তাদের পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে (তরবারির) হাত চালিয়ে দিল।" এ ব্যাখ্যাটি কোন কোন খ্যাতিমান তাফসীরকারের দেয়া হলেও এটি অগ্রাধিকার

পাওয়ার যোগ্য নয়। কারণ, এখানে তাফসীরকারকে নিজের পক্ষ থেকে তিনটি কথা বাড়াতে হয়, যেগুলোর কোন উৎস ও ভিত্তি নেই। প্রথমত তিনি ধরে নেন, হযরত সুলাইমানের আসরের নামায বা এ সময় তিনি যে একটি বিশেষ ওযীফা পড়তেন তেমন কোন ওযীফা এ কাজে মশগুল থাকার কারণে ছুটে গিয়েছিল। অথচ কুরআনের শব্দাবলী হচ্ছে কেবলমাত্র ঃ

إِنِّىٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّى

এ শব্দগুলোর অনুবাদ তো এভাবেও করা যেতে পারে যে, "আমি এ সম্পদ এতবেশী পছন্দ করে ফেলেছি, যার ফলে আমার রবের স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পড়েছি।" কিন্তু এর মধ্যে আসরের নামায বা কোন বিশেষ ওযীফার অর্থ গ্রহণ করার কোন প্রসংগ বা পূর্বসূত্র নেই। দ্বিতীয়ত তারা এটাও ধরে নেন যে, সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। অথচ সেখানে সূর্যের কোন কথা বলা হয়নি। বরং حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ শব্দাবলী পড়ার পর মানুষের চিন্তা স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসে পেছনের আয়াতে উল্লেখিত الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ এর দিকে। তৃতীয়ত এটাও ধরে নেন যে, হযরত সুলাইমান ঘোড়াগুলোর পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে খালি হাত বুলাননি বরং তলোয়ারসহ হাত বুলান। অথচ কুরআনে مَسْحًا بِالسَّيْفِ শব্দ বলা হয়নি এবং এখানে এমন কোন প্রসংগ বা পূর্বসূত্রও নেই যার ভিত্তিতে হাত বুলানোকে তরবারিসহ হাত বুলানো অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। কুরআনের ব্যাখ্যা করার এ পদ্ধতির সাথে আমি নীতিগতভাবে ভিন্নমত পোষণ করি। আমার মতে কুরআনের শব্দাবলীর বাইরে অন্য অর্থ গ্রহণ করা কেবলমাত্র চারটি অবস্থায়ই সঠিক হতে পারে। এক, কুরআনের বাক্যের মধ্যেই তার জন্য কোন পূর্বসূত্র বা প্রসংগ থাকবে। দুই, কুরআনের অন্য কোন জায়গায় তার প্রতি কোন ইংগিত থাকবে। তিন, কোন সহীহ হাদীসে এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। অথবা চার, তার অন্য কোন নির্ভরযোগ্য উৎস থাকবে। যেমন ইতিহাসের বিষয় হলে ইতিহাসে এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যেতে হবে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের বিষয় হলে নির্ভরযোগ্য তাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে হবে। আর শরীয়াতের বিধানের বিষয় হলো ইসলামী ফিক্‌হের উৎস এর ব্যাখ্যা পেশ করবে। যেখানে এর মধ্য থেকে কোন একটি বিষয়ও থাকবে না সেখানে নিছক নিজস্বভাবে একটি কিস্‌সা রচনা করে কুরআনের ইবারতের অন্তরভুক্ত করে দেয়া আমার মতে সঠিক নয়।

একটি দল উপরোক্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সামান্য বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেন, رُدُّوهَا عَلَىَّ এবং حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ উভয়ের মধ্যে যে সর্বনাম রয়েছে সেটি হচ্ছে সূর্য। অর্থাৎ যখন আসরের নামায ছুটে গেলো এবং সূর্য অস্তমিত হলো তখন হযরত সুলাইমান (আ) বিশ্ব–জাহান পরিচালনায় নিযুক্ত কর্মকর্তাগণকে অর্থাৎ ফেরেশতাগণকে বললেন, সূর্যকে ফিরিয়ে আনো, যাতে আসরের সময় ফিরে আসে এবং আমি নামায পড়তে পারি। এর ফলে সূর্য ফিরে এলো এবং তিনি নামায পড়ে নিলেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি ওপরের ব্যাখ্যাটির চাইতেও আরো বেশী অগ্রহণযোগ্য। এ জন্য নয় যে, আল্লাহ সূর্যকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম নন বরং এ জন্য যে, আল্লাহ আদৌ এর কোন উল্লেখই করেননি। বরং হযরত সুলাইমানের জন্য যদি এত বড় মু'জিযার প্রকাশ ঘটতো তাহলে অবশ্যই তা উল্লেখযোগ্য হওয়া উচিত ছিল। এর আরো একটি কারণ এই যে, সূর্যের অস্তমিত হয়ে

তারপর আবার ফিরে আসা এমন একটি অসাধারণ ঘটনা যে, যদি সত্যিই তা ঘটে থাকতো তাহলে দুনিয়ার ইতিহাসে তা কখনো অনুল্লেখিত থাকতো না। এ ব্যাখ্যার সপক্ষে তাঁরা কতিপয় হাদীস পেশ করেও একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, সূর্যের অস্তমিত হয়ে পুনর্বার ফিরে আসার ঘটনা মাত্র একবার ঘটেনি বরং কয়েকবার এ ঘটনা ঘটেছে। মি'রাজের ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। খন্দকের যুদ্ধের সময়ও নবী করীমের (সা) জন্য তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। আর হযরত আলীর (রা) জন্যও ফিরিয়ে আনা হয় যখন নবী করীম (সা) তাঁর কোলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিলেন এবং তাঁর আসরের নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল। নবী করীম (সা) সূর্যকে ফিরিয়ে আনার দোয়া করেন এবং তা ফিরে আসে। কিন্তু যে ব্যাখ্যার সমর্থনে এ হাদীসগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এগুলো থেকে তার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করা তার চাইতেও দুর্বল। হযরত আলী সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে তার সকল বর্ণনা পরম্পরা ও বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে ইবনে তাইমিয়া একে বনোয়াট ও জাল হাদীস প্রমাণ করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, এর কোন ভিত্তি নেই। ইবনে জওযী বলেন, নিসন্দেহে এটি জাল হাদীস। খন্দকের যুদ্ধের সময় সূর্যকে ফিরিয়ে আনার হাদীসটিও অনেক মুহাদ্দিসের মতে যঈফ এবং অনেকের মতে বানোয়াট। অন্যদিকে মি'রাজের হাদীসের আসল ব্যাপারটি হচ্ছে, যখন নবী করীম (সা) মক্কার কাফেরদের কাছে মি'রাজের রাতের অবস্থা বর্ণনা করছিলেন তখন কাফেররা তাঁর কাছে প্রমাণ চাইলো। তিনি বললেন, বাইতুল মাকদিসের পথে অমুক জায়গায় একটি কাফেলার দেখা পেয়েছিলাম এবং তাদের সাথে অমুক ঘটনা ঘটেছিল। কাফেররা জিজ্ঞেস করলো, সে কাফেলাটি কবে মক্কায় পৌঁছুবে? তিনি জবাব দিলেন, অমুক দিন। যখন সেদিনটি এলো কুরাইশরা সারাদিন কাফেলার অপেক্ষা করতে লাগলো, এমনকি সন্ধ্যা হয়ে গেলো। তখন নবী (সা) দোয়া করলেন যেন সূর্য ততক্ষণ পর্যন্ত অস্তমিত না হয় যতক্ষণ কাফেলা না এসে যায়। কাজেই দেখা গেলো সূর্য ডুবার আগে তারা পৌঁছে গেছে। এ ঘটনাটিকে কোন কোন বর্ণনাকারী এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সেদিন দিনের সময় এক ঘন্টা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এবং এই বাড়তি সময় পর্যন্ত সূর্য দাঁড়িয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের হাদীস এত বড় অস্বাভাবিক ঘটনার প্রমাণের ক্ষেত্রে সাক্ষ হিসেবে যথেষ্ট হতে পারে কি? যেমন আমি আগেই বলে এসেছি, সূর্যের ফিরে আসা বা ঘন্টা খানিক আটকে থাকা কোন সাধারণ ঘটনা নয়। এ ধরনের ঘটনা যদি সত্যিই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকতো তাহলে সারা দুনিয়ায় হৈ চৈ পড়ে যেতো। দু–চারটে খবরে ওয়াহিদের (যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন স্তরে মাত্র একজন) মধ্যে তার আলোচনা কেমন করে সীমাবদ্ধ থাকতো?

মুফাস্সিরগণের তৃতীয় দলটি এ আয়াতগুলোর এমন অর্থ গ্রহণ করেন যা একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি এর শব্দগুলো পড়ে এ থেকে গ্রহণ করতে পারে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঘটনা কেবলমাত্র এতটুকু ঃ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সামনে যখন উন্নত ধরনের ভাল জাতের ঘোড়ার একটি পাল পেশ করা হলো তখন তিনি বললেন, অহংকার বা আত্মম্ভরিতা করার জন্য অথবা শুধুমাত্র আত্মস্বার্থের খাতিরে এ সম্পদ আমার কাছে প্রিয় নয়। বরং এসব জিনিসের প্রতি আমার আকর্ষণকে আমি আমার রবের কালেমা বুলন্দ করার জন্য পছন্দ করে থাকি। তারপর তিনি সে ঘোড়াগুলোর দৌড় করালেন এমনকি

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۝٣٤ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٣٥ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِأَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝٣٦ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ ۝٣٧ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ۝٣٨ هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٣٩ وَإِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝٤٠

আর (দেখো) সুলাইমানকেও আমি পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তার আসনে নিক্ষেপ করেছি একটি শরীর। তারপর সে রুজু করলো এবং বললো, হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করো যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভন হবে না; নিসন্দেহে তুমিই আসল দাতা।[৩৬] *তখন আমি বাতাসকে তার জন্য অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে যেদিকে সে চাইতো মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো।*[৩৭] *আর শয়তানদেরকে বিজিত করে দিয়েছি, সব ধরনের গৃহনির্মাণ কারিগর ও ডুবুরী এবং অন্য যারা ছিল শৃংখলিত।*[৩৮] *(আমি তাকে বললাম) "এ আমার দান, তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে, যাকে চাও তাকে দাও এবং যাকে চাও তাকে দেয়া থেকে বিরত থাকো, কোন হিসেব নেই।"*[৩৯] *অবশ্যই তার জন্য আমার কাছে রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।*[৪০]

সেগুলো দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। এরপর তিনি সেগুলো ফেরত আনালেন। সেগুলো ফেরত আসার পর ইবনে আব্বাসের বক্তব্য অনুযায়ী :

جعل يمسح اعراف الخيل وعرا قيبها حُبًّالها

"তিনি তাদের পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে আদর করে হাত বুলাতে লাগলেন।" আমাদের মতে এ ব্যাখ্যাটিই সঠিক। কারণ কুরআন মজীদের শব্দাবলীর সাথে এটি পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখে এবং অর্থকে পূর্ণতা দান করার জন্য এর মধ্যে এমন কোন কথা বাড়িয়ে বলতে হয় না যা কুরআনে নেই, কোন সহীহ হাদীসে নেই এবং বনী ইসরাঈলের ইতিহাসেও নেই।

এ প্রসংগে একথাটাও সামনে থাকা উচিত যে, আল্লাহ হযরত সুলাইমানের পক্ষে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন : نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ (নিজের রবের দিকে বেশী বেশী ফিরে আসা ব্যক্তিই হচ্ছে সর্বোত্তম বান্দা) এর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করার অব্যবহিত

পরেই করেছেন। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, আসলে একথা বলাই এখানে উদ্দেশ্য ছিল যে, দেখো, সে আমার কত ভাল বান্দা ছিল, বাদশাহীর সাজ সরঞ্জাম তার কাছে পছন্দনীয় ছিল দুনিয়ার খাতিরে নয় বরং আমার জন্য, নিজের পরাক্রান্ত অশ্ববাহিনী দেখে দুনিয়াদার ও বৈষয়িক ভোগ লালসায় মত্ত শাসনকর্তাদের মতো সে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেনি বরং সে সময়ও তার মনোজগতে ভেসে উঠেছে আমারই স্মৃতি।

৩৬. বক্তব্যের ধারাবাহিকতা অনুসারে এখানে একথা বলাই মূল উদ্দেশ্য এবং পেছনের আয়াতগুলো এরই জন্য মুখবন্ধ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন প্রথমে হযরত দাউদের প্রশংসা করা হয়েছে, তারপর যে ঘটনার ফলে তিনি ফিত্‌নার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন সেটি উল্লেখ করা হয়েছে, একথা বলা হয়েছে যে, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজের এত প্রিয় বান্দাকেও জবাবদিহি না করে ছাড়েননি, তারপর তাঁর এ কার্যক্রম দেখান যে, ফিত্‌না সম্পর্কে সজাগ করে দেবার সাথে সাথেই তিনি তাওবা করেন এবং আল্লাহর সামনে মাথা নত করে নিজের ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে ফিরে আসেন, অনুরূপভাবে এখানেও বক্তব্য বিন্যাস এভাবে করা হয়েছে ঃ প্রথমে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের উচ্চ মর্যাদা ও মহিমান্বিত বন্দেগীর কথা বলা হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে, তাঁকেও পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিল, তারপর তাঁর বন্দেগীর এ কৃতিত্ব দেখান যে, যখন তাঁর সিংহাসনে একটি দেহাবয়ব এনে ফেলে দেয়া হয় তখন সংগে সংগেই তিনি নিজের পদস্খলন সম্পর্কে সজাগ হন, নিজের রবের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং যে কথার জন্য তিনি ফিত্‌নার সম্মুখীন হয়েছিলেন নিজের সে কথা ও কার্যক্রম থেকে ফিরে আসেন। অন্যকথায় বলা যায়, এ দু'টি কাহিনী থেকে আল্লাহ একই সংগে দু'টি কথা বুঝাতে চান। এক, তাঁর নিরপেক্ষ সমালোচনা, পর্যালোচনা ও জবাবদিহি থেকে সাধারণ তো দূরের কথা নবীরাও বাঁচতে পারেননি। দুই, অপরাধ করে ঘাড় বেঁকা করে থাকা বান্দার জন্য সঠিক কর্মনীতি নয়। বরং তার কাজ হচ্ছে যখনই সে নিজের ভুল অনুভব করতে পারবে তখনই বিনীতভাবে নিজে রবের সামনে ঝুঁকে পড়বে। এ কর্মনীতিরই ফল স্বরূপ মহান আল্লাহ এ মনীষীদের পদস্খলনগুলো কেবল ক্ষমাই করে দেননি বরং তাঁদের প্রতি আরো বেশী দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন।

এখানে আবার এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যে ফিত্‌নার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেটি কেমন ফিত্‌না ছিল? তাঁর আসনের ওপর একটি দেহাবয়ব এনে ফেলে দেয়ার অর্থ কি? এ দেহাবয়ব এনে তাঁর আসনে ফেলে দেয়া তাঁর জন্য কোন্ ধরনের সতর্কীকরণ ছিল যার ফলে তিনি তাওবা করেন? এর জবাবে মুফাস্‌সিরগণ চারটি ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করেছেন।

একটি দল একটি বিরাট কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এর বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে আবার বহু ধরনের মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাদের সবার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ হযরত সুলাইমানের থেকে এই ত্রুটি সংঘটিত হয়েছিল যে, তাঁর মহলে এক বেগম সাহেবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে বেখবর। অথবা তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত গৃহমধ্যে বসেছিলেন এবং কোন মজলুমের ফরিয়াদ শুনেননি। এর ফলে তিনি যে শাস্তি পেয়েছিলেন তা ছিল এই যে, এক শয়তান যে কোনভাবেই তাঁর এমন একটি আংটি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল যার বদৌলতে তিনি জিন

ও মানুষ জাতি এবং বাতাসের ওপর রাজত্ব করতেন। আংটি হাতছাড়া হয়ে যেতেই হযরত সুলাইমানের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব খতম হয়ে গিয়েছিল এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন। এই অন্তরবর্তীকালে সেই শয়তান সুলাইমানের রূপ ধারণ করে রাজত্ব করতে থাকলো। সুলাইমানের সিংহাসনে একটি দেহাবয়ব এনে ফেলে দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর সিংহাসনে উপবেশনকারী এই শয়তান। কেউ কেউ একথাও বলে ফেলেছেন যে, সে সময় এই শয়তানের হাত থেকে সুলাইমানের হারেমের মহিলাদের সতীত্বও সংরক্ষিত থাকেনি। শেষ পর্যন্ত দরবারের আমাত্যবর্গ, পারিষদ ও উলামায়ে কেরামের মনে তার কার্যকলাপ দেখে সন্দেহের সৃষ্টি হলো এবং তারা মনে করতে থাকলেন, এ ব্যক্তি সুলাইমান নয়। কাজেই তারা তার সামনে তাওরাত খুলে মেলে ধরলেন এবং সে ভয়ে পালিয়ে গেলো। পথে তার হাত থেকে আংটি খুলে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে গেলো অথবা সে নিজেই তা সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো। একটি মাছ তা গিলে ফেললো। ঘটনাক্রমে সে মাছটি হযরত সুলাইমানের হস্তগত হলো। মাছটি রান্না করার জন্য তিনি তার পেট কেটে ফেললেন। সেখান থেকে আংটি বের হয়ে পড়লো। আংটি হাতে আসার সাথে সাথেই জিন, মানুষ ইত্যাদি সবাই সালাম করতে করতে তাঁর সামনে হাজির হয়ে গেলো।—এ পুরো কাহিনীটিই ছিল একটি পৌরানিক গালগল্প। নওমুসলিম আহ্‌লি কিতাবগণ তালমুদ ও অন্যান্য ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করে এটি মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, আমাদের বড় বড় পণ্ডিতগণ একে কুরআনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা মনে করে নিজেদের ভাষায় এগুলো বর্ণনা করেছেন। অথচ সুলাইমানের আংটির কোন সত্যতা নেই। হযরত সুলাইমানের কৃতিত্ব কোন আংটির ভেল্কিবাজি ছিল না। শয়তানদেরকেও আল্লাহ নবীদের আকৃতি ধরে আসার ও মানুষকে গোমরাহ করার ক্ষমতা দেননি। তাছাড়া আল্লাহ সম্পর্কে এমন কোন ধারণাও করা যেতে পারে না যে, তিনি কোন নবীর কোন ভুলের শাস্তি এমন ফিত্‌নার আকৃতিতে দান করবেন যার ফলে শয়তান নবী হয়ে একটি উম্মাতের সমগ্র জনগোষ্ঠীর সর্বনাশ করে দেবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, কুরআন নিজেই এ তাফসীরের প্রতিবাদ করছে। সামনের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, হযরত সুলাইমান যখন এ পরীক্ষার সম্মুখীন হন এবং তিনি আমার কাছে ক্ষমা চান তখন আমি বায়ু ও শয়তানদের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেদিলাম। কিন্তু এ তাফসীর এর বিপরীতে একথা বলছে যে, আংটির কারণে শয়তানরা পূর্বেই হযরত সুলাইমানের হুকুমের অনুগত হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, যেসব মনীষী এ তাফসীর বর্ণনা করেছেন তাঁরা পরবর্তী আয়াত কি বলছে তা আর দেখেননি।

দ্বিতীয় দলটি বলেন, ২০ বছর পর হযরত সুলাইমানের একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। শয়তানরা বিপদ গণে। তারা মনে করে যদি হযরত সুলাইমানের পর তাঁর এ পুত্র বাদশাহ হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে আবার একই গোলামীর জিঞ্জির বহন করে চলতে হবে। তাই তারা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। হযরত সুলাইমান একথা জানতে পারেন। তিনি পুত্রকে মেঘের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। সেখানেই তার লালন–পালনের ব্যবস্থা করেন। এটিই ছিল সেই ফিত্‌না যার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর ওপর ভরসা করার পরিবর্তে তিনি মেঘের হেফাজতের ওপর ভরসা করেছিলেন। এর শাস্তি

তাঁকে এভাবে দেয়া হয় যে, সে শিশুটি মরে গিয়ে তাঁর সিংহাসনের ওপর এসে পড়ে।—এ কাহিনীটিও আগাগোড়া ভিত্তিহীন ও উদ্ভট এবং স্পষ্ট কুরআন বিরোধী। কারণ এখানেও ধারণা করে নেয়া হয়েছে যে, বায়ু ও শয়তানরা পূর্ব থেকেই হযরত সুলাইমানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অথচ কুরআন পরিষ্কার ভাষায় তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হবার ব্যাপারটিকে এ ফিত্‌নার পরবর্তীকালের ঘটনা বলে উল্লেখ করছে।

তৃতীয় দলটি বলেন, একদিন হযরত সুলাইমান কসম খান, আজ রাতে আমি সত্তরজন স্ত্রীর কাছে যাবো এবং প্রত্যেকের গর্ভে একজন করে আল্লাহর পথের মুজাহিদ জন্ম দেব। কিন্তু একথা বলতে গিয়ে তিনি ইন্‌শাআল্লাহ বলেননি। এর ফলে মাত্র একজন স্ত্রী গর্ভবতী হয় এবং তাঁর গর্ভেও একটি অসমাপ্ত ও অপরিপক্ক শিশুর জন্ম হয়। দাই শিশুটিকে এনে হযরত সুলাইমানের আসনের ওপর ফেলে দেয়। এ হাদীসটি হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রাবীর মাধ্যমে এটি উদ্ধৃত করেছেন। বুখারী শরীফেই এ হাদীসটি যেসব রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতে স্ত্রীদের সংখ্যা বলা হয়েছে ৬০, কোনটিতে ৭০, কোনটিতে ৯০, কোনটিতে ৯৯ আবার কোনটিতে ১০০ও বলা হয়েছে। সনদের দিক দিয়ে এর মধ্য থেকে অধিকাংশই শক্তিশালী এবং রেওয়ায়াত হিসেবে এগুলোর নির্ভুলতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা যেতে পারে না। কিন্তু এ হাদীসের বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির বিরোধী। এর ভাষা বলছে, একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো এভাবে বলেননি যেভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বরং তিনি সম্ভবত ইহুদীদের মিথ্যা ও অপবাদমূলক কিচ্ছা-কাহিনীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কোন পর্যায়ে একে এভাবে উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করে থাকবেন এবং শ্রোতার মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকবে যে, নবী করীম (সা) নিজেই এ ঘটনা বর্ণনা করছেন। এ ধরনের রেওয়ায়াতকে নিছক জোরে লোকদের হজম করাবার চেষ্টা করানো দীনকে হাস্যাস্পদ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই হিসেব কষে দেখতে পারেন, শীতের দীর্ঘতম রাত ও এশা থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত দশ এগারো ঘন্টার বেশী সময় হয় না। যদি স্ত্রীদের সংখ্যা কমপক্ষে ৬০ জন বলে মেনে নেয়া যায়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, সেই রাতে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কোন প্রকার বিশ্রাম না নিয়েই অবিরাম ১০ বা ১১ ঘন্টা ধরে প্রতি ঘন্টায় ৬ জন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে থেকেছেন। কার্যত এটা কি সম্ভব? আর একথাও কি আশা করা যেতে পারে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাস্তব ঘটনা হিসেবে একথাটি বর্ণনা করে থাকবেন? তারপর হাদীসে কোথাও একথা বলা হয়নি যে, কুরআন মজীদে হযরত সুলাইমানের আসনের ওপর যে দেহাবয়বটি ফেলে রাখার কথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এ অপরিণত শিশু। তাই নবী করীম (সা) এ ঘটনাটি এ আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন তা বলা যায় না। তাছাড়া এ সন্তানের জন্মের পর হযরত সুলাইমানের ইস্‌তিগ্‌ফার করার কথা তো বোধগম্য হতে পারে কিন্তু তিনি ইস্‌তিগ্‌ফারের সাথে সাথে "আমাকে এমন রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করো যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভনীয় নয়"—এ দোয়াটি কেন করেছিলেন তা বোধগম্য নয়।

এর আর একটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ইমাম রাযী এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে, হযরত সুলাইমান কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন অথবা কোন

বিপদের কারণে এত বেশী চিন্তান্বিত ছিলেন যার ফলে তিনি শুকাতে শুকাতে হাড্ডিচর্মসার হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি কুরআনের শব্দের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কুরআনের শব্দাবলী হচ্ছে : "আমি সুলাইমানকে পরীক্ষায় ফেলে দিলাম এবং তার আসনের ওপর একটি দেহাবয়ব নিক্ষেপ করলাম তারপর সে ফিরে এলো।" এ শব্দগুলো পড়ে কোন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে না যে, এ দেহাবয়ব বলতে হযরত সুলাইমানকেই বুঝানো হয়েছে। এ থেকে তো পরিষ্কার জানা যায়, এ পরীক্ষার সম্মুখীন করার মূলে হযরত সুলাইমানের কোন ভুলচুক বা পদস্খলন ছিল। এ ভুলচুকের কারণে তাঁকে সতর্ক করে জানিয়ে দেয়া হয় যে, আপনার আসনের ওপর একটি দেহ এনে ফেলে দেয়া হয়েছে। এর ফলে নিজের ভুলচুক বুঝতে পেরে তিনি ফিরে আসেন।

আসলে এটি কুরআন মজীদের জটিলতম স্থানগুলোর মধ্যে একটি। চূড়ান্তভাবে এর ব্যাখ্যা করার মতো কোন নিশ্চিত বুনিয়াদ আমাদের কাছে নেই। কিন্তু হযরত সুলাইমানের দোয়ার এ শব্দাবলী : "হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দিন এবং আমাকে এমন রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করুন যা আমার পরে আর কারোর জন্য শোভনীয় নয়" যদি বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের আলোকে পড়া যায় তাহলে আপাতদৃষ্টে অনুভূত হবে, তাঁর মনে সম্ভবত এ আকাংখা ছিল যে, তাঁর পরে তাঁর ছেলে হবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং শাসন ও রাষ্ট্র কর্তৃত্ব আগামীতে তাঁর পরিবারের মধ্যে অব্যাহত থাকবে। এ জিনিসটিকেই আল্লাহ তাঁর জন্য ফিত্‌না গণ্য করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি এমন সময় সজাগ হয়েছেন যখন তাঁর পুত্র যুবরাজ রাজুবয়াম এমন এক অযোগ্য তরুণ হিসেবে সামনে এসে গিয়েছিল যার আচরণ পরিষ্কার বলে দিচ্ছিল যে, সে দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের সালতানাত চারদিনও টিকিয়ে রাখতে পারবে না। তাঁর আসনে একটি দেহ নিক্ষেপ করার ভাবার্থ সম্ভবত এই হবে যে, যে পুত্রকে তিনি সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন সে ছিল একটি অযোগ্য পুত্র। এ সময় তিনি নিজের আকাংখা পরিহার করেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে এ মর্মে আবেদন জানান যে, এ বাদশাহী যেন আমার পর শেষ হয়ে যায় এবং আমার পরে আমার বংশের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অব্যাহত রাখার আকাংখা আমি প্রত্যাহার করলাম। বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকেও একথাই জানা যায় যে, হযরত সুলাইমান নিজের পরে আর কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য অসিয়াত করে যাননি এবং কারো আনুগত্য করার জন্য লোকদেরকে বাধ্যও করেননি। পরবর্তীকালে তাঁর রাষ্ট্রীয় পারিষদবর্গ রাজুবয়ামকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু সামান্য কিছুদিন যেতে না যেতেই বনী ইসরাঈলের দশটি গোত্র উত্তর ফিলিস্তিনের এলাকাটি নিয়ে আলাদা হয়ে যায় এবং একমাত্র ইয়াহুদা গোত্র বাইতুল মাকদিসের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সাথে সংযুক্ত থাকে।

৩৭. সূরা আল আম্বিয়ার ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, ৭৪ টীকা) তবে এখানে একটি কথা সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে, সূরা আল আম্বিয়ায় যেখানে বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলা হয়েছে সেখানে الريح عاصفة (প্রবল বায়ু) শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে সে একই বাতাস সম্পর্কে বলা হচ্ছে, تَجْرِى بِأَمْرِهٖ رُخَاءً (তার হুকুমে সে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হতো)। এর অর্থ হচ্ছে, সে বাতাস মূলত প্রবল ছিল যেমন বাতাস চালিত জাহাজ চালাবার জন্য প্রবল বায়ুর প্রয়োজন হয়। কিন্তু হযরত সুলাইমানের জন্য

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴿٤١﴾ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

৪ রুকূ'

আর স্মরণ করো আমার বান্দা আইয়ূবের কথা[৪১] যখন সে তার রবকে ডাকলো এই বলে যে, শয়তান আমাকে কঠিন যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।[৪২] (আমি তাকে হুকুম দিলাম) তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো, এ হচ্ছে ঠাণ্ডা পানি গোসল করার জন্য এবং পান করার জন্য।[৪৩] আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার পরিজন এবং সেই সাথে তাদের মতো আরো,[৪৪] নিজের পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুদ্ধি ও চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে।[৪৫]

তাকে এ অর্থে মৃদুমন্দ করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর বাণিজ্য বহর যেদিকে সফর করতে চাইতো সেদিকেই তা প্রবাহিত হতো।

৩৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, ৭৫ টীকা, আন নাম্‌ল ২৩, ২৮, ৪৫, ৪৬ ও ৪৭ টীকা।—শয়তান বলতে জিন বুঝানো হয়েছে। আর শৃংখলিত জিন বলতে এমনসব সেবক জিন বুঝানো হয়েছে যাদেরকে বিভিন্ন দুষ্কর্মের কারণে বন্দী করা হতো। যেসব বেড়ী ও জিঞ্জির দিয়ে এ জিনগুলোকে বাঁধা হতো সেগুলো লোহা নির্মিত হওয়া এবং বন্দীদেরকেও মানুষদের মতো প্রকাশ্যে শৃংখলিত দেখতে পাওয়াও অপরিহার্য ছিল না। মোটকথা তাদেরকে এমন পদ্ধতিতে বন্দী করা হতো যার ফলে তারা পালাবার ও কুকর্ম করার সুযোগ পেতো না।

৩৯. এ আয়াতের তিনটি অর্থ হতে পারে। এক, এটি আমার বেহিসেব দান। তুমি যাকে ইচ্ছা দিতে পারো, যাকে ইচ্ছা নাও দিতে পারো। দুই, এটি আমার দান। যাকে ইচ্ছা দাও এবং যাকে ইচ্ছা না দাও, দেয়া বা না দেয়ার জন্য তোমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। কোন কোন মুফাস্‌সির এর আরো একটি অর্থ করেছেন। সেটি হচ্ছে, এ শয়তানদেরকে পুরোপুরি তোমার অধীনে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এদের মধ্য থেকে যাকে চাও মুক্তি দিয়ে দাও এবং যাকে চাও আটকে রাখো, এ জন্য তোমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না।

৪০. এখানে একথা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেয়া যে, বান্দার অহংকার আল্লাহর কাছে যত বেশী অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় তার দীনতা ও বিনয়ের প্রকাশ তাঁর কাছে তত বেশী প্রিয়। বান্দা যদি অপরাধ করে এবং সতর্ক করার কারণে উল্টো আরো বেশী বাড়াবাড়ি করে, তাহলে এর পরিণাম তাই হয় যা সামনের দিকে আদম ও ইবলিসের কাহিনীতে বর্ণনা করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে বান্দার যদি সামান্য পদস্খলন হয়ে যায়

এবং সে তাওবা করে দীনতা সহকারে তার রবের সা-মনে মাথা নত করে, তাহলে তার প্রতি এমন সব দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হয়, যা ইতিপূর্বে দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের ওপর প্রদর্শিত হয়। হযরত সুলাইমান ইস্‌তিগ্‌ফারের পরে যে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ তাকে অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেন এবং বাস্তবে তাঁকে এমন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করেন যা তাঁর পূর্বে কেউ লাভ করেনি এবং তাঁর পরে আজো পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয়নি। বায়ু নিয়ন্ত্রণ ও জিনদের ওপর কর্তৃত্ব এ দু'টি এমন ধরনের অসাধারণ শক্তি যা মানুষের ইতিহাসে একমাত্র হযরত সুলাইমানকেই দান করা হয়েছে। অন্য কাউকে এর কোন অংশ দেয়া হয়নি।

৪১. এ নিয়ে চতুর্থবার হযরত আইয়ূবের কথা কুরআন মজীদে আলোচিত হয়েছে। এর আগে সূরা নিসার ১৬৩, সূরা আন'আমের ৮৪ ও সূরা আম্বিয়ার ৮৩–৮৪ আয়াতে এ সম্পর্কিত আলোচনা এসেছে। ইতিপূর্বে সূরা আম্বিয়ার ব্যাখ্যায় আমি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, ৭৬–৭৯ টীকা)

৪২. এর অর্থ এ নয় যে, শয়তান আমাকে রোগগ্রস্ত করে দিয়েছে এবং আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, রোগের প্রচণ্ডতা, ধন–সম্পদের বিনাশ এবং আত্মীয়–স্বজনদের মুখ ফিরিয়ে নেবার কারণে আমি যে কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি তার চেয়ে বড় কষ্ট ও যন্ত্রণা আমার জন্য হচ্ছে এই যে, শয়তান তার প্ররোচনার মাধ্যমে আমাকে বিপদগ্রস্ত করছে। এ অবস্থায় সে আমাকে আমার রব থেকে হতাশ করার চেষ্টা করে, আমাকে আমার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ করতে চায় এবং আমি যাতে অধৈর্য হয়ে উঠি সে প্রচেষ্টায় রত থাকে। হযরত আইয়ূবের ফরিয়াদের এ অর্থটি দু'টি কারণে আমাদের কাছে প্রাধান্য লাভের যোগ্য। এক, কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে আল্লাহ শয়তানকে কেবলমাত্র প্ররোচণা দেবার ক্ষমতাই দিয়েছেন। আল্লাহর বন্দেগীকারীদেরকে রোগগ্রস্ত করে এবং তাদেরকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে বন্দেগীর পথ থেকে সরে যেতে বাধ্য করার ক্ষমতা তাদেরকে দেননি। দুই, সূরা আম্বিয়ায় যেখানে হযরত আইয়ূব আল্লাহর কাছে তাঁর রোগের ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করছেন সেখানে তিনি শয়তানের কোন কথা বলেন না। বরং তিনি কেবল বলেন,

اِنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

"আমি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং তুমি পরম করুণাময়।"

৪৩. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে মাটিতে পায়ের আঘাত করতেই একটি পানির ঝরণা প্রবাহিত হলো। এর পানি পান করা এবং এ পানিতে গোসল করা ছিল হযরত আইয়ূবের জন্য তাঁর রোগের চিকিৎসা। সম্ভবত হযরত আইয়ূব কোন কঠিন চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাইবেলও একথাই বলে যে, তাঁর সারা শরীর ফোড়ায় ভরে গিয়েছিল।

৪৪. হাদীস থেকে জানা যায়, এ রোগে আক্রান্ত হবার পর হযরত আইয়ূবের স্ত্রী ছাড়া আর সবাই তাঁর সংগ ত্যাগ করেছিল এমন কি সন্তানরাও তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এ দিকে ইংগিত করেই আল্লাহ বলছেন, যখন আমি তার রোগ নিরাময় করলাম, সমস্ত পরিবারবর্গ তাঁর কাছে ফিরে এলো এবং তারপর আমি তাঁকে আরো সন্তান দান করলাম।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

(আর আমি তাকে বললাম) এক আটি ঝাড়ু নাও এবং তা দিয়ে আঘাত করো এবং নিজের কসম ভংগ করো না।[৪৬] আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি, উত্তম বান্দা ছিল সে, নিজের রবের অভিমুখী।[৪৭]

আর আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা স্মরণ করো। তারা ছিল বড়ই কর্মশক্তির অধিকারী ও বিচক্ষণ[৪৮] আমি একটি নির্ভেজাল গুণের ভিত্তিতে তাদেরকে নির্বাচিত করেছিলাম এবং তা ছিল পরলোকের স্মরণ।[৪৯] নিশ্চিতভাবে আমার কাছে তারা বিশিষ্ট সৎলোক হিসেবে গণ্য। আর ইসমাঈল, আল ইয়াসা'[৫০] ও যুল কিফ্ল-এর[৫১] কথা স্মরণ করো। এরা সবাই সৎলোকদের অন্তরভুক্ত ছিল।

৪৫. অর্থাৎ একজন বুদ্ধিমানের জন্য এর মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, ভালো অবস্থায় আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তার বিদ্রোহী হওয়া উচিত নয় এবং খারাপ অবস্থায় তার আল্লাহ থেকে নিরাশ হওয়াও উচিত নয়। তাকদীরের ভালমন্দ সরাসরি এক ও লাশরীক আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন। তিনি চাইলে মানুষের সবচেয়ে ভাল অবস্থাকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতে পারেন আবার চাইলে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় পৌছিয়ে দিতে পারেন। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির সকল অবস্থায় তাঁর ওপর ভরসা এবং তাঁর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর করা উচিত।

৪৬. এ শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযরত আইয়ূব (আ) রুগ্ন অবস্থায় নারাজ হয়ে কাউকে মারার কসম খেয়েছিলেন। (কথিত আছে, স্ত্রীকে মারার কসম খেয়েছিলেন।) আর এ কসম খাওয়ার সময় তিনি একথাও বলেছিলেন যে, তোমাকে এতো ঘা দোর্‌রা মারবো। আল্লাহ যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন এবং যে রোগগ্রস্ত অবস্থায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি এ কসম খেয়েছিলেন সে ক্রোধ স্তিমিত হয়ে গেলো তখন তিনি একথা মনে করে অস্থির হয়ে পড়লেন যে, কসম পুরা করতে গেলে অযথা একজন নিরপরাধকে মারতে হয় এবং কসম ভেঙে ফেললেও গোনাহগার হতে হয়। এ

উভয় সংকট থেকে আল্লাহ তাঁকে উদ্ধার করলেন। আল্লাহ তাঁকে হুকুম দিলেন, একটি ঝাড়ু নাও, তাতে তুমি যে পরিমাণ কোড়া মারার কসম খেয়েছিলে সে পরিমাণ কাঠি থাকবে এবং সে ঝাড়ু দিয়ে কথিত অপরাধীকে একবার আঘাত করো এর ফলে তোমার কসমও পুরা হয়ে যাবে এবং সেও অযথা কষ্টভোগ করবে না।

কোন কোন ফকীহ এ রেওয়ায়াতটিকে একমাত্র হযরত আইয়ূবের জন্য নির্ধারিত মনে করেন। আবার কতিপয় ফকীহের মতে অন্য লোকেরাও এ সুবিধাদান থেকে লাভবান হতে পারে। প্রথম অভিমতটি উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আসাকির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এবং আবু বকর জাস্‌সাস মুজাহিদ থেকে। ইমাম মালেকেরও অভিমত এটিই। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেঈ দ্বিতীয় অভিমতটি অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার খাদেমকে দশ ঘা কোড়া মারার কসম খেয়ে বসে এবং পরে দশটি কোড়া মিলিয়ে তাকে এমনভাবে কেবলমাত্র একটি আঘাত করে যার ফলে কোড়াগুলোর প্রত্যেকটির কিছু অংশ তার গায়ে ছুঁয়ে যায় তাহলে তার কসম পুরো হয়ে যাবে।

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশী রোগগ্রস্ত বা দুর্বল হবার কারণে যে যিনাকারী একশো দোর্‌রার আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা রাখতো না তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার ব্যাপারে এ আয়াতে বিবৃত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস হযরত সাঈদ ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনী সা'য়েদে এক ব্যক্তি যিনা করে। সে এমন রুগ্ন ছিল যে, তাকে অস্থি–চর্মসার বলা যেতো। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিলেন ঃ

خذوا عثقالا فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة

"খেজুরের একটি ডাল নাও, যার একশোটি শাখা রয়েছে এবং তা দিয়ে একবার এ ব্যক্তিকে আঘাত করো।" (আহকামুল কুরআন)

মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তাবারানী, আবদুর রাজ্জাক ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহেও এর সমর্থক কতিপয় হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলোর মাধ্যমে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগী ও দুর্বলের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। তবে ফকীহগণ এ ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করেছেন যে, প্রত্যেকটি শাখা বা পাতার কিছু না কিছু অংশ অপরাধীর গায়ে অবশ্যই লাগা উচিত এবং একটি আঘাতই যথেষ্ট হলেও অপরাধীকে তা যেন কোন না কোন পর্যায়ে আহত করে। অর্থাৎ কেবল স্পর্শ করা যথেষ্ট নয় বরং আঘাত অবশ্যই করতে হবে।

এখানে এ প্রশ্নও দেখা দেয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে এবং পরে জানা যায় যে, সে বিষয়টি অসংগত, তাহলে তার কি করা উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, এ অবস্থায় মানুষের পক্ষে যা ভালো, তাই করা উচিত এবং এটিই তার কাফ্‌ফারা। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, এ অসংগত কাজের পরিবর্তে মানুষের ভাল কাজ করা এবং নিজের

কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দেয়া উচিত। এ আয়াতটি এ দ্বিতীয় হাদীসটিকে সমর্থন করে। কারণ একটি অসংগত কাজ না করাই যদি কসমের কাফ্ফারা হতো তাহলে আল্লাহ হযরত আইয়ূবকে একথা বলতেন না যে, তুমি একটি ঝাড়ু দিয়ে আঘাত করে নিজের কসম পুরা করে নাও। বরং বলতেন, তুমি এমন অসংগত কাজ করো না এবং এটা না করাই তোমার কসমের কাফ্ফারা। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নূর, ২০ টীকা)

এ আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেলে সংগে সংগেই তা পুরা করা অপরিহার্য হয় না। হযরত আইয়ূব রোগগ্রস্ত অবস্থায় কসম খেয়েছিলেন এবং তা পূর্ণ করেন পুরোপুরি সুস্থ হবার পর এবং সুস্থ হবার পরও তাও সংগে সংগেই পুরা করেননি।

কেউ কেউ এ আয়াতকে শরয়ী বাহানাবাজীর সপক্ষে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। সন্দেহ নেই, হযরত আইয়ূবকে যা করতে বলা হয়েছিল তা একটি বাহানা ও ফন্দিই ছিল। কিন্তু তা কোন ফরয থেকে বাঁচার জন্য করতে বলা হয়নি বরং বলা হয়েছিল একটি খারাপ কাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কাজেই শরীয়াতে একমাত্র এমন বাহানা ও ফন্দি জায়েয যা মানুষের নিজের সত্তা থেকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি থেকে জুলুম, গোনাহ ও অসৎ প্রবণতা দূর করার জন্য করা হয়ে থাকে। নয়তো হারামকে হালাল বা ফরয বাতিল অথবা সৎকাজ থেকে রেহাই পাবার জন্য বাহানাবাজি করা বা ফন্দি আঁটা গোনাহর উপরি গোনাহ। বরং এর সূত্র গিয়ে কুফরীর সাথে মেলে। কারণ এসব অপবিত্র উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি বাহানা করে সে যেন অন্য কথায় আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়। যেমন যে ব্যক্তি যাকাত দেয়া থেকে রেহাই পাবার জন্য বছর শেষ হবার আগে নিজের সম্পদ অন্য কারো কাছে স্থানান্তর করে সে নিছক একটি ফরয থেকেই পলায়ন করে না বরং সে একথাও মনে করে যে, আল্লাহ তার এ প্রকাশ্য কাজ দেখে প্রতারিত হবে এবং তাকে ফরযের আওতাভুক্ত মনে করবে না। এ ধরনের 'হীলা' বা বাহানার বিষয়সমূহ যেসব ফকীহ তাদের কিতাবের অন্তরভুক্ত করেছেন, শরীয়াতের বিধান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার জন্য এসব বাহানাবাজীর আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয় বরং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি গোনাহকে আইনের রূপ দান করে গা বাঁচিয়ে বের হয়ে আসে, তাহলে কাযী বা শাসক তাকে পাকড়াও করতে পারেন না। তার শাস্তির ভার আল্লাহর হাতে সোপর্দ হয়ে যায়।

৪৭. এ প্রেক্ষাপটে একথা বলার জন্য হযরত আইয়ূবের কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নেক বান্দারা যখন বিপদের ও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হন তখন তাঁরা তাঁদের রবের কাছে অভিযোগ করেন না বরং ধৈর্য সহকারে তাঁর চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে মেনে নেন এবং তাতে উত্তীর্ণ হবার জন্য তাঁর কাছেই সাহায্য চান। কিছুকাল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পর যদি বিপদ অপসারিত না হয় তাহলে তাঁর থেকে নিরাশ হয়ে অন্যদের দরবারে হাত পাতবেন, এমন পদ্ধতি তাঁরা অবলম্বন করেন না। বরং তারা ভাল করেই জানেন, যা কিছু পাওয়ার আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। তাই বিপদের ধারা যতই দীর্ঘ হোক না কেন তারা তাঁরই করুণাপ্রার্থী হন। এ জন্য তারা এমন দান ও করুণা লাভে ধন্য হন যার দৃষ্টান্ত হযরত আইয়ূবের জীবনে পাওয়া যায়। এমনকি যদি তারা কখনো

অস্থির হয়ে কোন প্রকার নৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়েন তাহলেও আল্লাহ তাদেরকে দুষ্কৃতিমুক্ত করার জন্য একটি পথ বের করে দেন যেমন হযরত আইয়ূবের জন্য বের করে দিয়েছিলেন।

৪৮. মূলে বলা হয়েছে ঃ أُولِى الْأَيْدِىْ وَالْأَبْصَارِ (হস্তধারী ও দৃষ্টিধারীগণ) ইতিপূর্বে যেমন আমরা বলেছি, হাত মানে শক্তি ও সামর্থ। আর এ নবীগণকে শক্তি ও সামর্থের অধিকারী বলার অর্থ হচ্ছে, তাঁরা অত্যন্ত সক্রিয় ও কর্মশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর আনুগত্যকারী ও গোনাহ থেকে সংরক্ষিত থাকার প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী ছিলেন। দুনিয়ায় আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য তাঁরা বিরাট প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। দৃষ্টি অর্থ চোখের দৃষ্টি নয় বরং অন্তরদৃষ্টি। তাঁরা সত্যদর্শী ও সূক্ষ্ম সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। দুনিয়ায় তাঁরা চোখ বন্ধ করে চলতেন না। বরং চোখ খুলে জ্ঞান ও তাত্বিক পর্যবেক্ষণের পূর্ণ আলোকে সঠিক সোজা পথ দেখে চলতেন। এ শব্দগুলোর মধ্যে এ দিকে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে যে, দুষ্কৃতিকারী ও পথভ্রষ্টরা আসলে হাত ও চোখ উভয়টি থেকে বঞ্চিত। আসলে যারা আল্লাহর পথে কাজ করে তারাই হস্তধারী এবং যারা সত্যের আলো ও মিথ্যার অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য করে তারাই দৃষ্টির অধিকারী।

৪৯. অর্থাৎ তাঁদের যাবতীয় সাফল্যের মূল কারণ ছিল এই যে, তাঁদের মধ্যে বৈষয়িক স্বার্থলাভের আকাংখা ও বৈষয়িক স্বার্থপূজার সামান্যতম গন্ধও ছিল না। তাঁদের সমস্ত চিন্তা ও প্রচেষ্টা ছিল আখেরাতের জন্য। তাঁরা নিজেরাও আখেরাতের কথা স্মরণ করতেন এবং অন্যদেরকেও স্মরণ করিয়ে দিতেন। তাই আল্লাহ তাঁদেরকে দু'টি মর্যাদা দান করেছেন। বৈষয়িক স্বার্থ চিন্তায় ব্যাপৃত লোকদের ভাগ্যে কখনো এটা ঘটেনি। এ প্রসংগে এ সূক্ষ্ম বিষয়টিও দৃষ্টি সমক্ষে থাকা উচিত যে, এখানে আল্লাহ আখেরাতের জন্য কেবলমাত্র "আদদার" (সেই ঘর বা আসল ঘর) শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে এখানে এ সত্যটি বুঝানোই উদ্দেশ্য যে, এ দুনিয়া আদতে মানুষের ঘর নয় বরং এটি নিছক একটি অতিক্রম করার জায়গা এবং একটি মুসাফিরখানা মাত্র। এখান থেকে মানুষকে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে। আসল ঘর হচ্ছে সেই আখেরাতের ঘর। যে ব্যক্তি তাকে সুসজ্জিত করার চিন্তা করে সে-ই দূরদৃষ্টির অধিকারী এবং আল্লাহর কাছে তাকে অবশ্যই পছন্দনীয় মানুষ হওয়া উচিত। অন্যদিকে যে ব্যক্তি এ মুসাফিরখানায় নিজের সামান্য কয়েক দিনের অবস্থানস্থলকে সুসজ্জিত করার জন্য এমনসব কাজ করে যার ফলে আখেরাতের আসল ঘর তার জন্য বিরাণ হয়ে যায়, তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করতে পারেন না।

৫০. কুরআন মজীদে মাত্র দু' জায়গায় তাঁর কথা বলা হয়েছে। সূরা আল আন'আমের ৮৬ আয়াতে এবং এ জায়গায়। উভয় জায়গায় কোন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। বরং কেবলমাত্র নবীদের কথা বর্ণনা প্রসংগে তাঁর নাম নেয়া হয়েছে। তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয় নবীদের একজন। জর্দান নদীর উপকূলে আবেল মেহুলা (Abel Meholah) এর অধিবাসী ছিলেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাঁকে ইলীশার (Elisha) নামে স্মরণ করে। হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম যে সময় সিনাই উপদ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন কয়েকটি বিশেষ কাজে তাঁকে সিরিয়ায় ও ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে একটি কাজ ছিল হযরত আল ইয়াসা'কে তার স্থলাভিষিক্ত

هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾

এছিল একটি স্মরণ। (এখন শোনো) মুত্তাকীদের জন্য নিশ্চিতভাবেই রয়েছে উত্তম আবাস—চিরন্তন জান্নাত, যার দরোজাগুলো খোলা থাকবে তাদের জন্য।[৫২] সেখানে তারা বসে থাকবে হেলান দিয়ে, বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের ফরমাশ করতে থাকবে এবং তাদের কাছে থাকবে লজ্জাবতী কম বয়সী স্ত্রীরা।[৫৩] এসব এমন জিনিস যেগুলো হিসেবের দিন দেবার জন্য তোমাদের কাছে অংগীকার করা হচ্ছে। এ হচ্ছে আমার রিযিক, যা কখনো শেষ হবে না।

করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। এ হুকুম অনুযায়ী হযরত ইলিয়াস তাঁর জনবসতিতে গিয়ে পৌঁছুলেন। তিনি দেখলেন, বারো জোড়া গরু সামনে নিয়ে হযরত আল ইয়াসা' জমিতে চাষ দিচ্ছেন এবং তিনি নিজে বারোতম জোড়ার সাথে আছেন। হযরত ইলিয়াস তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর ওপর নিজের চাদর নিক্ষেপ করলেন এবং তিনি তৎক্ষণাত ক্ষেতখামার ছেড়ে দিয়ে তাঁর সাথে চলে এলেন। (রাজাবলি ১৯ ঃ ১৫–২১) প্রায় দশ বারো বছর তিনি তাঁর প্রশিক্ষণের অধীনে থাকলেন। তারপর আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নেবার পর তিনি হযরত ইলিয়াসের স্থলে নিযুক্তি লাভ করলেন। (২–রাজাবলি ঃ ২) বাইবেলের ২–রাজাবলি পুস্তকের ২ থেকে ১৩ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তা থেকে জানা যায়, উত্তর ফিলিস্তিনের ইসরাঈলী সালতানাত যখন শিরক ও মূর্তি পূজা এবং নৈতিক অপবিত্রতায় ডুবে যেতে থাকলো তখন শেষ পর্যন্ত তিনি নিমশির পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র যেহুকে রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন। এ রাজ পরিবারের মাধ্যমেই ইসরাঈলে এসব দুষ্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। যেহু কেবল বা'আলপূজাই বন্ধ করলো না বরং এ দুষ্কৃতকারী পরিবারের প্রত্যেককে হত্যা করলো, একটি শিশুকেও জীবিত ছাড়লো না। কিন্তু ইসরাঈলের শিরায় উপশিরায় যে দুষ্কৃতি অনুপ্রবেশ করেছিল এ সংস্কার বিপ্লব তাকে পুরোপুরি নির্মূল করতে পারলো না। হযরত আল ইয়াসা'আর মৃত্যুর পর তা ঝড়ের বেগে অগ্রসর হলো। এমনকি এরপর সামোরিয়দের ওপর আসিরীয়রা একের পর এক হামলা শুরু করে দিল। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, ৭ এবং সাফ্ফাত, ৭০–৭১ টীকা)

৫১. হযরত যুল কিফ্ল–এর উল্লেখও কুরআনে দু' জায়গায়ই এসেছে। সূরা আল আম্বিয়ায় এবং এখানে। এ সম্পর্কে আমার অনুসন্ধানলব্ধ আলোচনা আমি সূরা আল আম্বিয়াতেই করে এসেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া, ৮১ টীকা)

هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ
الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾
هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوا
بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا
رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا
لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ
زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

এতো হচ্ছে মুত্তাকীদের পরিণাম আর বিদ্রোহীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম আবাস জাহান্নাম, যেখানে তারা দগ্ধীভূত হবে, সেটি বড়ই খারাপ আবাস। এ হচ্ছে তাদের জন্য, কাজেই তারা স্বাদ আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানির, পুঁজের[৫৪] ও এ ধরনের অন্যান্য তিক্ততার। (নিজেদের অনুসারীদের জাহান্নামের দিকে আসতে দেখে তারা পরস্পর বলাবলি করবে ঃ) "এ একটি বাহিনী তোমাদের কাছে ঢুকে চলে আসছে, এদের জন্য কোন স্বাগত সম্ভাষণ নেই, এরা আগুনে ঝলসিত হবে।" তারা তাদেরকে জবাব দেবে, "না, বরং তোমরাই ঝলসিত হচ্ছো, কোন অভিনন্দন নেই তোমাদের জন্য, তোমরাই তো আমাদের পূর্বে এ পরিণাম এনেছো, কেমন নিকৃষ্ট এ আবাস!" তারপর তারা বলবে, "হে আমাদের রব! যে ব্যক্তি আমাদের এ পরিণতিতে পৌঁছুবার ব্যবস্থা করেছে তাকে দোজখে দ্বিগুণ শাস্তি দাও।" আর তারা পরস্পর বলাবলি করবে, কি ব্যাপার, আমরা তাদেরকে কোথাও দেখছি না, যাদেরকে আমরা দুনিয়ায় খারাপ মনে করতাম?[৫৫] আমরা কি অযথা তাদেরকে বিদ্রূপের পাত্র বানিয়ে নিয়েছিলাম অথবা তারা কোথাও দৃষ্টি অগোচরে আছে?" অবশ্যই একথা সত্য, দোজখবাসীদের মধ্যে এসব বিবাদ হবে।

৫২. মূলে বলা হয়েছে ঃ مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, এসব জান্নাতে তারা দ্বিধাহীনভাবে ও নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করবে এবং কোথাও তাদের কোনপ্রকার বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। দুই, জান্নাতের দরোজা খোলার জন্য তাদের কোন প্রচেষ্টা চালাবার দরকার হবে না বরং শুধুমাত্র তাদের মনে ইচ্ছা জাগার সাথে

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّٰرُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍۭ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِن يُوحَىٰٓ إِلَىَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾

৫ রুকূ'

হে নবী![৫৬] এদেরকে বলো, "আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।[৫৭] আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই। তিনি একক, সবার ওপর আধিপত্যশীল, আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং এ দু'য়ের মধ্যে অবস্থানকারী সমস্ত জিনিসের মালিক, পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।" এদেরকে বলো, "এটি একটি মহাসংবাদ, যা শুনে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও।"[৫৮]

(এদেরকে বলো,) "উর্ধলোকে যখন বিতর্ক হচ্ছিল সে সময়ের কোন জ্ঞান আমার ছিল না। আমাকে তো অহীর মাধ্যমে একথাগুলো এ জন্য জানিয়ে দেয়া হয় যে আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী।"

সাথে সাথেই তা খুলে যাবে। তিন, জান্নাতের ব্যবস্থাপনায় যেসব ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত থাকবে তারা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে দেখতেই তাদের জন্য দরোজা খুলে দেবে। এ তৃতীয় বিষয়বস্তুটি কুরআনের এক জায়গায় বেশী স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ

"এমনকি যখন তারা সেখানে পৌঁছুবে এবং তার দরোজা আগে থেকেই খোলা থাকবে তখন জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা তাদেরকে বলবে, 'সালামুন আলাইকুম, শুভ আগমন', চিরকালের জন্য এর মধ্যে প্রবেশ করুন।" (আয্ যুমার, ৭৩)

৫৩. সমবয়সী স্ত্রী অর্থ এও হতে পারে যে, তারা পরস্পর সমান বয়সের হবে আবার এও হতে পারে যে, তারা নিজেদের স্বামীদের সমান বয়সের হবে।

৫৪. মূলে غَسَّاق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আভিধানিকরা এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এর একটি অর্থ হচ্ছে, শরীর থেকে বের হয়ে আসা রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি জাতীয় নোংরা তরল পদার্থ এবং চোখের পানিও এর অন্তরভুক্ত। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, অত্যন্ত ও চরম

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾

যখন তোমার রব ফেরেশ্‌তাদেরকে বললো,[৫৯] "আমি মাটি দিয়ে একটি মানুষ তৈরি করবো।[৬০] তারপর যখন আমি তাকে পুরোপুরি তৈরি করে ফেলবো এবং তার মধ্যে নিজের প্রাণ ফুঁকে দেবো[৬১] তখন তোমরা তার সামনে সিজদানত হয়ে যেয়ো।"[৬২] এ হুকুম অনুযায়ী ফেরেশ্‌তারা সবাই সিজদানত হয়ে গেলো, কিন্তু ইবলিস নিজে শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করলো এবং সে কাফেরদের অন্তরভুক্ত হয়ে গেলো।[৬৩]

ঠাণ্ডা জিনিস। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, চরম দুর্গন্ধযুক্ত পচা জিনিস। কিন্তু প্রথম অর্থেই এ শব্দটির সাধারণ ব্যবহার হয়, যদিও বাকি দু'টি অর্থও আভিধানিক দিক দিয়ে নির্ভুল।

৫৫. এখানে এমন মু'মিনদের কথা বলা হয়েছে, যাদেরকে এ কাফেররা দুনিয়ায় খারাপ ভাবতো। এর অর্থ হচ্ছে, তারা অবাক হয়ে চারদিকে দেখতে থাকবে। ভাবতে থাকবে, এ জাহান্নামে তো আমরা ও আমাদের নেতারা সবাই আছি কিন্তু দুনিয়ায় আমরা যাদের দুর্নাম গাইতাম এবং আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতের কথা বলার কারণে আমাদের মজলিসে যাদেরকে বিদ্রূপ করা হতো তাদের নাম নিশানাও তো এখানে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

৫৬. শুরুতে যে বিষয়বস্তুর ওপর ভাষণ শুরু হয়েছিল এখন বক্তব্য আবার সেদিকে মোড় নিচ্ছে। এ অংশটি পড়ার সময় প্রথম রুকূ'র সাথে তুলনামূলক অধ্যয়নও করতে থাকুন। এভাবে বক্তব্য পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

৫৭. ৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছিল, এদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারীর উত্থান ঘটায় এরা বড়ই বিস্ময় প্রকাশ করছে। এখানে বলা হচ্ছে, এদেরকে বলো, আমার কাজ হচ্ছে কেবলমাত্র তোমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। অর্থাৎ আমি কোন ফৌজদার বা সেনাধ্যক্ষ নই যে, জবরদস্তি তোমাদেরকে ভুল পথ থেকে সরিয়ে সঠিক পথে টেনে আনবো। আমি বুঝাবার ফলে যদি তোমরা না বুঝো তাহলে নিজেদেরই ক্ষতি করবে। বেখবর থাকাটাই যদি তোমাদের কাছে পছন্দনীয় হয়ে থাকে তাহলে নিজেদের গাফিলতির মধ্যে ডুবে থাকো। এভাবে নিজেদের পরিণাম তোমরা নিজেরাই ভোগ করবে।

৫৮. ৫ নম্বর আয়াতে কাফেরদের যে কথা বলা হয়েছে এটি তার জবাব। সেখানে বলা হয়েছে : "এ ব্যক্তি কি সমস্ত খোদার পরিবর্তে একজন খোদা বানিয়েছে? এ তো বড়ই

অদ্ভুত কথা।" এর জবাবে বলা হচ্ছে, তোমরা যতই নাক সিটকাওনা কেন, অবশ্যই এটি একটি সত্য, এর সংবাদ আমি তোমাদের দিচ্ছি এবং তোমাদের নাক সিটকাবার ফলে এ সত্য বদলে যেতে পারে না।

এ জবাবে কেবলমাত্র সত্যের বর্ণনাই নেই বরং তার সত্য হবার প্রমাণও এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। মুশরিকরা বলতো, অনেক উপাস্যের মধ্যে আল্লাহও একজন। তোমরা সমস্ত উপাস্যদেরকে খতম করে দিয়ে একজনকে মাত্র উপাস্য করে নিলে কেমন করে? এর জবাবে বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত উপাস্য ও মাবুদ। কারণ তিনি সবার ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী, আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং বিশ্ব–জাহানের সমস্ত জিনিস তাঁর মালিকানাধীন। তাঁকে বাদ দিয়ে এ বিশ্ব–জাহানে যেসব সত্তাকে তোমরা মাবুদ বানিয়ে রেখেছো তাদের মধ্যে কোন একটি সত্তাও এমন নেই, যে তাঁর অধীন ও গোলাম নয়। এসব কর্তৃত্বাধীন ও গোলাম সত্তা সেই সর্বময় কর্তৃত্বকারী ও প্রাধান্যবিস্তারকারী সত্তার কর্তৃত্বে শরীক হতে পারে কেমন করে? কোন্ অধিকারে এদেরকে মাবুদ ও উপাস্য গণ্য করা যেতে পারে?

৫৯. ওপরের আয়াতে যে বিরোধের দিকে ইংগিত করা হয়েছে এ হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ। এ বিরোধ বলতে আল্লাহর সাথে শয়তানের বিরোধ বুঝানো হয়েছে যেমন সামনের আলোচনা থেকে প্রকাশ হচ্ছে। এ প্রসংগে একথা মনে রাখতে হবে যে, "উর্ধজগত" বলতে ফেরেশ্‌তাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং আল্লাহর সাথে শয়তানের কথাবার্তা সামনাসামনি হয়নি বরং কোন মধ্যবর্তী ফেরেশ্‌তার মাধ্যমেই হয়েছে। কাজেই কারো এ ভুল ধারণা হওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহও উর্ধজগতের অন্তরভুক্ত ছিলেন। এখানে যে কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে, তা ইতিপূর্বে নিম্নোক্ত স্থানসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে : তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ৩৫–৫৩; আল আ'রাফ, ১০–১৫; আল হিজর, ১৭–১৯; বনী ইসরাঈল, ৭১–৮২; আল কাহ্‌ফ, ৪৬–৪৮ এবং ত্বা–হা, ৯২–১০৬ টীকাসমূহ।

৬০. মূল শব্দ হচ্ছে بشر (বাশারা)। এর আভিধানিক অর্থ "স্থুলদেহ", যার বাইরের অংশ কোন জিনিসে আবৃত নয়। মানুষ সৃষ্টির পর এ শব্দটি বরাবর মানুষের জন্যই ব্যবহৃত হতে থেকেছে। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির আগে তার জন্যে 'বাশার' শব্দ ব্যবহার করা এবং তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, "আমি মাটির একটি পুতুল বানাতে চাই। তার ডানা ও পালক থাকবে না। অর্থাৎ তার ত্বক অন্যান্য প্রাণীর মতো উল, পশম, লোম ও পালকে ঢাকা থাকবে না।"

৬১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল হিজর, ১৭–১৯ এবং আস সিজদাহ, ১৬ টীকা।

৬২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ৪৫ এবং আল আ'রাফ, ১০ টীকা।

৬৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ৪৭ এবং আল কাহ্‌ফ, ৪৮ টীকা।

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾

রব বললেন, "হে ইবলিস! আমি আমার দু'হাত দিয়ে যাকে তৈরি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে?[৬৪] তুমি কি বড়াই করছো, না তুমি কিছু উচ্চ মর্যাদার অধিকারী?" সে জবাব দিল, "আমি তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আগুন থেকে এবং তাকে মাটি থেকে।" বললেন, "ঠিক আছে, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও,[৬৫] তুমি বিতাড়িত[৬৬] এবং প্রতিদান দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি আমার লানত।"[৬৭] সে বললো, "হে আমার রব! একথাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এদেরকে যখন পুনরায় উঠানো হবে সে সময় পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।" বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলো যার সময় আমি জানি।"

৬৪. মানুষ সৃষ্টির মর্যাদা প্রমাণ করার জন্য এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। বাদশাহ তাঁর চাকর বাকরদের দিয়ে কোন কাজ করালে তাতে সেটি যে একটি মামুলি ও সাধারণ পর্যায়ের কাজ ছিল তা প্রমাণ হয়ে যায়। অন্যদিকে বাদশাহ যদি নিজেই এবং নিজ হাতে কোন কাজ করেন তাহলে তা প্রমাণ করে যে, সেটি একটি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ কাজ ছিল। কাজেই আল্লাহর উক্তির অর্থ হচ্ছে এই যে, যাকে আমি নিজে কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তৈরি করেছি তার সামনে নত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে?

"দু'হাত" শব্দের মাধ্যমে সম্ভবত এ দিকে ইংগিত করাই উদ্দেশ্য যে, এ নতুন সৃষ্টিটির মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টি কুশলতার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক পাওয়া যায়। এক, তাকে প্রাণীর দেহাবয়ব দান করা হয়েছে। এর ফলে সে প্রাণীকূলের একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে। দুই, তার মধ্যে এমন প্রাণ সঞ্চার করে দেয়া হয়েছে যার ফলে সে তার নিজের যাবতীয় গুণাবলীর ক্ষেত্রে পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেছে।

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٨٢ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝٨٣ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ۝٨٤ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٨٥ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝٨٦ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝٨٧ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝٨٨

সে বললো, "তোমার ইজ্জতের কসম, আমি এদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবোই, তবে একমাত্র যাদেরকে তুমি একনিষ্ঠ করে নিয়েছো তাদেরকে ছাড়া।"[৬৮] বললেন, "তাহলে এটিই সত্য এবং আমি সত্যই বলে থাকি যে, আমি তোমাকে[৬৯] এবং এসব লোকদের মধ্য থেকে যারা তোমার আনুগত্য করবে তাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেবো।"[৭০]

(হে নবী!) এদেরকে বলো, আমি এ প্রচার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইছি না[৭১] এবং আমি বানোয়াট লোকদের একজনও নই।[৭২] এ তো একটি উপদেশ সমস্ত পৃথিবীবাসীর জন্য এবং সামান্য সময় অতিবাহিত হবার পরই এ সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে।[৭৩]

৬৫. অর্থাৎ সেখান থেকে যেখানে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, যেখানে আদমের সামনে ফেরেশ্‌তাদের সিজদা করার হুকুম দেয়া হয়েছিল এবং যেখানে ইবলিস মহান আল্লাহর নাফরমানি করেছিল।

৬৬. মূলে "রাজীম" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে "নিক্ষিপ্ত" বা "যাকে মারা হয়েছে।" অন্যদিকে প্রচলিত বাগধারা অনুযায়ী এ শব্দটি এমন ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে যাকে মর্যাদার আসন থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে এবং লাঞ্ছিত ও হেয় করে রাখা হয়েছে। সূরা আ'রাফে এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বলা হয়েছে ঃ

فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ

"কাজেই তুই বের হয়ে যা, তুই লাঞ্ছিত সত্তাদের একজন।"

৬৭. এর অর্থ এ নয় যে, শেষ বিচারের দিনের পরে তার ওপর আর লানত পড়বে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তো সে এ নাফরমানির কারণে অভিসম্পাত পেতে থাকবে এবং শেষ বিচারের পরে সে আদমের সৃষ্টি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত অপকর্ম করেছে তার শাস্তি ভোগ করবে।

৬৮. এর অর্থ এ নয় যে, "আমি তোমার নির্বাচিত বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো না।" বরং এর অর্থ হচ্ছে, "তোমার নির্বাচিত বান্দাদের ওপর আমার জারিজুরি খাটবে না।"

৬৯. "তোমাকে দিয়ে" শব্দের মাধ্যমে কেবলমাত্র ব্যক্তি ইবলিসকেই সম্বোধন করা হয়নি বরং সমগ্র জিন জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ ইবলিস ও তার সমগ্র শয়তান দল যারা তার সাথে মিলে মানুষ জাতিকে গোমরাহ করার কাজে লিপ্ত থাকবে।

৭০. এ পুরো কাহিনীটি শুনানো হয় কুরাইশ সরদারদের একটি কথার জবাবে। তারা বলে :

أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

"আমাদের মধ্যে কি এ একজনই লোক রয়ে গিয়েছিল যার ওপর যিক্‌র নাযিল করা হয়েছে?"

৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে যা বলা হয়েছে তাই ছিল এর জবাব। সেখানে বলা হয়েছে, "তোমরা কি আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারের মালিক, তোমরা কি আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ এবং কাকে আল্লাহর নবী করা হবে ও কাকে করা হবে না এ ফায়সালা করা কি তোমাদের কাজ?" দ্বিতীয় জবাব এবং এর মধ্যে কুরাইশ সরদারদেরকে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলায় তোমাদের হিংসা ও শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার, আদম আলাইহিস সালামের মোকাবিলায় ইবলিসের হিংসা ও অহংকারের সাথে মিলে যায়। ইবলিসও আল্লাহ যাকে চান তাকে খলিফা বা প্রতিনিধি করবেন তাঁর এ অধিকার মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। সে আদমের সামনে মাথা নত করার হুকুম মানেনি এবং তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার হুকুম মানছো না। তার সাথে তোমাদের এ সামঞ্জস্য কেবলমাত্র এখানেই শেষ হয়ে যাবে না বরং তোমাদের পরিণামও আবার তাই হবে যা তার জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে অর্থাৎ দুনিয়ায় আল্লাহর লানত এবং আখেরাতে জাহান্নামের আগুন।

এ সংগে এ কাহিনীর আওতায় আরো দু'টি কথাও বুঝানো হয়েছে। এক, এ দুনিয়ায় যে মানুষই আল্লাহর নাফরমানি করছে সে আসলে তার সে চিরন্তন শত্রুর ফাঁদে আটকে যাচ্ছে, যে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানব জাতিকে ফুসলিয়ে কুপথে পরিচালনা করার স্থির সিদ্ধান্ত করে রেখেছে। দুই, যে ব্যক্তি অহংকারের কারণে আল্লাহর নাফরমানি করে এবং তারপর নিজের এ নাফরমানি করার নীতির ওপর জিদ ধরে থাকে, আল্লাহর দৃষ্টিতে সে চরম ঘৃণিত। আল্লাহর কাছে এ ধরনের মানুষের কোন ক্ষমা নেই।

৭১. অর্থাৎ আমি একজন নিস্বার্থ ব্যক্তি। নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে আমি এসব কথা প্রচার করছি না।

৭২. অর্থাৎ আমি তাদের অন্তরভুক্ত নই যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যা দাবী নিয়ে ওঠে এবং তারপর প্রকৃতপক্ষে তারা যা নয় তাই হয়ে বসে। একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে শুধুমাত্র মক্কার কাফেরদেরকে জানিয়ে দেবার জন্য বলা হয়নি বরং কাফেরদের মাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের যে চল্লিশটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল এর পেছনে তার সবটাই সাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান

রয়েছে। মক্কার আবালবৃদ্ধবনিতা একথা জানতো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বানোয়াট নবী নন। সমগ্র জাতির মধ্যে কোন এক ব্যক্তিও কখনো তাঁর মুখ থেকে এমন কোন কথা শোনেনি যা থেকে এ সন্দেহ করার অবকাশ হয় যে, তিনি কিছু একটা হতে চান এবং তিনি নিজেকে গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করছেন।

৭৩. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা কয়েক বছরের মধ্যে স্বচক্ষে দেখে নেবে আমি যা বলছি তা সঠিক প্রমাণিত হবেই। আর যারা মরে যাবে তারা মৃত্যুর দুয়ার অতিক্রম করার পরপরই জানতে পারবে, আমি যাকিছু বলছি তা–ই প্রকৃত সত্য।

আয যুমার

৩৯

নামকরণ

আয়াত নম্বর ৭১ ও ৭৩ (وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا) এবং (وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا) থেকে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ এটি সে সূরা যার মধ্যে 'যুমার' শব্দের উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরা যে হাবশায় হিজরত করার পূর্বে নাযিল হয়েছিল, সে ব্যাপারে ১০ নম্বর আয়াত وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ থেকে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। কোন কোন রেওয়ায়াতে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব ও তার সংগী সাথীগণ হাবশায় হিজরতের সংকল্প করলে তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল (রূহুল মায়ানী, ২৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২২৬)।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

হাবশায় হিজরতের কিছু পূর্বে মক্কার পরিবেশ ছিল জুলুম–নির্যাতন এবং শত্রুতা ও বিরোধিতায় ভরা। ঠিক এ পরিবেশে এ গোটা সূরাটিকে একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতারূপে পেশ করা হয়েছে। এটা একটা নসীহত। এতে মাঝে মধ্যে ঈমানদারদের সম্বোধন করা হলেও বেশীরভাগ কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সম্বোধন করা হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, মানুষ যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করে এবং তার আল্লাহপ্রীতিকে অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্য দ্বারা কলুষিত না করে। এ মৌলিক নীতিকে বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে অত্যন্ত জোরালো পন্থায় তাওহীদের সত্যতা এবং তা মেনে চলার উত্তম ফলাফল আর শিরকের ভ্রান্তি ও তা আঁকড়ে ধরে থাকার মন্দ ফলাফল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া মানুষকে ভ্রান্ত আচরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে আসার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। এ প্রসংগে ঈমানদারদেরকে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, যদি আল্লাহর দাসত্বের জন্য একটি জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাঁর এ পৃথিবী অনেক প্রশস্ত। নিজের দীনকে রক্ষা করার জন্য অন্য কোথাও চলে যাও। আল্লাহ তোমাদের ধৈর্যের পুরস্কার দান করবেন। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের জুলুম–নির্যাতন একদিন না একদিন তোমাদেরকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, এমন দুরাশা কাফেরদের মন থেকে দূর করে দাও এবং পরিষ্কারভাবে বলে দাও যে, আমার পথ রোধ করার জন্য তোমরা যা কিছু করতে চাও করো, আমি আমার কাজ চালিয়েই যেতে থাকবো।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝

এ কিতাব মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।[১]

[হে মুহাম্মাদ (সা)] আমি তোমার কাছে হকসহ এ কিতাব নাযিল করেছি।[২] *তাই তুমি একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহর ইবাদাত করো।*[৩]

১. এটা এ সূরার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। এতে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কথা নয় যা অস্বীকারকারীরা বলছে। বরং এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী। তিনি নিজে এ বাণী নাযিল করেছেন। এর সাথে আল্লাহর দু'টি গুণ উল্লেখ করে শ্রোতাদেরকে দু'টি মহাসত্য সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে যাতে তারা এ বাণীকে মামুলি জিনিস মনে না করে, বরং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে। বর্ণিত গুণের একটি হচ্ছে, যে আল্লাহ এ বাণী নাযিল করেছেন তিনি "আযীয" অর্থাৎ এমন মহা পরাক্রমশালী যে কোন শক্তিই তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তাবলী কার্যকরী হওয়া ঠেকাতে পারে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে এমন কোন শক্তিও নেই। আরেকটি গুণ হচ্ছে, তিনি 'হাকীম' অর্থাৎ এ কিতাবে তিনি যে হিদায়াত দিচ্ছেন তা আগাগোড়া বিজ্ঞোচিত। কেবল কোন অজ্ঞ ও মূর্খই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আস সাজদা, টীকা, ১)

২. অর্থাৎ তার মধ্যে যা আছে তা ন্যায় ও সত্য, বাতিলের কোন সংমিশ্রণ তার মধ্যে নেই।

৩. এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত। এর মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এ আয়াতটি পড়ার সময় অমনোযোগী হওয়া উচিত নয়। বরং এর অর্থ ও প্রতিপাদ্য বিষয়টি ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করা উচিত। এর মৌলিক বিষয় দু'টি। এ দু'টি বিষয় বুঝে নেয়া ছাড়া আয়াতটির অর্থ অনুধাবন সম্ভব নয়। একটি বিষয় হচ্ছে, এখানে আল্লাহর ইবাদাত করতে বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, সে ইবাদাত হবে এমন যা আনুগত্যকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে করা হয়।

ইবাদাত শব্দের শব্দমূল বা ধাতু হচ্ছে عبد । এ শব্দটি আরবী ভাষায় 'স্বাধীন' শব্দের বিপরীত শব্দ হিসেবে 'দাস' বা 'ক্রীতদাস' বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে 'ইবাদাত' শব্দের মধ্যে দু'টি অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। একটি অর্থ হচ্ছে পূজা-অর্চনা। আরবী ভাষার বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য অভিধান 'লিসানুল আরবে' আছে عبد الله অর্থাৎ تاله له ، والتعبد ، التنسك । আরেকটি অর্থ হচ্ছে সবিনয় আনুগত্য এবং সন্তুষ্টি ও সাগ্রহ আদেশ পালন। যেমন "লিসানুল আরবে" বলা হয়েছে : الطاعة-العبادة ।

ومعنى العبادة فى اللغة الطاعة مع الخضوع - وكل من دان لملك فهو عابد له (وقومهما لنا عابدون) والعابد ، الخاضع لربه المستسلم المنقاد لامره - عبد الطاغوت ، اطاعه يعنى الشيطان فيما سول له واغواه - اياك نعبد ، اى نطيع الطاعة التى يخضع معها - اعبدوا ربكم ، اطيعوا ربكم -

সুতরাং অভিধানের এসব নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা অনুসারে আল্লাহর ইবাদাত করা অর্থ শুধু তাঁর পূজা-অর্চনার দাবী করাই নয়, বরং বিনা বাক্যে তাঁর আদেশ নিষেধ পালন, তাঁর শরয়ী আইন-কানুন সন্তুষ্ট চিত্তে সাগ্রহে মেনে চলা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মনেপ্রাণে অনুসরণ করার দাবীও বুঝায়।

আরবী ভাষায় دين (দীন) শব্দ কতিপয় অর্থ ধারণ করে :

একটি অর্থ হচ্ছে, আধিপত্য ও ক্ষমতা, মালিকানা ও প্রভুত্বমূলক মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও সার্বভৌম ক্ষমতা এবং অন্যদের ওপর সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা। তাই "লিসানুল আরবে" আছে :

دان الناس ، اى قهرهم على الطاعة - دنتهم ، اى قهرتهم - دنته ، سسته وملكته - وفى الحديث الكيس من دان نفسه ، اى اذلها واستعبدها - الديان ، القاضى ، الحكم ، القهار ، ولا انت ديانى ، اى لست بقاهرلى فتسوس امرى - ما كان ليأخذ اخاه فى دين الملك ، اى فى تضاء الملك -

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আনুগত্য, আদেশ পালন ও দাসত্ব। লিসানুল আরব অভিধানে আছে :

الدين ، الطاعة - دنته ودنت له ، اى اطعته - والدين لله ، انما هو طاعته والتعبد له - فى الحديث اريد من قريش كلمة تدين لهم

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ⊙

সাবধান! একনিষ্ঠ ইবাদাত কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য।[৪] যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে (আর নিজেদের এ কাজের কারণ হিসেবে বলে যে,) আমরা তো তাদের ইবাদাত করি শুধু এই কারণে যে, সে আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে।[৫] আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তাদের মধ্যকার সেসব বিষয়ের ফায়সালা করে দেবেন যা নিয়ে তারা মতভেদ করছিলো।[৬] আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করেন না, যে মিথ্যাবাদী ও হক অস্বীকারকারী।[৭]

بها العرب ، اى تطيعهم وتخضع لهم – ثم دانت بعد الرباب ، اى ذلت له و اطاعته – يمرقون من الدين ، اى انهم يخرجون من طاعة الامام المفترض الطاعة ، المدين ، العبد – فلولا ان كنتم غير مدينين ، اى غير مملوكين –

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে অভ্যাস ও পন্থা–পদ্ধতি—মানুষ যা অনুসরণ করে। লিসানুল আরবে আছে,

الدين ، العادة والشأن – يقال ما زال ذلك ديني وديدني ، اى عادتي

এ তিনটি অর্থের প্রতি খেয়াল রাখলে এ আয়াতে 'দীন' শব্দটি এমন কর্মপদ্ধতি ও আচরণকে বুঝায় যা মানুষ কারো শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার এবং কারো আনুগত্য গ্রহণ করার মাধ্যমে অবলম্বন করে। আর "দীন"কে শুধু আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে তাঁর দাসত্ব করার অর্থ হলো "আল্লাহর দাসত্বের সাথে মানুষ আর কাউকে শামিল করবে না বরং শুধু তাঁরই পূজা করবে, তাঁরই অনুসরণ এবং তারই হুকুম আহকাম ও আদেশ পালন করবে।"

৪. এটা একটা বাস্তবসম্মত ও সত্য ব্যাপার। ওপরে বর্ণিত দাবীর সপক্ষে প্রমাণস্বরূপ এটা পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমার উচিত দীনকে কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে তাঁর বন্দেগী ও দাসত্ব করা। কারণ নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহর অধিকার। অন্য কথায় বন্দেগী ও দাসত্ব পাওয়ার মত অন্য কেউ আদতেই নেই। সুতরাং আল্লাহর সাথে তার পূজা–অর্চনা করা এবং তার হুকুম–আহকাম ও আইন–কানুনের আনুগত্য করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো একনিষ্ঠ ও অবিমিশ্র

দাসত্ব করে তাহলে সে ভ্রান্ত কাজ করে। অনুরূপভাবে সে যদি আল্লাহর দাসত্বের সাথে সাথে অন্য কারো দাসত্বের সংমিশ্রণ ঘটায় তাহলে সেটাও সরাসরি ন্যায় ও সত্যের পরিপন্থী। ইবনে মারদুইয়া কর্তৃক ইয়াযীদ আর রাকাশী থেকে উদ্ধৃত হাদীসটিই এ আয়াতের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমরা নাম ডাক সৃষ্টি করার জন্য আমাদের অর্থ-সম্পদ দেই। এতে কি আমরা কোন পুরস্কার পাব? নবী (সা) বললেন : না। সে জিজ্ঞেস করলো : আমাদের নিয়ত যদি আল্লাহর পুরস্কার এবং দুনিয়ার সুনাম অর্জন দু'টিই থাকে? তিনি বললেন :

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَنْ أَخْلَصَ لَهُ

"কোন আমল যতক্ষণ না আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে হবে ততক্ষণ তিনি তা গ্রহণ করেন না।" এরপর নবী (সা) এ আয়াত পাঠ করলেন।

৫. মক্কার কাফেররা বলতো, আর সাধারণত দুনিয়ার সব মুশরিকও একথাই বলে থাকে যে, আমরা স্রষ্টা মনে করে অন্যসব সত্তার ইবাদাত করি না। আমরা তো আল্লাহকেই প্রকৃত স্রষ্টা বলে মানি এবং সত্যিকার উপাস্য তাকেই মনে করি। যেহেতু তাঁর দরবার অনেক উঁচু। আমরা সেখানে কি করে পৌঁছতে পারি? তাই এসব বোযর্গ সত্তাদেরকে আমরা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি যাতে তারা আমাদের প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদন আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দেন।

৬. একথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, কেবল তাওহীদের ব্যাপারেই ঐকমত্য হওয়া সম্ভব। শিরকের ব্যাপারে কোন প্রকার ঐকমত্য হতে পারে না। কোন্ কোন্ সত্তা আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যম সে ব্যাপারে দুনিয়ার মুশরিকরা কখনো একমত হতে পারেনি। কারো কাছে কোন দেবতা বা দেবীরা এর মাধ্যম। কিন্তু তাদের মধ্যেও সব দেবতা ও দেবী সম্পর্কে ঐকমত্য নেই। কারো কাছে চাঁদ, সূর্য, মঙ্গল ও বৃহস্পতি এর মাধ্যম। কিন্তু তাদের মধ্যে কার কি মর্যাদা এবং কে আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যম সে ব্যাপারে তারাও পরস্পর একমত নয়। কারো মতে মৃত মহাপুরুষগণ এর মাধ্যম। কিন্তু এদের মধ্যেও অসংখ্য ভিন্নমত বিদ্যমান। কেউ একজন মহাপুরুষকে মানলে আরেকজন অপর একজনকে মানছে। এর কারণ হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন এসব মহাপুরুষ সম্পর্কে তাদের এই ধারণা কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে এমন কোন তালিকাও আসেনি যাতে বলা হয়েছে, অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত। সুতরাং আমাকে পেতে হলে তাদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করো। এটা বরং এমন এক আকীদা—যা কেবল কুসংস্কার ও অন্ধভক্তি এবং পুরনো দিনের লোকদেরকে অযৌক্তিক এবং অন্ধ অনুসরণের কারণে মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। তাই ক্ষেত্রে মতের বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী।

৭. আল্লাহ এখানে সেসব লোকের জন্য দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন। একটি كَاذِبٌ (মিথ্যাবাদী) এবং অপরটি كَفَّارٌ (অস্বীকারকারী)। তাদেরকে كَاذِبٌ বলা হয়েছে এ জন্য যে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যা এ আকীদা বানিয়ে নিয়েছে এবং অন্যদের মধ্যে এ মিথ্যাই প্রচার করছে। আর 'কাফ্ফার' শব্দের দু'টি অর্থ। একটি, ন্যায় ও সত্যের চরম

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ④

আল্লাহ যদি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে চাইতেন তাহলে তাঁর সৃষ্টিকূলের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিতেন।[৮] তিনি এ থেকে পবিত্র (যে, কেউ তাঁর পুত্র হবে)। তিনি আল্লাহ। তিনি একক ও সবার ওপর বিজয়ী।[৯]

অস্বীকারকারী। অর্থাৎ তাওহীদের শিক্ষা সামনে আসার পর এরা এ ভ্রান্ত আকীদা আঁকড়ে ধরে আছে। আরেকটি, নিয়ামতের অস্বীকারকারী। অর্থাৎ এরা নিয়ামত লাভ করছে আল্লাহর কাছ থেকে আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে সেসব সত্তার যাদের সম্পর্কে তারা নিজের থেকেই ধরে নিয়েছে যে, তাদের হস্তক্ষেপের কারণেই তারা এসব নিয়ামত লাভ করছে।

৮. অর্থাৎ আল্লাহর ছেলে হওয়া একেবারেই অসম্ভব। যা সম্ভব তা হচ্ছে, আল্লাহ কাউকে বাছাই করে নিতে পারেন। আর যাকে তিনি বাছাই করবেন সে অবশ্যই সৃষ্টির মধ্যেকার কেউ হবে। কারণ পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি। এ কথাও সবার জানা যে, সৃষ্টি যত সম্মানিতই হোক সে কখনো সন্তানের মর্যাদা পেতে পারে না। কারণ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিরাট মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু সন্তান হওয়াটা পিতা ও সন্তানের মধ্যে মৌলিক ঐক্যের দাবী করে।

সাথে সাথে এ বিষয়টির প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে যে, "আল্লাহ যদি কাউকে ছেলে বানাতে চাইতেন তাহলে এ রকম করতেন" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। একথা থেকে স্বতই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ কখনো এরূপ করতে চাননি। এ বর্ণনা ভঙ্গি দ্বারা একথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, কাউকে বেটা হিসেবে গ্রহণ করা তো দূরের কথা এরূপ করার ইচ্ছাও আল্লাহ কখনো পোষণ করেননি।

৯. এসব যুক্তি প্রমাণ দিয়েই সন্তান হওয়ার আকীদা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

প্রথম প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সব রকমের ত্রুটি, দোষ এবং দুর্বলতা থেকে পবিত্র। একথা সুস্পষ্ট যে, সন্তানের প্রয়োজন হয় অকর্মন্য ও দুর্বলের। যে ব্যক্তি নশ্বর ও ধ্বংসশীল সে-ই সন্তান লাভের মুখাপেক্ষী হয় যাতে তার বংশ ও প্রজন্ম টিকে থাকে। আর কাউকে পালক পুত্রও কেবল সে ব্যক্তিই গ্রহণ করে, যে হয়তো উত্তরাধিকারীহীন হওয়ার কারণে কাউকে উত্তরাধিকারী বানানোর প্রয়োজন অনুভব করে। নয়তো ভালবাসার আবেগে তাড়িত হয়ে কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে। এসব মানবিক দুর্বলতাকে আল্লাহর ওপর আরোপ করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস রচনা করে নেয়া মূর্খতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টি ছাড়া আর কি?

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং একক সত্তার অধিকারী, কোন বস্তু বা দ্রব্যের কিংবা কোন পুরুষের অংশ নন। আর এ বিষয় সুস্পষ্ট যে, সন্তান সমগোত্রীয় হয়ে থাকে। আর দাম্পত্য জীবন ছাড়া সন্তানের কল্পনাই করা যায় না। আর দাম্পত্য সম্পর্কও

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۗ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝

তিনি আসমান ও যমীনকে যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞোচিতভাবে সৃষ্টি করেছেন।[১০] তিনিই দিনের প্রান্তসীমায় রাতকে এবং রাতের প্রান্তসীমায় দিনকে জড়িয়ে দেন। তিনি সূর্য ও চাঁদকে এমনভাবে অনুগত করেছেন যে, প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গতিশীল আছে। জেনে রাখো, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।[১১] তিনি তোমাদের একটি প্রাণী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়াও সৃষ্টি করেছেন।[১২] আর তিনিই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর আটজোড়া নর ও মাদি সৃষ্টি করেছেন।[১৩] তিনি তোমাদেরকে মায়ের গর্ভে তিন তিনটে অন্ধকার পর্দার অভ্যন্তরে একের পর এক আকৃতি দান করে থাকেন।[১৪] এ আল্লাহই (যার এ কাজ) তোমাদের 'রব'[১৫] তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী,[১৬] তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই,[১৭] তা সত্ত্বেও তোমাদেরকে কোন্‌দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে।[১৮]

কেবল সমগোত্রীয়ের সাথেই হতে পারে। সুতরাং একক ও অদ্বিতীয় সত্তা আল্লাহর সন্তান থাকার কথা যে ব্যক্তি বলে সে চরম মূর্খ ও নির্বোধ।

তৃতীয় প্রমাণ হচ্ছে, তিনি قهار বা অপরাজেয় এক মহাশক্তি। অর্থাৎ পৃথিবীতে সব জিনিসই তাঁর অজেয় আধিপত্যের অধীন। এ বিশ্ব–জাহানের কোন কিছুই কোন পর্যায়েই তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তাই কোন জিনিস সম্পর্কেই এ ধারণা করা যেতে পারে না যে, আল্লাহর সাথে তার কোন আত্মীয়তার বন্ধন আছে।

১০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম, টীকা ২৬; আন নাহ্‌ল, টীকা ৬ ; আল আনকাবূত, টীকা ৭৫।

১১. অর্থাৎ এমন মহাপরাক্রমশালী যে, তিনি যদি তোমাদের আযাব দিতে চান তাহলে কোন শক্তিই তা রোধ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু এটা তাঁর মেহেরবানী যে তোমরা এসব

অপরাধ ও অবমাননা করা সত্ত্বেও তখনই তোমাদের পাকড়াও করছেন না, বরং একের পর এক অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এখানে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা এবং অবকাশ দেয়াকে ক্ষমা (দেখেও না দেখা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. একথার অর্থ এ নয় যে, প্রথমে হযরত আদম থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং পরে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে বক্তব্যের মধ্যে সময়ের পরম্পরার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বর্ণনার পরম্পরার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাষায়ই এ ধরনের দৃষ্টান্ত বর্তমান। যেমন ঃ আমরা বলি তুমি আজ যা করেছো তা জানি এবং গতকাল যা করেছো তাও আমার জানা আছে। এ ধরনের বর্ণনার অর্থ এ নয় যে, গতকালের ঘটনা আজকের পরে সংঘটিত হয়েছে।

১৩. গবাদি পশু অর্থ উট, গরু, ভেড়া, বকরী। এ চারটি নর ও চারটি মাদি মিলে মোট আটটি নর ও মাদি হয়।

১৪. তিনটি পর্দা অর্থ পেট, গর্ভথলি এবং ঝিল্লি (সে ঝিল্লি যার মধ্যে বাচ্চা জড়িয়ে থাকে)।

১৫. অর্থাৎ মালিক, শাসক ও পালনকর্তা।

১৬. অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক তিনিই। গোটা বিশ্ব–জাহান তার হুকুমেই চলছে।

১৭. অন্যকথায় এখানে যুক্তি পেশ করা হচ্ছে যে, তিনিই যখন তোমাদের প্রভু এবং সমস্ত রাজত্ব তাঁরই তখন নিশ্চিতভাবে তোমাদের ইলাহও (উপাস্য) তিনিই। অন্য কেউ কি করে ইলাহ হতে পারে যখন প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তার কোন অংশ নেই এবং রাজত্বের ক্ষেত্রেও তার কোন দখল নেই। তোমাদের বিবেক–বুদ্ধির কাছে একথা কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে, যমীন–আসমানের সৃষ্টিকর্তা হবেন আল্লাহ এবং সূর্য ও চন্দ্রকে আনুগত্য গ্রহণকারী আর রাতের পর দিন ও দিনের পর রাত আনয়নকারীও হবেন আল্লাহ। তাছাড়া তোমাদের নিজেদের এবং সমস্ত জীব–জন্তুর স্রষ্টা ও পালনকর্তাও হবেন আল্লাহ অথচ তোমাদের উপাস্য হবে তিনি ছাড়া অন্যরা?

১৮. একথাটি চিন্তা করে দেখার মত। এখানে একথা বলা হয়নি যে, তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছো? বরং বলা হয়েছে এই যে, তোমাদের কোথায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? অর্থাৎ অন্য কেউ তোমাদের বিপথগামী করছে এবং তোমরা তার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সাদামাটা যুক্তিসংগত কথাও বুঝতে পারছো না। এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে দ্বিতীয় যে কথাটি প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে 'তোমরা' বলে সম্বোধন করে যারা ফিরিয়ে নিচ্ছে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি, বরং যারা তাদের প্রভাবে পড়ে ফিরে যাচ্ছিলো তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, কিছুটা চিন্তা–ভাবনা করলে যা সহজেই বোঝা যায়। যারা ফিরিয়ে নিচ্ছিলো তারা সে সমাজে সবার চোখের সামনেই ছিলো এবং সবখানে প্রকাশ্যেই কাজ করছিলো। তাই তাদের নাম নিয়ে বলার প্রয়োজন ছিলো না। তাদের সরাসরি সম্বোধন করাও ছিলো নিরর্থক। কারণ, তারা নিজেদের স্বার্থের জন্যই মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্ব থেকে ফিরতে এবং অন্যদের দাসত্বে শৃঙ্খলিত করতে এবং করিয়ে রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। এটা জানা কথা যে, এ ধরনের লোকদের বুঝালেও

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑦

যদি তোমরা কুফরী করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন।[১৯] কিন্তু তিনি তাঁর বান্দার জন্য কুফরী আচরণ পছন্দ করেন না।[২০] আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন।[২১] আর কেউ–ই অপর কারো গোনাহর বোঝা বহন করবে না।[২২] অবশেষে তোমাদের সবাইকে তোমাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি জানাবেন তোমরা কি করছিলে। তিনি মনের খবর পর্যন্ত জানেন।

তারা তা বুঝতে রাজি ছিল না। কারণ, না বুঝার মধ্যেই তাদের স্বার্থ নিহিত ছিল এবং বুঝার পরও তারা তাদের স্বার্থ ত্যাগ করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তবে জনসাধারণ যারা তাদের প্রতারণা ও চতুরতার ফাঁদে পতিত হচ্ছিলো তারা ছিল করুণার পাত্র। এ কারবারে তাদের কোন স্বার্থ ছিল না। তাই তাদেরকে বুঝালে বুঝতে পারতো এবং চোখ কিছুটা খুলে যাওয়ার পরে তারা এও দেখতে পারতো যে, যারা তাদেরকে আল্লাহর নিকট থেকে সরিয়ে অন্যদের আস্তানার পথ দেখাচ্ছে তারা তাদের এ কারবার থেকে কি স্বার্থ হাসিল করছে। এ কারণেই গোমরাহীতে নিক্ষেপকারী মুষ্টিমেয় লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে গোমরাহীর দিকে অগ্রসরমান জনসাধারণকে সম্বোধন করা হচ্ছে।

১৯. অর্থাৎ তোমাদের কুফরীর কারণে তাঁর প্রভুত্বের সামান্যতম ক্ষতিও হতে পারে না। তোমরা মানলেও তিনি আল্লাহ, না মানলেও তিনি আল্লাহ আছেন এবং থাকবেন। তাঁর নিজের ক্ষমতায়ই তাঁর কর্তৃত্ব চলছে। তোমাদের মানা বা না মানাতে কিছু এসে যায় না। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ বলেন ঃ

يا عبادى لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص من ملكى شيئا –

"হে আমার বান্দারা, যদি তোমরা আগের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার কোন সর্বাধিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তির মত হয়ে যাও তাতেও আমার বাদশাহীর কোন ক্ষতি হবে না।" (মুসলিম)।

২০. অর্থাৎ নিজের কোন স্বার্থের জন্য নয়, বরং বান্দার স্বার্থের জন্য তার কুফরী করা পছন্দ করেন না। কেননা, কুফরী তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর। এখানে একথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এক জিনিস এবং তাঁর সন্তুষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا۟ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ النَّارِ ⑧

মানুষের ওপর যখন কোন বিপদ আসে[২৩] তখন সে তার রবের দিকে ফিরে যায় এবং তাঁকে ডাকে।[২৪] কিন্তু যখন তার রব তাকে নিয়ামত দান করেন তখন সে ইতিপূর্বে যে বিপদে পড়ে তাঁকে ডাকছিলো[২৫] তা ভুলে যায় এবং অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করতে থাকে[২৬] যাতে তারা আল্লাহর পথ থেকে তাকে গোমরাহ করে।[২৭] (হে নবী,) তাকে বলো, তোমার কুফরী দ্বারা অল্প কিছুদিন মজা করে নাও। নিশ্চিতভাবেই তুমি দোযখে যাবে।

আরেকটি জিনিস। পৃথিবীতে আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী কোন কাজ হতে পারে না। কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টির পরিপন্থী কাজ হতে পারে এবং রাত দিন হয়ে আসছে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী ও জালেমদের শাসনকর্তা হওয়া, চোর ও ডাকাতদের অস্তিত্ব থাকা এবং হত্যাকারী ও ব্যভিচারীদের বর্তমান থাকা এ কারণেই সম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রচিত প্রাকৃতিক বিধানে এসব অকল্যাণ ও অপকর্মের অস্তিত্ব লাভের অবকাশ রেখেছেন। তাছাড়া তাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগও তিনিই দেন এবং ঠিক তেমনিভাবে দেন যেমনভাবে সৎকর্মশীলদের সৎকাজ করার সুযোগ দেন। তিনি যদি এসব কাজ করার আদৌ কোন সুযোগ না রাখতেন এবং যারা এসব কাজ করে তাদের আদৌ কোন সুযোগই না দিতেন তাহলে পৃথিবীতে কখনো কোন অকল্যাণ আত্মপ্রকাশ করতো না। এসব কিছুই তাঁর ইচ্ছার ভিত্তিতে হচ্ছে। কিন্তু ইলাহী ইচ্ছার অধীনে কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তার পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টিও রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একথাটিকে এভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন যে, কেউ যদি হারাম পন্থার মাধ্যমে তার রিযিক লাভের চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ তাকে ঐ পন্থায়ই রিযিক দান করেন। এটা তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু তাঁর ইচ্ছার অধীনে চোর, ডাকাত বা ঘুষখোরকে রিযিক দেয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ চুরি, ডাকাতি এবং ঘুষও পছন্দ করেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা একথাটিই বলছেন যে, তোমরা কুফরি করতে চাইলে করো। আমি জোর করে তাতে বাধা দিয়ে তোমাদেরকে মুমিন বানাবো না। তবে তোমরা বান্দা হয়ে স্রষ্টা ও পালনকর্তার সাথে কুফরি করবে তাও আমার পছন্দ নয়। কারণ, তা তোমাদের জন্যই ক্ষতিকর। এতে আমার প্রভুত্বে আদৌ কোন আঁচড় লাগে না।

২১. এখানে 'কুফর' এর বিপরীতে 'ঈমান' শব্দ ব্যবহার না করে 'শোকর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে আপনা থেকেই এ বিষয়ের ইংগিত পাওয়া যায় যে, কুফরী প্রকৃতপক্ষে অকৃতজ্ঞতা ও নেমক হারামির নাম আর ঈমান প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনিবার্য

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ⑨

(এ ব্যক্তির আচরণই সুন্দর না সে ব্যক্তির আচরণ সুন্দর) যে অনুগত, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সিজদা করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের আশা করে? এদের জিজ্ঞেস করো যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি পরস্পর সমান হতে পারে?[২৮] কেবল বিবেক–বুদ্ধির অধিকারীরাই উপদেশ গ্রহণ করে।

দাবী। যে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীর সামান্য অনুভূতিও আছে সে ঈমান ছাড়া অন্য কোন পথ গ্রহণ করতে পারে না। এ কারণে 'শোকর' ও 'ঈমান' এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, যেখানে শোকর থাকবে সেখানে ঈমানও অবশ্যই থাকবে। অপর দিকে যেখানে কুফরী থাকবে সেখানে শোকর বা কৃতজ্ঞতা থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ কুফরীর সাথে "শোকরের" কোন অর্থ হয় না।

২২. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে তার কাজ–কর্মের জন্য দায়ী। কেউ যদি অন্যদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিংবা তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য কুফরী করে তাহলে সে লোকেরা তার কুফরীর বোঝা নিজেদের মাথায় উঠিয়ে নেবে না। বরং তাকেই তার কাজের পরিণাম ভোগ করার জন্য রেখে দেবে। সুতরাং কুফরীর ভ্রান্তি এবং ঈমানের সত্যতা যার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে তার উচিত ভুল আচরণ পরিত্যাগ করে সঠিক আচরণ গ্রহণ করা এবং নিজের বংশ, জ্ঞাতি–গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সাথে থেকে নিজেকে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত না বানানো।

২৩. মানুষ বলতে এখানে সেসব কাফেরদের বুঝানো হয়েছে যারা অকৃতজ্ঞতার আচরণ করে যাচ্ছে।

২৪. অর্থাৎ সুদিনে সে যেসব উপাস্যকে ডাকতো সেই সময় তাদের কথা মনে হয় না। সে তখন তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব–জাহানের পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। সে যে তার মনের গভীরে অন্য উপাস্যদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ারহীন হওয়ার অনুভূতি রাখে এবং আল্লাহই যে প্রকৃত ক্ষমতা–ইখতিয়ারের মালিক এ বাস্তবতাবোধও তার মন–মস্তিষ্কের কোথাও না কোথাও অবদমিত হয়ে পড়ে আছে এটা যেন তারই প্রমাণ।

২৫. অর্থাৎ যে সময় সে অন্যসব উপাস্যদের পরিত্যাগ করে কেবল একক ও লা–শরীক আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করছিলো সে দুঃসময়ের কথা তার মনে থাকে না।

২৬. অর্থাৎ অন্যদের দাসত্ব করতে শুরু করে। তাদেরই আনুগত্য করে। তাদের কাছেই প্রার্থনা করে এবং তাদের সামনেই নযর–নিয়াজ পেশ করতে শুরু করে।

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۭ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۭ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۭ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑩

২ রুকূ'

[হে নবী, (সা)] বলো, হে আমার সেসব বান্দা যারা ঈমান গ্রহণ করেছো, তোমাদের রবকে ভয় করো।[২৯] যারা এ পৃথিবীতে সদাচরণ গ্রহণ করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ।[৩০] আর আল্লাহর পৃথিবী তো অনেক বড়।[৩১] ধৈর্যশীলদেরকে তো অঢেল পুরস্কার দেয়া হবে।[৩২]

২৭. অর্থাৎ নিজে পথভ্রষ্ট হয়েই ক্ষান্ত হয় না। অন্যদেরকেও একথা বলে পথভ্রষ্ট করে যে, আমার ওপর যে বিপদ এসেছিলো তা অমুক হযরতের কিংবা অমুক বুযর্গের বা অমুক দেবী ও দেবতাকে নযরানা পেশ করে দূর হয়েছে। এতে আরো অনেক মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যের ভক্ত ও অনুসারী হয়ে যায় আর প্রত্যেক জাহেল এ ধরনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে জনসাধারণের গোমরাহী বাড়িয়ে তুলতে থাকে।

২৮. প্রকাশ থাকে যে, এখানে দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে। এক শ্রেণীর মানুষ দুঃসময় আসলে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। কিন্তু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে গায়রুল্লাহর বন্দেগী করে। আরেক শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর দাসত্বকে তাদের স্থায়ী নীতি বানিয়ে নিয়েছে। রাতের অন্ধকারে আল্লাহর ইবাদাত করা তাদের একনিষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ। এর মধ্যে প্রথম দলের অন্তরভুক্ত লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা বড় বড় গ্রন্থাগার চষে থাকলেও কিছু এসে যায় না। আর দ্বিতীয় দলের অন্তরভুক্ত লোকদেরকে জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ক্ষেত্রে একেবারে নিরক্ষর হলেও কিছু এসে যায় না। কারণ, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে সত্য সম্পর্কে জ্ঞান ও তদানুযায়ী কাজ। এর ওপরেই মানুষের সাফল্য নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এই দুই শ্রেণীর মানুষ কি করে সমান হতে পারে। কি করে সম্ভব যে, তারা দুনিয়ায় মিলে মিশে একই নিয়ম–পন্থায় চলবে এবং আখেরাতেও একই পরিণামের সম্মুখীন হবে।

২৯. অর্থাৎ শুধু মেনে নেবে তাই নয়, বরং তার সাথে সাথে তাকওয়াও অবলম্বন করো, আল্লাহ যেসব কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন তার ওপর আমল করো, যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকো এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহির কথা মনে রেখে দুনিয়াতে কাজ করো।

৩০. দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির কল্যাণ। তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেরই কল্যাণ সাধিত হবে।

৩১. অর্থাৎ যদি একটি শহর, অঞ্চল বা দেশ আল্লাহর বান্দাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে যেখানে বিপদাপদ নেই সেখানে চলে যাও।

قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِى ﴿١٤﴾ فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٥﴾

(হে নবী,) এদের বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই দাসত্ব করি। আমাকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে যেন আমি সবার আগে মুসলমান হই।[৩৩] *বলো, আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তাহলে আমার একটি ভয়ানক দিনের ভয় আছে। বলে দাও, আমি আনুগত্যসহ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই দাসত্ব করবো। তোমরা তাঁর ছাড়া আর যাদের ইচ্ছা দাসত্ব করতে থাকো। বলো, প্রকৃত দেউলিয়া তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ভাল করে শুনে নাও, এটিই হচ্ছে স্পষ্ট দেউলিয়াপনা।*[৩৪]

৩২. যারা আল্লাহভীরুতা ও নেকীর পথে চলার ক্ষেত্রে সব রকমের দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছে কিন্তু ন্যায়ের পথ থেকে সরেনি তার মধ্যে সেসব লোক অন্তরভুক্ত যারা দীন ও ঈমানের কারণে হিজরত করে দেশান্তরিত হওয়ার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবে এবং সেসব লোকও অন্তরভুক্ত যারা জুলুম-নির্যাতনে ভরা দেশে থেকে সাহসিকতার সাথে সব বিপদের মোকাবিলা করতে থাকবে।

৩৩. অর্থাৎ আমার কাজ শুধু অন্যদের বলা নয়, নিজে করে দেখানোও। আমি যে পথের দিকে মানুষকে আহবান জানাই সর্বপ্রথম আমিই সে পথে চলি।

৩৪. কোন ব্যক্তির কারবারে খাটানো সমস্ত পুঁজি যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং বাজারে তার পাওনাদারের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, নিজের সবকিছু দিয়েও সে দায়মুক্ত হতে পারে না তাহলে এরূপ অবস্থাকেই সাধারণভাবে দেউলিয়াত্ব বলে। এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফের ও মুশরিকদের জন্য এ রূপক ভাষাটিই ব্যবহার করেছেন। মানুষ এ পৃথিবীতে জীবন, আয়ু, জ্ঞান-বুদ্ধি, শরীর, শক্তি, যোগ্যতা, উপায়-উপকরণ এবং সুযোগ-সুবিধা যত জিনিস লাভ করেছে তার সমষ্টি এমন একটি পুঁজি যা সে পার্থিব জীবনের কারবারে খাটায়। কেউ যদি এ পুঁজির সবটাই এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে খাটায় যে, কোন ইলাহ নেই কিংবা অনেক ইলাহ আছে আর সে তাদের বান্দা। তাকে কারো কাছে হিসেব দিতে হবে না, কিংবা হিসেব-নিকেশের সময় অন্য কেউ এসে তাকে রক্ষা করবে, তাহলে

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ۚ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ۞ وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۞ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۞

তাদেরকে মাথার ওপর থেকে এবং নীচে থেকে আগুনের স্তর আচ্ছাদিত করে রাখবে। এ পরিণাম সম্পর্কেই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করেন, হে আমার বান্দারা, আমার গযব থেকে নিজেদের রক্ষা করো। কিন্তু যেসব লোক তাগুতের[৩৫] দাসত্ব বর্জন করেছে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে তাদের জন্য সু-সংবাদ। [হে নবী (সা)] আমার সেসব বান্দাদের সুসংবাদ দিয়ে দাও যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে এবং তার ভাল দিকটি অনুসরণ করে।[৩৬] এরাই সেসব মানুষ যাদের আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন এবং এরাই বুদ্ধিমান।

তার অর্থ হচ্ছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং নিজের সবকিছু খুইয়ে বসলো। এটা হচ্ছে প্রথম ক্ষতি। দ্বিতীয় ক্ষতি হচ্ছে, এ ভ্রান্ত অনুমানের ভিত্তিতে সে যত কাজই করলো সেসব কাজের ক্ষেত্রে সে নিজেকে সহ দুনিয়ার বহু মানুষ, ভবিষ্যৎ বংশধর এবং আল্লাহর আরো বহু সৃষ্টির ওপর জীবনভর জুলুম করলো। তাই তার বিরুদ্ধে অসংখ্য দাবী আসলো। কিন্তু তার কাছে এমন কিছুই নেই যে, সে এসব দাবী পূরণ করতে পারে। তাছাড়া আরো একটি ক্ষতি হচ্ছে, সে নিজেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হলো না, বরং নিজের সন্তান-সন্ততি, প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব ও স্বজাতিকেও তার ভ্রান্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং ভ্রান্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করলো। এ তিনটি ক্ষতির সমষ্টিকে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ক্ষতি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩৫. طاغوت শব্দটি طغيان শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিদ্রোহ। কাউকে طاغى বিদ্রোহী না বলে যদি 'তাগুত' (বিদ্রোহ) বলা হয় তাহলে তার অর্থ হয় চরম মাত্রার বিদ্রোহী। উদাহরণ স্বরূপ কাউকে সুন্দর বলার পরিবর্তে যদি সৌন্দর্য বলা হয় তাহলে তার অর্থ হয় সে যারপর নাই সুন্দর। আল্লাহ ছাড়া অন্য সব উপাস্যদের তাগুত বলার কারণ হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্যদের দাসত্ব করা তো নিছক বিদ্রোহ। কিন্তু যে অন্যদের দিয়ে নিজের দাসত্ব করায় সে চরম পর্যায়ের বিদ্রোহী। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল-বাকারাহ, টীকা, ২৮৬; আন নাহ্ল, টীকা, ৩২)। এখানে طاغوت শব্দটি طواغيت অর্থাৎ বহু সংখ্যক বিদ্রোহী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۖ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

(হে নবী,) যে ব্যক্তিকে আযাব দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে তাকে কে রক্ষা করতে পারে?[৩৭] যে আগুনের মধ্যে পড়ে আছে তাকে কি তুমি রক্ষা করতে পার? তবে যারা তাদের রবকে ভয় করে চলছে তাদের জন্য রয়েছে বহুতল সু উচ্চ বৃহৎ প্রাসাদ যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ কখনো তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। তারপর তাকে পৃথিবীর ওপর স্রোত, ঝর্ণাধারা এবং নদীর আকারে[৩৮] প্রবাহিত করেছেন। অতপর সেই পানি দ্বারা তিনি নানা রংএর শস্য উৎপাদন করেন। পরে সে শস্য পেকে শুকিয়ে যায়। তারপর তোমরা দেখতে পাও যে, তা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। অবশেষে আল্লাহ তা ভূষিতে পরিণত করেন। নিশ্চয়ই জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্নদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে।[৩৯]

তাই أَنْ يَعْبُدُوهَا বলা হয়েছে। যদি একবচন হতো তাহলে ব্যবহৃত শব্দ হতো يَعْبُدُوهُ ।

৩৬. এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, তারা যে কোন কথা শুনলেই তা অনুসরণ করে না। তারা প্রত্যেকের কথা শুনে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং যেটি ন্যায় ও সত্য কথা তা গ্রহণ করে। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তারা কোন কথা শুনে তার ভুল অর্থ করার চেষ্টা করে না বরং তার ভাল অর্থ গ্রহণ করে।

৩৭. অর্থাৎ যে নিজেই নিজেকে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহও তাকে শাস্তি দানের ফায়সালা করেছেন।

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَـٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন[৪০] এবং যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আলোতে চলছে[৪১] সেকি (সে ব্যক্তির মত হতে পারে যে এসব কথা থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেনি?) ধ্বংস সে লোকদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর উপদেশ বাণীতে আরো বেশী কঠোর হয়ে গিয়েছে।[৪২] সে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে।

৩৮. মূল আয়াতে يَنَابِيعَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা এ তিনটি জিনিস বুঝাতেই ব্যবহার করা হয়।

৩৯. অর্থাৎ এ থেকে একজন বুদ্ধিমান মানুষ এ শিক্ষা গ্রহণ করে যে, দুনিয়ার এ জীবন ও এর সব সৌন্দর্য ও চাকচিক্য অস্থায়ী। প্রতিটি বসন্তের পরিণামই শরতের মলিনতা এবং যৌবনের পরিণাম বার্ধক্য ও মৃত্যু। প্রতিটি উত্থানই অবশেষে পতনে পরিণতি লাভ করে। সুতরাং এ পৃথিবী এমন জিনিস নয় যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মানুষ আল্লাহ ও আখেরাতকে ভুলে যেতে পারে এবং এখানকার ক্ষণস্থায়ী বসন্তের মজা উপভোগ করার জন্য এমন আচরণ করবে যা তার পরিণামকে ধ্বংস করবে। তাছাড়া একজন বুদ্ধিমান লোক এসব দৃশ্য দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে যে, এ দুনিয়ার বসন্ত ও শরত আল্লাহর ইখতিয়ারে। তিনি যাকে ইচ্ছা উত্থান ঘটান এবং যাকে ইচ্ছা দুর্দশাগ্রস্ত করেন। আল্লাহ যাকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করছেন তার বেড়ে ওঠা যেমন কেউ রোধ করতে পারে না। তেমনি আল্লাহ যাকে ধ্বংস করতে চান তাকে মাটিতে মিশে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে এমন শক্তিও কারো নেই।

৪০. অর্থাৎ এ সমস্ত বাস্তব ব্যাপার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ এবং ইসলামকে অকাট্য ও নির্ভুল সত্য বলে মেনে নেয়ার যোগ্যতা ও সুযোগ আল্লাহ যাকে দিয়েছেন। কোন ব্যাপারে মানুষের বক্ষ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া মূলত এমন একটি মানসিক অবস্থার নাম, যখন তার মনে উক্ত বিষয় সম্পর্কে কোন দুশ্চিন্তা বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিংবা সন্দেহ-সংশয় থাকে না এবং কোন বিপদের আভাস বা কোন ক্ষতির আশংকাও তাকে ঐ বিষয় গ্রহণ করতে বাধা দিতে পারে না। বরং সে পূর্ণ মানসিক তৃপ্তির সাথে এ সিদ্ধান্ত করে যে, এ জিনিসটি ন্যায় ও সত্য। তাই যাই ঘটুক না কেন আমাকে এর ওপরই চলতে হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন ব্যক্তি যখন ইসলামের পথ অবলম্বন করে তখন আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে যে নির্দেশই আসে তা সে অনিচ্ছায় নয় খুশী ও আগ্রহের সাথে মেনে নেয়। কিতাব ও সুন্নাহ থেকে যে অকাইদ ও ধ্যান-ধারণা এবং যে নীতিমালা ও নিয়ম-কানুন তার সামনে আসে তা সে এমনভাবে গ্রহণ করে যেন সেটাই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। কোন অবৈধ সুবিধা পরিত্যাগ করতে তার কোন অনুশোচনা হয় না। সে মনে করে ঐগুলো তার

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন, এমন একটি গ্রন্থ যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ[৪৩] যার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এসব শুনে সে লোকদের লোম শিউরে ওঠে যারা তাদের রবকে ভয় করে। তারপর তাদের দেহমন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটা হচ্ছে আল্লাহর হিদায়াত। এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে নিয়ে আসেন। আর যাকে আল্লাহ নিজেই হিদায়াত দান করেন না তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই।

জন্য কল্যাণকর কিছু ছিল না। বরং তা ছিল একটি ক্ষতি যা থেকে সে আল্লাহর অনুগ্রহে রক্ষা পেয়েছে। অনুরূপ ন্যায় ও সত্যের ওপর কায়েম থাকার কারণে তার যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে সে সেই জন্য আফসোস করে না, ঠাণ্ডা মাথায় তা বরদাশত করে এবং আল্লাহর পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিবর্তে তার কাছে ঐ ক্ষতি হালকা মনে হয়। বিপদাপদ আসলে তার এ একই অবস্থা হয়। সে মনে করে, আমার দ্বিতীয় কোন পথই নেই— এ বিপদ থেকে বাঁচার জন্য, যে পথ দিয়ে আমি বের হয়ে যেতে পারি। আল্লাহর সরল সোজা পথ একটিই। আমাকে সর্বাবস্থায় ঐ পথেই চলতে হবে। বিপদ আসলে আসুক।

৪১. অর্থাৎ জ্ঞানের আলো হিসেবে সে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত লাভ করেছে যার উজ্জ্বল আলোতে সে জীবনে চলার অসংখ্য ছোট ছোট পথের মধ্যে কোন্‌টি ন্যায় ও সত্যের সোজা রাস্তা তা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পায়।

৪২. "শরহে সদর" (উন্মুক্ত বক্ষ বা খোলা মন) এর বিপরীতে মানুষের মনের দু'টি অবস্থা হতে পারে। একটি হচ্ছে 'দ্বীকে সদর' (বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া, মন সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া) এর অবস্থা। এ অবস্থায় মনের মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রবেশের কিছু না কিছু অবকাশ থাকে। দ্বিতীয়টি 'কাসাওয়াতে ক্বাল্‌ব' (মন কঠিন হয়ে যাওয়া) এর অবস্থা। এ অবস্থায় মনের মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রবেশের কোন সুযোগই থাকে না। দ্বিতীয় অবস্থাটি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ যে ব্যক্তি এ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে তার জন্য সর্বাত্মক ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নেই। এর অর্থ হচ্ছে, মনের সংকীর্ণতার সাথে হলেও কেউ যদি একবার ন্যায় ও সত্যকে কোনভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় তাহলেও তার জন্য রক্ষা পাওয়ার কিছু না কিছু সম্ভাবনা থাকে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি হতে এ দ্বিতীয় বিষয়টি আপনা থেকেই প্রকাশ পায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা সুস্পষ্ট করে বলেননি। কারণ, যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় জেদ ও হঠকারিতা করতে একপায়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছিলো যে, কোনমতেই তাঁর কোন কথা মানবে না, আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে সাবধান করা। তাদেরকে এ মর্মে

أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

তুমি সে ব্যক্তির দুর্দশা কি করে উপলব্ধি করবে যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আযাবের কঠোর আঘাত তার মুখমণ্ডলের ওপর নেবে?[৪৪] এসব জালেমদের বলে দেয়া হবে : এখন সেসব উপার্জনের ফল ভোগ করো যা তোমরা উপার্জন করেছিলে।[৪৫] এদের পূর্বেও বহু লোক এভাবেই অস্বীকার করেছে। শেষ পর্যন্ত এমন এক দিক থেকে তাদের ওপর আযাব আপতিত হয়েছে যা তারা কল্পনাও করতে পারতো না। আল্লাহ দুনিয়ার জীবনেই তাদেরকে লাঞ্ছনার শিকার করেছেন। আখেরাতের আযাব তো তার চেয়েও অধিক কঠোর। হায়! তারা যদি তা জানতো।

সাবধান করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের এ জিদ ও হঠকারিতাকে অত্যন্ত গর্বের বিষয় বলে মনে করে থাকো। কিন্তু আল্লাহর যিকর এবং তাঁর পক্ষ থেকে আসা উপদেশ বাণী শুনে বিনম্র হওয়ার পরিবর্তে কেউ যদি আরো বেশী কঠোর হয়ে যায় তাহলে একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় অযোগ্যতা ও দুর্ভাগ্য আর কিছুই নেই।

৪৩. ঐ সব বাণীর মধ্যে কোন বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা কিতাব একই দাবী, একই আকীদা–বিশ্বাস এবং চিন্তা ও কর্মের একই আদর্শ পেশ করে। এর প্রতিটি অংশ অন্য সব অংশের এবং প্রতিটি বিষয় অন্য সব বিষয়ের সত্যায়ন, সমর্থন এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। অর্থ ও বর্ণনা উভয় দিক দিয়েই এ গ্রন্থের পূর্ণ মিল ও সামঞ্জস্য (Consistency) বিদ্যমান।

৪৪. মানুষ মুখমণ্ডলের ওপর কোন আঘাত তখনই গ্রহণ করে যখন সে পুরোপুরি অক্ষম ও নিরুপায় হয়ে পড়ে। অন্যথায় যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে প্রতিরোধের সামান্যতম শক্তিও থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে শরীরের প্রত্যেকটি অংশে আঘাত সহ্য করতে থাকে কিন্তু মুখের ওপর আঘাত লাগতে দেয় না। তাই এখানে ঐ ব্যক্তির চরম অসহায়ত্বের চিত্র অংকন করা হয়েছে এই বলে যে, সে নিজের মুখের ওপর চরম আঘাত সহ্য করবে।

৪৫. মূল আয়াতে كسب শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন মজীদের পরিভাষায় كسب শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি তার কর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে শাস্তি ও পুরস্কারলাভের যে উপযুক্ততা অর্জন করে তাই। সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের আসল উপার্জন হচ্ছে এই যে, সে তার কাজের ফলশ্রুতিতে আল্লাহর কাছে পুরস্কারের যোগ্য হয়ে যায়। আর গোমরাহী ও

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾
قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ
شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾

এ কুরআনের মধ্যে আমি মানুষের জন্য নানা রকমের উপমা পেশ করেছি যাতে তারা সাবধান হয়ে যায়, আরবী ভাষার কুরআন[৪৬]— যাতে কোন বক্রতা নেই।[৪৭] যাতে তারা মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ একটি উপমা পেশ করছেন। একজন ক্রীতদাসের—যে কতিপয় রূঢ় চরিত্র প্রভুর মালিকানাভুক্ত, যারা সবাই তাকে নিজের দিকে টানে এবং আরেক ব্যক্তির যে পুরোপুরি একই প্রভুর ক্রীতদাস। এদের দু'জনের অবস্থা কি সমান হতে পারে?[৪৮] সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।[৪৯] কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে।[৫০] [হে নবী (সা)] তোমাকেও মরতে হবে এবং এসব লোককেও মরতে হবে।[৫১] অবশেষে তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন তোমাদের রবের সামনে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করবে।

বিপথগামিতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের প্রকৃত উপার্জন হচ্ছে, সে শাস্তি যা সে আখেরাতে লাভ করবে।

৪৬. অর্থাৎ এ কিতাব অন্য কোন ভাষায় নাযিল হয়নি যে, তা বুঝার জন্য মক্কা ও আরবের লোকদের কোন অনুবাদক বা ব্যাখ্যাকারের দরকার হয়। এ কিতাব তাদের নিজের ভাষায় নাযিল হয়েছে। যা তারা নিজেরাই সরাসরি বুঝতে সক্ষম।

৪৭. অর্থাৎ তার মধ্যে কোন বক্রতা বা জটিলতাপূর্ণ কোন কথা নেই যে, তা বুঝা সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন হবে। বরং এর মধ্যে পরিষ্কারভাবে সহজ–সরল কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এখান থেকে জেনে নিতে পারে এ গ্রন্থ কোন্ জিনিসকে ভ্রান্ত বলে এবং কেন বলে? কোন্ জিনিসকে সঠিক বলে এবং কিসের ভিত্তিতে? কি স্বীকার করাতে চায় এবং কোন্ জিনিস অস্বীকার করাতে চায়। কোন্ কোন্ কাজের নির্দেশ দেয় এবং কোন্ কোন্ কাজে বাধা দেয়।

৪৮. এ উপমাতে আল্লাহ তা'আলা শিরক ও তাওহীদের পার্থক্য এবং মানব জীবনের ওপর এ দু'টির প্রভাব এমন পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এতো বড় বিষয়কে এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত কথায় এবং এতটা কার্যকর পন্থায় বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। একথা সবাই

স্বীকার করবে যে, যে ব্যক্তি অনেক মালিক বা মনিবের অধীন এবং তারা প্রত্যেকেই তাকে নিজের দিকে টানে। তারা এমন বদমেজাজী যে, প্রত্যেকে তার সেবা গ্রহণ করতে চায় কিন্তু অন্য মালিকের নির্দেশ পালনের সুযোগ তাকে দেয় না, তাছাড়া তাদের পরস্পর বিরোধী নির্দেশ শুনতে গিয়ে যার নির্দেশই সে পালন করতে অপারগ হয় সে তাকে শুধু ধমক ও বকাঝকা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং শাস্তি দিতেও বদ্ধপরিকর হয়, এমন ব্যক্তির জীবন অনিবার্যরূপেই অত্যন্ত সংকীর্ণতার মধ্যে পতিত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একই মনিবের চাকর সে ব্যক্তি অতীব আরাম ও শান্তিতে জীবন যাপন করবে। তাকে অন্য কারো খেদমত এবং সন্তোষ বিধান করতে হয় না। এটা এমন সহজ সরল কথা যা বুঝার জন্য বড় বেশী চিন্তা–ভাবনা করার প্রয়োজন হয় না। এ উপমা পেশ করার পর কারো জন্য একথা বুঝাও কঠিন নয় যে এক আল্লাহর দাসত্বে মানুষের জন্য যে শান্তি ও নিরাপত্তা আছে বহু সংখ্যক ইলাহর দাসত্ব করে কখনো তা লাভ করা যেতে পারে না।

এখানে একথাও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, পাথরের মূর্তির সাথে বহু সংখ্যক বক্র স্বভাবের এবং পরস্পর কলহপ্রিয় মনিবদের উপমা খাটে না। এ উপমা সেসব জীবন্ত মনিবদের ক্ষেত্রেই খাটে যারা কার্যতই পরস্পর বিরোধী নির্দেশ দান করে এবং বাস্তবেও তাকে নিজের দিকে টানতে থাকে। পাথরের মূর্তি কাকে কবে আদেশ দেয় এবং কাকে কখন নিজের খেদমতের জন্য ডাকে? এ তো জীবন্ত মনিবদের কাজ। মানুষের নিজের প্রবৃত্তির মধ্যে এক মনিব বসে আছে। সে নানা রকমের ইচ্ছা–আকাংখা তার সামনে পেশ করে এবং তা পূরণ করতে বাধ্য করে। আরো অসংখ্য মনিব ও প্রভু আছে। তারা ঘরের মধ্যে, বংশের মধ্যে, জ্ঞাতি–গোষ্ঠির মধ্যে, জাতি ও দেশের সমাজের মধ্যে, ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে, শাসক ও আইন প্রণেতাদের মধ্যে, কায়কারবার ও জীবিকার গণ্ডির মধ্যে এবং পৃথিবীর সভ্যতার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিসমূহের মধ্যে সর্বত্র বিদ্যমান। তাদের পরস্পর বিরোধী আকাংখা ও বিভিন্ন দাবী মানুষকে সবসময় নিজের দিকে টানতে থাকে। সে তাদের যার আকাংখা ও দাবী পূরণ করতে ব্যর্থ হয় সে তাকে নিজের কর্মের গণ্ডির মধ্যে শাস্তি না দিয়ে ছাড়ে না। তবে প্রত্যেকের শাস্তির উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন। কেউ মনে আঘাত দেয়, কেউ অসন্তুষ্ট হয়, কেউ উপহাস করে, কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করে। কেউ নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করে, কেউ ধর্মের ওপর আক্রমণ করে এবং কেউ আইনের আশ্রয় নিয়ে শাস্তি দেয়। মানুষের জন্য এ সংকীর্ণতা থেকে বাঁচার একটিই মাত্র উপায় আছে। আর তা হচ্ছে তাওহীদের পথ গ্রহণ করে শুধু এক আল্লাহর বান্দা হয়ে যাওয়া এবং গলদেশ থেকে অন্যদের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করা।

তাওহীদের পথ অবলম্বন করারও দু'টি পন্থা আছে এবং এর ফলাফলও ভিন্ন ভিন্ন।

একটি পন্থা এই যে, কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এক আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেবে কিন্তু আশে–পাশের পরিবেশ তার সহযোগী হবে না। এ ক্ষেত্রে তার জন্য বাইরের দ্বন্দ্ব–সংঘাত ও সংকীর্ণতা আগের চেয়েও বেড়ে যেতে পারে। তবে সে যদি সরল মনে এ পথ অবলম্বন করে থাকে তাহলে মনের দিক দিয়ে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করবে। সে প্রবৃত্তির এমন প্রতিটি আকাংখা প্রত্যাখ্যান করবে যা আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী বা যা পূরণ করার পাশাপাশি আল্লাহভীরুতার দাবী পূরণ করা যেতে পারে না। সে পরিবার, গোত্র, গোষ্ঠী, জাতি, সরকার, ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং আর্থিক কর্তৃত্বেরও এমন কোন দাবী গ্রহণ করবে না

যা আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। এর ফলে সে সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে পারে তথা অনিবার্যরূপেই হবে কিন্তু তার মন এ ব্যাপারে পুরোপুরি পরিতৃপ্ত থাকবে যে, আমি যে আল্লাহর বান্দা তার দাসত্বের দাবী আমি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করছি। আর আমি যাদের বান্দা নই আমার কাছে তাদের এমন কোন অধিকার নেই, যে কারণে আমি আমার রবের নির্দেশের বিরুদ্ধে তাদের দাসত্ব করবো। দুনিয়ার কোন শক্তিই তার থেকে মনের এ প্রশান্তি এবং আত্মার এ শান্তি ও তৃপ্তি ছিনিয়ে নিতে পারে না। এমনকি তাকে যদি ফাঁসি কাষ্ঠেও চড়তে হয় তাহলে সে প্রশান্ত মনে ফাঁসি কাষ্ঠেও ঝুলে যাবে। সে একথা ভেবে সামান্য অনুশোচনাও করবে না যে, আমি কেন মিথ্যা প্রভুদের সামনে মাথা নত করে আমার জীবন রক্ষা করলাম না।

আরেকটি পন্থা এই যে, গোটা সমাজ তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক এবং সেখানে নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, আইন-কানুন, রীতিনীতি ও দেশাচার, রাজনীতি, অর্থনীতি মোট কথা জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্য আকীদা-বিশ্বাস হিসেবে সেসব মূলনীতি মেনে নেয়া হোক এবং কার্যত চালু করা হোক যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাব ও রসূলের মাধ্যমে দিয়েছেন। আল্লাহর দীন যেটিকে গোনাহ বলবে আইন সেটিকেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে, সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সেগুলোকে উৎখাত করার চেষ্টা করবে, শিক্ষা-দীক্ষা সেটি থেকে বাঁচার জন্য মন-মানসিকতা তৈরী করবে। মিম্বার ও মিহরাব থেকে এর বিরুদ্ধেই আওয়াজ উঠবে, সমাজ এটিকে দোষণীয় মনে করবে এবং জীবিকা অর্জনের প্রতিটি কায়-কারবারে তা নিষিদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহর দীন যে জিনিসকে কল্যাণ ও সুকৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করবে আইন তাকেই সমর্থন করবে। ব্যবস্থাপনার শক্তি তার লালন-পালন করবে। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা মন-মগজে সেটিকে বদ্ধমূল করতে এবং চরিত্র ও কর্মে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করবে। মিম্বর ও মিহরাব তারই শিক্ষা দেবে, সমাজও তারই প্রশংসা করবে। তার ওপরেই প্রচলিত রীতিনীতি কার্যত প্রতিষ্ঠিত করবে এবং কায়-কারবার ও জীবন জীবিকার প্রক্রিয়াও সে অনুসারেই চলবে। এভাবেই মানুষ পূর্ণ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শান্তি লাভ করে এবং বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সমস্ত দরজা তার জন্য খুলে যায়। কারণ, আল্লাহ ও গায়রুল্লাহর দাসত্বের দাবীর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তা তখন প্রায় শেষ হয়ে যায়।

ইসলাম যদিও প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই বলে আহবান জানায় যে, দ্বিতীয় অবস্থাটা সৃষ্টি হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় সে তাওহীদকেই তার আদর্শ হিসেবে মেনে চলবে এবং সব রকম বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করে আল্লাহর দাসত্ব করবে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ এ দ্বিতীয় অবস্থা সৃষ্টি করা। সমস্ত নবী ও রসূল আলাইহিমুস সালামের প্রচেষ্টা ও দাবীও এই যে, একটি মুসলিম উম্মাহর উত্থান ঘটুক যারা কুফর ও কাফেরদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে জামায়াত বদ্ধভাবে আল্লাহর দীন অনুসরণ করবে। কুরআন ও সুন্নাত সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বিবেক-বুদ্ধিহীন না হয়ে কেউই একথা বলতে পারে না যে, নবী রসূল আলাইহিমুস সালামের চেষ্টা-সাধনার লক্ষ ছিল শুধু ব্যক্তিগত ঈমান ও আনুগত্য। সামাজিক জীবনে 'দীনে হক' বা ন্যায় ও সত্যের আদর্শ কায়েম করার উদ্দেশ্য আদৌ তাঁদের ছিল না।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

৪ রুকূ'

সে ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম আর কে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং তার সামনে যখন সত্য এসেছে তখন তা অস্বীকার করেছে? এসব কাফেরের জন্য কি জাহান্নামে কোন জায়গা নেই? আর যে ব্যক্তি সত্য নিয়ে এসেছে এবং যারা তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই আযাব থেকে রক্ষা পাবে।[৫২]

৪৯. এখানে "আলহামদুলিল্লাহ" এর অর্থ বুঝার জন্য মনের মধ্যে এ চিত্রটি অংকন করুন যে, শ্রোতাদের সামনে উপরোক্ত প্রশ্ন পেশ করার পর বক্তা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন যাতে তাওহীদের বিরোধিতাকারীদের কাছে তার কোন জবাব থাকলে যেন দিতে পারে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে যখন কোন জবাব আসলো না এবং কোন দিক থেকে এ জবাবও আসলো না যে, দু'টি সমান, তখন বক্তা বললেন 'আলহামদুলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর শুকরিয়া যে তোমরা নিজেরাও মনে মনে এ দু'টি অবস্থার পার্থক্য অনুভব করে থাকো। একজন মনিবের দাসত্বের চেয়ে অনেক মনিবের দাসত্ব উত্তম বা দু'টি সমান পর্যায়ের একথা বলার ধৃষ্ঠতা তোমাদের কারোই নেই।

৫০. অর্থাৎ একজন মনিবের দাসত্ব ও বহু সংখ্যক মনিবের দাসত্বের মধ্যকার পার্থক্য তো বেশ বুঝতে পার কিন্তু এক প্রভুর দাসত্ব ও বহু সংখ্যক প্রভুর দাসত্বের মধ্যকার পার্থক্য যখন বুঝানোর চেষ্টা করা হয় তখন অজ্ঞ সেজে বসো।

৫১. এ বাক্যাংশ ও পূর্ববর্তী বাক্যাংশের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম শূন্যতা আছে যা স্থান কাল ও পূর্বাপর বিষয়ে চিন্তা করে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেই পূর্ণ করতে পারেন। এখানে এ বিষয়টি প্রচ্ছন্ন আছে যে, তোমরা এভাবে একটি পরিষ্কার সহজ–সরল কথা সহজ–সরল উপায়ে এসব লোককে বুঝাচ্ছো আর এরা হঠকারিতা করে তোমাদের কথা শুধু প্রত্যাখ্যানই করছে না বরং এ সুস্পষ্ট সত্যকে পরাভূত করার জন্য তোমাদের চরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক আছে! চিরদিন তোমরাও থাকবে না, এরাও থাকবে না। একদিন উভয়কেই মরতে হবে। তখন সবাই যার যার পরিণাম জানতে পারবে।

৫২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার আদালতে যে মোকদ্দমা দায়ের হবে তাতে কোন্ লোকেরা শাস্তি লাভ করবে তা তোমরা আজই শুনে নাও। তাতে নিশ্চিতভাবে সে লোকেরাই শাস্তি পাবে যারা এ মিথ্যা আকীদা গড়ে নিয়েছিলো যে, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ইখতিয়ার এবং অধিকারে অন্য কিছু সত্তাও শরীক আছে। তাদের আরো বড় অপরাধ ছিল এই যে, তাদের সামনে সত্য পেশ করা হয়েছে কিন্তু তারা তা মানেনি। বরং যিনি সত্য পেশ করেছেন উল্টো তাকেই মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ۞ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۚ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۞ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ۚ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ۞

তারা তাদের রবের কাছে যা চাইবে তা–ই পাবে।[৫৩] এটা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান। যাতে সর্বাপেক্ষা খারাপ যেসব কাজ তারা করেছে আল্লাহ তাদের হিসেব থেকে সেগুলো বাদ দেন এবং যেসব ভাল কাজ তারা করেছে তার বিনিময়ে তাদেরকে পুরস্কার দান করেন।[৫৪]

[হে নবী, (সা)] আল্লাহ নিজে কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? এসব লোক তাঁকে বাদ দিয়ে তোমাদেরকে অন্যদের ভয় দেখায়।[৫৫] অথচ আল্লাহ যাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেন তাকে কেউ পথপ্রদর্শন করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথপ্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ কি মহা পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?[৫৬]

পক্ষান্তরে যিনি সত্য এনেছেন আর যারা তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে আল্লাহর আদালতে তাদের শাস্তি পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

৫৩. একথা লক্ষ রাখতে হবে যে, এখানে فِى الْجَنَّةِ (জান্নাতে) না বলে عِنْدَ رَبِّهِمْ (তাদের রবের কাছে) কথাটি বলা হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে মৃত্যুর পরেই কেবল বান্দা তার রবের কাছে পৌঁছে। তাই জান্নাতে পৌঁছার পর এ আচরণ করা হবে না। বরং মৃত্যুর পর থেকে জান্নাতে প্রবেশ পর্যন্ত সময়েও মু'মিন নেক্‌কার বান্দার সাথে আল্লাহ তা'আলা এ আচরণ করবেন। এটাই আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় বলে মনে হয়। ঈমানদার সৎকর্মশীল বান্দা বরযখের আযাব থেকে, কিয়ামতের দিনের কষ্ট থেকে, হিসেবের কঠোরতা থেকে, হাশরের ময়দানের অপমান থেকে এবং নিজের দুর্বলতা ও অপরাধের কারণে পাকড়াও থেকে অবশ্যই রক্ষা পেতে চাইবে, আর মহিমান্বিত আল্লাহ তার এসব আকাংখা পূরণ করবেন।

৫৪. যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনেছিলো তাদের দ্বারা জাহেলী যুগে আকীদাগত ও চরিত্রগত উভয় ধরনের জঘন্যতম গোনাহর কাজও সংঘটিত হয়েছিল। ঈমান গ্রহণের পর তারা যে শুধু পূর্ব অনুসৃত মিথ্যা পরিত্যাগ করে

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عٰمِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

তোমরা যদি এদের জিজ্ঞেস করো যমীন ও আসমান কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, আল্লাহ। এদের বলে দাও, বাস্তব ও সত্য যখন এই তখন আল্লাহ যদি আমার ক্ষতি করতে চান তাহলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব দেবীদের তোমরা পূজা করো তারা কি তাঁর ক্ষতির হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবে? কিংবা আল্লাহ যদি আমাকে রহমত দান করতে চান তাহলে এরা কি তাঁর রহমত ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? তাদের বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা তারই ওপর ভরসা করে।[৫৭] তাদেরকে পরিষ্কার করে বলে দাও হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা তোমাদের কাজ করতে থাকো।[৫৮] আমি আমার কাজ করে যাবো। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর লাঞ্ছনাকর আযাব আসে এবং কে চিরস্থায়ী আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়। [হে নবী (সা)] আমি সব মানুষের জন্য এ সত্য (বিধান সহ) কিতাব নাযিল করেছি। সুতরাং যে সোজা পথ অনুসরণ করবে সে নিজের জন্যই করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে তার পথভ্রষ্টতার প্রতিফলও তাকেই ভোগ করতে হবে। তার জন্য তুমি দায়ী হবে না।[৫৯]

নবীর (সা) পেশকৃত সত্যকে গ্রহণ করেছিলো এবং এটিই তাদের একমাত্র নেকীর কাজছিল তাই নয়, বরং তারা নৈতিক চরিত্র, ইবাদাত এবং পারস্পরিক লেনদেন ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম নেক আমল করেছিলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ জাহেলী যুগে তাদের দ্বারা যেসব জঘন্যতম কাজকর্ম সংঘটিত হয়েছিলো তাদের হিসেব থেকে তা

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾

৫ রুকূ'

মৃত্যুর সময় আল্লাহই রূহসমূহ কবজ করেন আর যে এখনো মরেনি নিদ্রাবস্থায় তার রূহ কবজ করেন।[৬০] অতপর যার মৃত্যুর ফায়সালা কার্যকরী হয় তাকে রেখে দেন এবং অন্যদের রূহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠান। যারা চিন্তা–ভাবনা করে তাদের জন্য এর মধ্যে বড় নিদর্শন রয়েছে।[৬১]

মুছে দেয়া হবে এবং তাদের আমলনামায় সর্বোত্তম যেসব নেক আমল থাকবে তার হিসেবে তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে।

৫৫. মক্কার কাফেররা নবীকে (সা) বলতো, তুমি আমাদের উপাস্যদের সাথে বেআদবী করে থাকো এবং তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে থাকো। তারা কত বড় সম্মানিত সত্তা তা তুমি জানো না। যে–ই তাদের অবমাননা ও অপমান করেছে সে–ই ধ্বংস হয়েছে। তুমি যদি তোমার কথাবার্তা থেকে বিরত না হও তাহলে এরা তোমাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।

৫৬. অর্থাৎ এটাও তাদের হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলশ্রুতি। কারণ এসব উপাস্যদের শক্তি ও মর্যাদার প্রতি এসব নির্বোধদের ভাল খেয়াল আছে। কিন্তু এ খেয়াল তাদের কখনো আসে না যে, আল্লাহ এক মহা পরাক্রমশালী সত্তা, শিরক করে এরা তাঁর যে অপমান ও অবমাননা করছে সে জন্যও শাস্তি হতে পারে।

৫৭. ইবনে আবী হাতেম ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস উদ্বৃত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من احب ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله ، ومن احب ان يكون اغنى الناس فليكن بما فى يد الله عز وجل اوثق منه بما فى يديه ، ومن احب ان يكون اكرم الناس فليتق الله عز وجل –

"যে ব্যক্তি সব মানুষের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হতে চায় সে যেন আল্লাহর ওপর 'তাওয়াক্কুল' করে, যে ব্যক্তি সবার চেয়ে অধিক ধনবান হতে চায় সে যেন তার নিজের কাছে যা আছে তার চেয়ে আল্লাহর কাছে যা আছে তার ওপর বেশী আস্থা ও নির্ভরতা রাখে, আর যে ব্যক্তি সবার চেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী হতে চায় সে যেন মহান আল্লাহকে ভয় করে।"

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

এসব লোক কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে সুপারিশকারী বানিয়ে রেখেছে?[৬২] তাদেরকে বলো, তাদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে যদি কিছু না থাকে এবং তারা কিছু না বুঝে এমতাবস্থায়ও কি সুপারিশ করবে? বলো, সুপারিশ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইখতিয়ারাধীন।[৬৩] আসমান ও যমীনের বাদশাহীর মালিক তিনিই। তোমাদেরকে তারই দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

৫৮. অর্থাৎ আমাকে পরাভূত করার জন্য তোমরা যা কিছু করছো এবং যা কিছু করতে সক্ষম তা করে যাও, এ ব্যাপারে কোন কসুর করো না।

৫৯. অর্থাৎ তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসা তোমার দায়িত্ব নয়। তোমার কাজ শুধু এই যে, তাদের সামনে সত্য পথটি পেশ করো। এরপর যদি তারা পথভ্রষ্ট থেকে যায় তাতে তোমার কোন দায়িত্ব নেই।

৬০. ঘুমন্ত অবস্থায় রূহ কবজ করার অর্থ অনুভূতি ও বোধ, উপলব্ধি ও অনুধাবন এবং ক্ষমতা ও ইচ্ছা নিষ্ক্রিয় করে দেয়া। এটা এমন এক অবস্থা যে "ঘুমন্ত মানুষ ও মৃত মানুষ সমান" এ প্রবাদ বাক্যটি এ ক্ষেত্রে হুবহু খাটে।

৬১. একথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে এ অনুভূতি দিতে চাচ্ছেন যে, জীবন ও মৃত্যু কিভাবে তাঁর অসীম ক্ষমতার করায়ত্ব। রাতে ঘুমালে সকালে অবশ্যই জীবিত উঠবে এ নিশ্চয়তা কোন মানুষের জন্যই নেই। কেউ–ই জানে না এক মুহূর্তের মধ্যে তার ওপর কি বিপদ আসতে পারে। আবার পরবর্তী মুহূর্তটি তার জন্য জীবনের মুহূর্ত না মৃত্যুর মুহূর্ত তাও কেউ জানে না। শয়নে, জাগরনে, ঘরে অবস্থানের সময় কিংবা কোথাও চলাফেরা করার সময় মানব দেহের আভ্যন্তরীণ কোন ত্রুটি অথবা বাইরের অজানা কোন বিপদ অকস্মাত এমন মোড় নিতে পারে যা তার মৃত্যু ঘটাতে পারে। যে মানুষ আল্লাহর হাতে এতটা অসহায় সে যদি সেই আল্লাহ সম্পর্কে এতটা অমনোযোগী ও বিদ্রোহী হয় তাহলে সে কত অজ্ঞ।

৬২. অর্থাৎ এসব লোক নিজের পক্ষ থেকেই ধরে নিয়েছে যে, কিছু সত্তা এমন আছে যারা আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত ক্ষমতাধর। তাদের সুপারিশ কখনো বিফলে যায় না। অথচ তারা যে সুপারিশকারী এ ব্যাপারে না আছে কোন প্রমাণ, না আল্লাহ তা'আলা কখনো বলেছেন যে, আমার দরবারে তাদের এ ধরনের মর্যাদা রয়েছে, না ঐ সব সত্তা ও ব্যক্তিবর্গ দাবী করেছেন যে আমরা নিজেদের ক্ষমতায় তোমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করে দেবো। তাদের আরো নির্বুদ্ধিতা এই যে, তারা প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে সব অনুমানকৃত

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

যখন শুধু আল্লাহর কথা বলা হয়, তখন যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না। তাদের মন কষ্ট অনুভব করে। আর যখন তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের কথা বলা হয় তখন তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।[৬৪] বলো, হে আল্লাহ, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী, তোমার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করে আসছে তুমিই সে বিষয়ে ফায়সালা করবে।

সুপারিশকারীদেরই সবকিছু মনে করে নিয়েছে এবং এদের সকল সবিনয় প্রার্থনা ও আকুতি তাদের জন্যই নিবেদিত।

৬৩. অর্থাৎ সুপারিশ গ্রহণ করানোর ক্ষমতা তো দূরের কথা নিজে নিজেই আল্লাহর দরবারে সুপারিশকারী হিসেবে যাবে সে শক্তিও কারো নেই। যাকে ইচ্ছা সুপারিশের অনুমতি দেয়া ও যাকে ইচ্ছা না দেয়া এবং যার জন্য ইচ্ছা সুপারিশ করতে দেয়া আর যার জন্য ইচ্ছা করতে না দেয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইখতিয়ারে। (শাফা'আত সম্পর্কে ইসলামী আকীদা ও শিরৃকমূলক আকীদার পার্থক্য বুঝার জন্য নিম্নোদ্ধৃত স্থানসমূহে দেখুন। তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, টীকা ২৮১; আল আন'আম, টীকা ৩৩; ইউনুস, টীকা ৫ ও ২৪; হূদ, টীকা ৮৪ ও ১০৬; আর রা'দ, টীকা ১৯; আন নাহ্ল, টীকা ৬৪, ৬৫,৭৯; ত্বা-হা, টীকা ৮৫ ও ৮৬; আল আম্বিয়া, টীকা ২৭; আল হাজ্জ, টীকা ১২৫; আস সাবা, টীকা ৪০)

৬৪. গোটা পৃথিবীর মুশরেকী রুচি ও ধ্যান-ধারণার অধিকারী প্রায় সব মানুষের মধ্যেই এটি বিদ্যমান। এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও যে দুর্ভাগাদের এ রোগ পেয়ে বসেছে তারাও এ দোষ থেকে মুক্ত নয়। মুখে বলে আমরা আল্লাহকে মানি। কিন্তু অবস্থা এই যে, শুধু আল্লাহর কথা বলুন, দেখবেন তাদের চেহারা বিকৃত হতে শুরু হয়েছে। এরা বলে বসবে। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বুযুর্গ ও আওলিয়াদের মানে না। সে জন্য শুধু আল্লাহর কথাই আওড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কথাও বলা হয় তাহলে আনন্দে ও প্রফুল্লতায় তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে তাদের আগ্রহ ও ভালবাসা কার প্রতি তা এ কর্মপন্থার মাধ্যমেই পরিষ্কার প্রকাশ পায়। আল্লামা আলুসী তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাঁর নিজের একটি অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি দেখলাম, কোন বিপদে পড়ে এক ব্যক্তি সাহায্যের জন্য এক মৃত বুযুর্গকে ডাকছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহকে ডাকো। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٨﴾ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

এসব জালেমদের কাছে যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদরাজি এবং তাছাড়া আরো অতটা সম্পদও থাকে তাহলে কিয়ামতের ভীষণ আযাব থেকে বাঁচার জন্য তারা মুক্তিপণ হিসেবে সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু তাদের সামনে আসবে যা তারা কোন দিন অনুমানও করেনি। সেখানে তাদের সামনে নিজেদের কৃতকর্মের সমস্ত মন্দ ফলাফল প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর যে জিনিস সম্পর্কে তারা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করতো তা–ই তাদের ওপর চেপে বসবে।

এ মানুষকেই[৬৫] যখন সামান্য মসিবতে পেয়ে বসে তখন সে আমাকে ডাকে। কিন্তু আমি যখন নিজের পক্ষ থেকে নিয়ামত দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করি তখন সে বলে ওঠে ঃ এসব তো আমি আমার জ্ঞান–বুদ্ধির জোরে লাভ করেছি।[৬৬] না, এটা বরং পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।[৬৭]

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

—আমার একথা শুনে সে ভীষণ চটে গেল। পরে লোকজন আমাকে বলেছে, সে বলছিলো ঃ এ ব্যক্তি আওলিয়াদের মানে না। তাছাড়া কিছু সংখ্যক লোক তাকে একথাও বলতে শুনেছে যে, অলীরা আল্লাহর চাইতে দ্রুত শুনে থাকেন।

৬৫. অর্থাৎ যার আল্লাহর নাম অপছন্দনীয় এবং একমাত্র আল্লাহর নামে যার চেহারা বিকৃত হতে শুরু করে।

৬৬. এ আয়াতাংশটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, আমি যে, এ নিয়ামতের উপযুক্ত তা আল্লাহ জানেন। তাই তিনি আমাকে এসব দিয়েছেন। আমি যদি তার কাছে একজন দুষ্ট ভ্রষ্ট আকীদা এবং দুষ্কর্মশীল মানুষ হতাম তাহলে আমাকে তিনি এসব

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۞ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ؕ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۞ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۞

তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও একথাই বলেছিলো। কিন্তু তারা নিজেদের কর্ম দ্বারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের কোন কাজে আসেনি।[৬৮] অতপর নিজেদের উপার্জনের মন্দ ফলাফল তারা ভোগ করেছে। এদের মধ্যেও যারা জালেম তারা অচিরেই তাদের উপার্জনের মন্দ ফলাফল ভোগ করবে। এরা আমাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না। তারা কি জানে না, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিযিক সংকীর্ণ করে দেন?[৬৯] এর মধ্যে সেসব লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান পোষণ করে।

নিয়ামত কেন দিতেন? এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, এসব তো আমি আমার যোগ্যতার ভিত্তিতে লাভ করেছি।

৬৭. কেউ যদি নিয়ামত লাভ করতে থাকে তখন মানুষ তার মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে মনে করে, সে অনিবার্যরূপে তার যোগ্যতার ভিত্তিতেই তা লাভ করছে আর তা লাভ করাটা আল্লাহর দরবারে তার প্রিয়পাত্র হওয়ার লক্ষণ বা প্রমাণ। অথচ এখানে যাকেই যা কিছু দেয়া হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবেই দেয়া হচ্ছে। এটা পরীক্ষার উপকরণ, যোগ্যতার পুরস্কার নয়। অন্যথায় কি কারণে বহু যোগ্য লোক দুর্দশাগ্রস্ত এবং বহু অযোগ্য লোক নিয়ামতের প্রাচুর্যে ডুবে আছে? অনুরূপভাবে এসব পার্থিব নিয়ামত আল্লাহর দরবারে প্রিয়পাত্র হওয়ারও লক্ষণ নয়। যে কোন ব্যক্তি দেখবেন, পৃথিবীতে বহু সৎকর্মশীল ব্যক্তি বিপদাপদে ডুবে আছে, অথচ তাদের সৎকর্মশীল হওয়া অস্বীকার করা যায় না। আবার বহু দুশ্চরিত্র লোক আরাম আয়েশে জীবন কাটাচ্ছে যাদের কুৎসিত আচরণ ও তৎপরতা সম্পর্কে সবাই অবহিত। এখন কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি কি একজনের বিপদাপদ এবং আরেকজনের আরাম-আয়েশকে একথার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে যে, আল্লাহ সৎকর্মশীল মানুষদের পছন্দ করেন না, দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্মশীল মানুষদের পছন্দ করেন?

৬৮. অর্থাৎ যখন দুর্ভাগ্যের দিন আসলো তখন তাদের যোগ্যতার দাবী কোন কাজে লাগলো না। তাছাড়া একথাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলো

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۳﴾ وَاَنِيْبُوْٓا
اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا
تُنْصَرُوْنَ ﴿۵۴﴾ وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ
اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿۵۵﴾ اَنْ تَقُوْلَ
نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِىْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ
السّٰخِرِيْنَ ﴿۵۶﴾ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۵۷﴾

৬ রুকূ'

(হে নবী,) বলে দাও, হে আমার বান্দারা[৭০] যারা নিজের আত্মার ওপর জুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[৭১] ফিরে এসো তোমাদের রবের দিকে এবং তাঁর অনুগত হয়ে যাও তোমাদের ওপর আযাব আসার পূর্বেই। তখন কোন দিক থেকেই আর সাহায্য পাওয়া যাবে না। আর অনুসরণ করো তোমাদের রবের প্রেরিত কিতাবের সর্বোত্তম দিকগুলোর[৭২]—তোমাদের ওপর আকস্মিকভাবে আযাব আসার পূর্বেই—যে আযাব সম্পর্কে তোমরা অনবহিত থাকবে। এমন যেন না হয় যে, পরে কেউ বলবে ঃ "আমি আল্লাহর ব্যাপারে যে অপরাধ করেছি সে জন্য আফসোস। বরং আমি তো বিদ্রূপকারীদের মধ্যে শামিল ছিলাম।" অথবা বলবে ঃ "কতই না ভাল হতো যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান করতেন। তাহলে আমিও মুত্তাকীদের অন্তরভুক্ত থাকতাম।"

না। একথা স্পষ্ট যে তাদের এসব উপার্জন যদি যোগ্যতা ও প্রিয়পাত্র হওয়ার কারণে হতো তাহলে দুর্দিন কি করে আসলো?

৬৯. অর্থাৎ রিযিকের স্বল্পতা ও প্রাচুর্য আল্লাহর আরেকটি বিধানের ওপর নির্ভরশীল। সেই বিধানের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ ভিন্ন। রিযিকের বন্টন ব্যক্তির যোগ্যতা কিংবা তার প্রিয়পাত্র বা বিরাগভাজন হওয়ার ওপর আদৌ নির্ভর করে না। (এ বিষয়টি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আত–তাওবা, টীকা ৫৪, ৭৫, ৮৯; ইউনুস,

টীকা ২৩; হূদ, টীকা ৩ ও ৩৩; আর রা'দ, টীকা ৪২; আল কাহাফ, টীকা ৩৭; মারয়াম, টীকা ৪৫; ত্বা–হা, টীকা ১১৩ ও ১১৪; আল আম্বিয়া, টীকা ৯৯; আল মু'মিনূন, ভূমিকা এবং টীকা ১, ৪৯ ও ৫০; আশ্ শু'য়ারা, টীকা ৮১ ও ৮৪; আল কাসাস, টীকা ৯৭, ৯৮ ও ১০১; সাবা টীকা ৫৪ থেকে ৬০)।

৭০. কেউ কেউ একথাটির অদ্ভুত এক ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "হে আমার বান্দারা", বলে মানুষকে সম্বোধন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সব মানুষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বান্দা। প্রকৃতপক্ষে এটা এমন এক ব্যাখ্যা যাকে ব্যাখ্যা নয় বরং কুরআন মজীদের জঘন্যতম অর্থ বিকৃতি এবং আল্লাহর বাণীর সাথে তামাসা বলতে হবে। মূর্খ ভক্তদের কোন গোষ্ঠি এ বিষয়টি শুনে তো সমর্থনে মাথা নাড়তে থাকবে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সঠিক হলে গোটা কুরআনই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কেননা, কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষকে একমাত্র আল্লাহর বান্দা হিসেবে আখ্যায়িত করে। তাছাড়া কুরআনের দাওয়াতই হচ্ছে, তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ছিলেন আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ তাকে প্রভু নয় রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তিনি নিজেও আল্লাহর দাসত্ব করবেন এবং মানুষকেও তাঁরই দাসত্বের শিক্ষা দেবেন। কোন বুদ্ধিমান মানুষের মগজে একথা কি করে আসতে পারে যে, মক্কায় কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের মাঝে দাঁড়িয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন হয়তো হঠাৎ একথা ঘোষণা করে দিয়ে থাকবেন যে, তোমরা উয্যা বা সূর্যের দাস নও, প্রকৃতপক্ষে তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাস। اعاذنا الله من ذلك

৭১. এখানে সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। শুধু ঈমানদারদের সম্বোধন করা হয়েছে একথা বলার কোন উপযুক্ত প্রমাণ নেই। তাছাড়া আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন, গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে একথা বলার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাওবা ও অনুশোচনা ছাড়াই সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। পরবর্তী আয়াতটিতে আল্লাহ নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, গোনাহ মাফের উপায় হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বাণীর অনুসরণ করা। এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে সেসব লোকের জন্য আশার বাণী বয়ে এনেছিলো যারা জাহেলী যুগে হত্যা, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি এবং এ ধরনের বড় বড় গোনাহর কাজে লিপ্ত ছিল আর এসব অপরাধ যে কখনো মাফ হতে পারে সে ব্যাপারে নিরাশ ছিল। তাদের বলা হয়েছে, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তোমরা যা কিছুই করেছো এখনো যদি তোমাদের রবের আনুগত্যের দিকে ফিরে আস তাহলে সবকিছু মাফ হয়ে যাবে। ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদা (রা), মুজাহিদ (র) ও ইবনে যায়েদ (র) এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। (ইবনে জারীর, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী) আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা আল ফুরকান, টীকা ৮৪।

৭২. আল্লাহর কিতাবের সর্বোত্তম দিকসমূহ অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন মানুষ তা পালন করবে। তিনি যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবে। এবং উপমা ও কিসসা–কাহিনীতে যা বলেছেন

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾

কিংবা আযাব দেখতে পেয়ে বলবে ঃ "কতই না ভাল হতো যদি আরো একবার সুযোগ পেতাম তাহলে নেক আমলকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতাম।" (আর সে সময় যদি এ জওয়াব দেয়া হয়) কেন নয়, আমার আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসেছিলো। কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করেছিলে এবং গর্ব করেছিলে। আর তুমি তো কাফেরদের অন্তরভুক্ত ছিলে। আজ যেসব লোক আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে কিয়ামতের দিন তুমি দেখবে তাদের মুখমণ্ডল হবে কাল। অহংকারীদের জন্য কি জাহান্নামে যথেষ্ট জায়গা নেই? অন্যদিকে যেসব লোক এখানে তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তাদের সাফল্যের পন্থা অবলম্বনের জন্যই নাজাত দেবেন। কোন অকল্যাণ তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখ ভারাক্রান্তও হবে না।

আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক।[৭৩] যমীন ও আসমানের ভাণ্ডারের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে তারাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে। অপরদিকে যে ব্যক্তি তাঁর নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, নিষিদ্ধ কাজসমূহ করে এবং আল্লাহর উপদেশ বাণীর কানা কড়িও মূল্য দেয় না, সে আল্লাহর কিতাবের নিকৃষ্টতম দিক গ্রহণ করে। অর্থাৎ সে এমন দিক গ্রহণ করে যাকে আল্লাহর কিতাব নিকৃষ্টতম দিক বলে আখ্যায়িত করে।

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

৭ রুকূ'

(হে নবী,) এদের বলে দাও, "হে মূর্খেরা, তাহলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দাসত্ব করতে বলো আমাকে?" (তোমার উচিত তাদের একথা স্পষ্ট বলে দেয়া। কারণ) তোমার কাছে এবং ইতিপূর্বেকার সমস্ত নবীর কাছে এ অহী পাঠানো হয়েছে যে, যদি তুমি শিরকে লিপ্ত হও তাহলে তোমার আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে[৭৪] এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। অতএব, [হে নবী, (সা)] তুমি শুধু আল্লাহরই বন্দেগী করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও।

আল্লাহকে যে মর্যাদা ও মূল্য দেয়া দরকার এসব লোক তা দেয়নি।[৭৫] (তাঁর অসীম ক্ষমতার অবস্থা এই যে,) কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুঠির মধ্যে থাকবে আর আসমান তাঁর ডান হাতে পেঁচানো থাকবে।[৭৬] এসব লোক যে শিরক করছে তিনি তা থেকে পবিত্র ও অনেক উর্ধে।[৭৭]

৭৩. অর্থাৎ তিনি কেবল পৃথিবী সৃষ্টিই করেননি, বরং তিনিই এর সব জিনিসের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যেমন তাঁর সৃষ্টি করার কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি তাঁর টিকিয়ে রাখার কারণেই টিকে আছে, তাঁর প্রতিপালনের কারণেই বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের কল্যাণেই তা কাজ করছে।

৭৪. অর্থাৎ শিরকের সাথে কৃত কোন কাজকে আমলে সালেহ বা ভাল কাজ বলে আখ্যায়িত করা যায় না। আর মুশরিক থেকে যে ব্যক্তি নিজের ধারণা অনুসারে অনেক কাজকে সৎকাজ মনে করে করবে তার জন্য সে কোন পুরস্কার লাভের যোগ্য হবে না। তার গোটা জীবন পুরোপুরি লোকসানজনক কারবার হয়ে দাঁড়াবে।

৭৫. অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। তারা কখনো একথা বুঝার চেষ্টাই করেনি যে, বিশ্ব–জাহানের প্রভুকে কত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٠﴾

সেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া[৭৮] হবে। আর তৎক্ষণাত আসমান ও যমীনে যারা আছে তারা সব মরে পড়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাদের জীবিত রাখতে চান তারা ছাড়া। অতপর আরেকবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন হঠাৎ সবাই জীবিত হয়ে দেখতে থাকবে[৭৯]—পৃথিবী তার রবের নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আমলনামা এনে হাজির করা হবে, নবী–রসূল ও সমস্ত সাক্ষীদের[৮০] হাজির করা হবে। মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে ইনসাফ মত ফায়সালা করে দেয়া হবে, তাদের ওপর কোন জুলুম হবে না এবং প্রত্যেক প্রাণীকে তার কৃতকর্ম অনুসারে পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে। মানুষ যা করে আল্লাহ তা খুব ভাল করে জানেন।

আর এসব অজ্ঞ লোকেরা যাদেরকে খোদায়ীর আসনের অংশীদার ও উপাস্য হওয়ার অধিকারী বানিয়ে বসে আছে তারা কত নিকৃষ্ট ও নগণ্য।

৭৬. যমীন ও আসমানে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের চিত্র অংকনের জন্য যমীন হাতের মুঠিতে থাকা এবং আসমান ডান হাতে পেঁচানো থাকা রূপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন মানুষ ছোট একটি বলকে যেমন মুঠির মধ্যে পুরে নেয় এবং তার জন্য তা একটা মামুলি ব্যাপার ঠিক তেমনি কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ (যারা আজ আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের অনুমান করতেও অক্ষম) নিজ চোখে দেখতে পাবে যমীন ও আসমান আল্লাহর কুদরতের হাতে একটা নগণ্যতম বল ও ছোট একটি রুমালের মত। মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে জারীর প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে উমর এবং হযরত আবু হুরাইরার বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে উঠে খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবা দানের সময় তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে (অর্থাৎ গ্রহসমূহকে) তাঁর মুষ্ঠির মধ্যে নিয়ে এমনভাবে ঘুরাবেন—যেমন শিশুরা বল ঘুরিয়ে থাকে—এবং বলবেন ঃ আমি একমাত্র আল্লাহ। আমি বাদশাহ। আমি সর্বশক্তিমান। আমি বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মালিক। কোথায় পৃথিবীর বাদশাহ? কোথায় শক্তিমানরা? কোথায় অহংকারীরা? এভাবে বলতে বলতে নবী (সা)

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾

৮ রুকূ'

(এ ফায়সালার পরে) যারা কুফরী করেছিলো সেসব লোককে দলে দলে জাহান্নাম অভিমুখে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন দোযখের দরজাসমূহ খোলা হবে[৮১] এবং তার ব্যবস্থাপক তাদেরকে বলবে : তোমাদের কাছে কি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে রসূলগণ আসেননি যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন যে, একদিন তোমাদেরকে এ দিনটির সম্মুখীন হতে হবে? তারা বলবে : "হাঁ, এসেছিলো। কিন্তু আযাবের সিদ্ধান্ত কাফেরদের জন্য অবধারিত হয়ে গিয়েছে।" বলা হবে, জাহান্নামের দরজার মধ্যে প্রবেশ করো, তোমাদেরকে চিরকাল এখানেই থাকতে হবে। অহংকারীদের জন্য এটা অত্যন্ত জঘন্য ঠিকানা।

এমনভাবে কাঁপতে থাকলেন যে, তিনি মিম্বারসহ পড়ে না যান আমাদের সে ভয় হতে লাগলো।

৭৭. অর্থাৎ কোথায় তাঁর এই বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আর কোথায় তাঁর খোদায়ীতে কারো শরীক হওয়া!

৭৮. শিংগার ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ৪৭; ইবরাহীম, টীকা ৫৭; আল কাহ্ফ, টীকা ৭৩; ত্বা-হা, টীকা ৭৮; আল হাজ্জ, টীকা ১; আল মু'মিনূন, টীকা ৯৪; আন নাম্ল, টীকা ১০৬।

৭৯. এখানে শুধু দুইবার শিংগায় ফুৎকারের উল্লেখ আছে। এ ছাড়া সূরা আন নাম্লে এ দু'টি ফুৎকারের অতিরিক্ত আরো একবার শিংগায় ফুৎকারের উল্লেখও আছে যা শুনে আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে (আয়াত ৮৭)। এ কারণে হাদীসসমূহে তিনবার শিংগায় ফুৎকারের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এক, "নাফখাতুল ফাযা" অর্থাৎ ভীত সন্ত্রস্তকারী শিংগা। দুই, "নাফখাতুস সা'ক অর্থাৎ মৃত্যু ঘটানোর শিংগা।

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

আর যারা তাদের রবের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাত অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে পৌছবে তখন দেখবে জান্নাতের দরজাসমূহ পূর্বেই খুলে দেয়া হয়েছে। ব্যবস্থাপকরা তাদের বলবেঃ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা অত্যন্ত ভাল ছিলে, চিরকালের জন্য এখানে প্রবেশ করো। আর তারা বলবে ঃ সেই মহান আল্লাহ শুকরিয়া যিনি আমাদের সাথে কৃত তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করলেন এবং আমাদেরকে যমীনের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছেন।[৮২] এখন জান্নাতের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা আমরা স্থান গ্রহণ করতে পারি।[৮৩] সৎকর্মশীলদের জন্য এটা সর্বোত্তম প্রতিদান।[৮৪]

তুমি আরো দেখতে পাবে যে, ফেরেশতারা আরশের চারদিক বৃত্ত বানিয়ে তাদের রবের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে। মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করে দেয়া হবে এবং ঘোষণা দেয়া হবে, সারা বিশ্ব-জাহানের রবের জন্যই সমস্ত প্রশংসা।[৮৫]

তিন, "নাফখাতুল কিয়াম লি রাব্বিল আলামীন" অর্থাৎ যে শিংগায় ফুৎকার দেয়ার সাথে সমস্ত মানুষ জীবিত হয়ে উঠবে এবং নিজের রবের সামনে হাজির হওয়ার জন্য নিজ নিজ কবর থেকে বেরিয়ে আসবে।

৮০. সাক্ষীসমূহ অর্থ সেসব সাক্ষীও যারা সাক্ষ দেবে যে, মানুষের কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌছিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তাছাড়া এর অর্থ সেসব সাক্ষীও যারা মানুষের কাজ-কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ দেবে। এসব সাক্ষী কেবল মানুষই হবে তা জরুরী নয়। ফেরেশতা, জিন, জীব-জন্তু, মানুষের অংগ-প্রত্যংগসমূহ, ঘরবাড়ী-দরজা, প্রাচীর, গাছপালা, পাথর সবকিছুই এসব সাক্ষীর অন্তরভুক্ত হবে।

৮১. অর্থাৎ জাহান্নামের দরজাসমূহ পূর্বে থেকে খোলা থাকবে না। বরং তারা সেখানে পৌঁছার পরে খোলা হবে, যেমন অপরাধীদের পৌঁছার পরে জেলখানার দরজা খোলা হয় এবং তাদের প্রবেশের পরই বন্ধ করে দেয়া হয়।

৮২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা–হা, টীকা ৮৩; আল আম্বিয়া, টীকা ৯৯।

৮৩. অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেককে জান্নাত দান করা হয়েছে। এখন তা আমাদের মালিকানা এবং এখানে আমরা পুরা ক্ষমতা ও ইখতিয়ার লাভ করেছি।

৮৪. হতে পারে, এটা জান্নাতবাসীদের উক্তি। আবার এও হতে পারে যে, জান্নাতবাসীদের উক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একথাটা জুড়ে দেয়া হয়েছে।

৮৫. অর্থাৎ গোটা বিশ্ব–জাহান আল্লাহর প্রশংসা গেয়ে উঠবে।

আল মু'মিন

৪০

নামকরণ

সূরার ২৮ আয়াতের وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ অংশ থেকে নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটা সে সূরা যার মধ্যে সেই বিশেষ মু'মিন ব্যক্তির উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ইবনে আব্বাস ও জাবের ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন যে, এ সূরা সূরা যুমার নাযিল হওয়ার পর পরই নাযিল হয়েছে। কুরআন মজীদের বর্তমান ক্রমবিন্যাসে এর যে স্থান, নাযিল হওয়ার ধারাক্রম অনুসারেও সূরাটির সে একই স্থান।

নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট

যে পটভূমিতে এ সূরা নাযিল হয়েছিলো এর বিষয়বস্তুর মধ্যে সেদিকে সুস্পষ্ট ইংগিত বিদ্যমান। সে সময় মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে দুই ধরনের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলো। এক, বাক–বিতণ্ডা ও তর্ক–বিতর্ক সৃষ্টি করে নানা রকমের উল্টা–পাল্টা প্রশ্ন উত্থাপন করে, এবং নিত্য নতুন অপবাদ আরোপ করে কুরআনের শিক্ষা, ইসলামী আন্দোলন এবং খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে মানুষের মনে এমন সন্দেহ সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেয়া যে, তা খণ্ডন করতেই যেন নবী (সা) ও ঈমানদারগণ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। দুই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যে তারা একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিলো। একবার তারা কার্যত এ পদক্ষেপ নিয়েও ফেলেছিলো। বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আস (রা) বর্ণিত হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন হারাম শরীফের মধ্যে নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ 'উকবা ইবনে আবু মু'আইত অগ্রসর হয়ে তাঁর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে দিল। অতপর তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার জন্য কাপড়ে মোচড় দিতে লাগলো। ঠিক সে মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা) সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ধাক্কা মেরে 'উকবা ইবনে আবু মু'আইতকে হটিয়ে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকর যে সময় ধাক্কা দিয়ে ঐ জালেমকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিলো, اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ (তোমরা কি শুধু এতটুকুন অপরাধে একজন মানুষকে হত্যা করছো যে, তিনি বলছেন, আমার রব আল্লাহ?) এ ঘটনাটি

সীরাতে ইবনে হিশাম গ্রন্থেও কিছুটা ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া নাসায়ী ও ইবনে আবী হাতেমও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

বক্তব্যের শুরুতেই পরিস্থিতির এ দু'টি দিক পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশিষ্ট গোটা বক্তব্যই এ দু'টি দিকের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ পর্যালোচনা মাত্র।

হত্যার ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমানদার ব্যক্তির কাহিনী শুনানো হয়েছে (আয়াত ৩৩ থেকে ৫৫) এবং এ কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে তিনটি গোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি শিক্ষা দেয়া হয়েছে ঃ

এক ঃ কাফেরদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যা কিছু করতে চাচ্ছো ফেরাউন নিজের শক্তির ওপর ভরসা করে হযরত মূসার (আ) সাথে এমন একটা কিছুই করতে চেয়েছিলো। একই আচরণ করে তোমরাও কি সে পরিণাম ভোগ করতে চাও যা তারা ভোগ করেছিলো?

দুই ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এসব জালেম দৃশ্যত যত শক্তিশালী ও অত্যাচারীই হোক না কেন এবং তাদের মোকাবিলায় তোমরা যতই দুর্বল ও অসহায় হওনা কেন, তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত, যে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করার জন্য তোমরা কাজ করে যাচ্ছো তাঁর শক্তি যে কোন শক্তির তুলনায় প্রচণ্ডতম। সুতরাং তারা তোমাদের যত বড় ভীতিকর হুমকিই দিক না কেন তার জবাবে তোমরা কেবল আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে নাও এবং তারপর একেবারে নির্ভয় হয়ে নিজেদের কাজে লেগে যাও। আল্লাহর পথের পথিকদের কাছে যে কোন জালেমের হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের একটিই জবাব, আর তা হচ্ছে ঃ

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

এভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করে বিপদ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে যদি কাজ করো তাহলে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহায্য অবশ্যই লাভ করবে এবং অতীতের ফেরাউন যে পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে বর্তমানের ফেরাউনও সে একই পরিণামের সম্মুখীন হবে। সে সময়টি আসার পূর্বে জুলুম-নির্যাতনের তুফান একের পর এক যতই আসুক না কেন তোমাদেরকে তা ধৈর্যের সাথে বরদাশত করতে হবে।

তিন ঃ এ দু'টি গোষ্ঠী ছাড়াও সমাজে তৃতীয় আরেকটি গোষ্ঠী ছিল। সেটি ছিল এমন লোকদের গোষ্ঠী যারা মনে প্রাণে বুঝতে পেরেছিলো যে, ন্যায় ও সত্য আছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে আর কুরাইশ গোত্রের কাফেররা নিছক বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু একথা জানা সত্ত্বেও তারা হক ও বাতিলের এ সংঘাতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলো। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বিবেককে নাড়া দিয়েছেন। তিনি তাদের বলছেন, ন্যায় ও সত্যের দুশমনরা যখন তোমাদের চোখের সামনে এত বড় নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে তখনও যদি তোমরা বসে

বসে তামাসা দেখতে থাকো তাহলে আফসোস। যে ব্যক্তির বিবেক একেবারে মরে যায়নি তাদের কর্তব্য ফেরাউন যখন মূসাকে (আ) হত্যা করতে চেয়েছিলো তখন তার ভরা দরবারে সভাসদদের মধ্য থেকে একজন ন্যায়পন্থী ব্যক্তি যে ভূমিকা পালন করেছিলো সে ভূমিকা পালন করা। যে যুক্তি ও উদ্দেশ্য তোমাদেরকে মুখ খোলা থেকে বিরত রাখছে সে একই যুক্তি ও উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তির সামনে পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু সে أُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ (আমার সব বিষয় আল্লাহর ওপর সোপর্দ করলাম) বলে সমস্ত যুক্তি ও উদ্দেশ্যকে পদাঘাত করেছিলেন। কিন্তু দেখো, ফেরাউন তার কিছুই করতে পারেনি।

ন্যায় ও সত্যকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য পবিত্র মক্কায় রাতদিন কাফেরদের যে তর্ক–বিতর্ক ও বাক–বিতণ্ডা চলছিলো তার জবাবে একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যকার মূল বিবাদের বিষয় তাওহীদ ও আখিরাতের আকীদা বিশ্বাসের যথার্থতা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে এবং এ সত্য স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এসব লোক কোন যুক্তি–প্রমাণ ছাড়াই খামখা সত্যের বিরোধিতা করছে। অপর দিকে কুরাইশ নেতারা এতটা তৎপরতার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলো কেন সে কারণগুলোকে উন্মোচিত করা হয়েছে। বাহ্যত তারা দেখাচ্ছিলো যে, নবীর (সা) শিক্ষা এবং তাঁর নবুওয়াত দাবী সম্পর্কে তাদের বাস্তব আপত্তি আছে যার কারণে তারা এসব কথা মেনে নিতে পারছে না। তবে মূলত তাদের জন্য এটা ছিলো ক্ষমতার লড়াই। কোন রাখঢাক না করে ৫৬ আয়াতে তাদেরকে পরিষ্কার একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের অস্বীকৃতির আসল কারণ তোমাদের গর্ব ও অহংকার যা দিয়ে তোমাদের মন ভরা। তোমরা মনে করো মানুষ যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত মেনে নেয় তাহলে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকবে না। এ কারণে তাঁকে পরাস্ত করার জন্য তোমরা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো।

এ প্রসংগে কাফেরদেরকে একের পর এক সাবধান করা হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিরুদ্ধে বিতর্ক সৃষ্টি করা থেকে বিরত না হও তাহলে অতীতের জাতিসমূহ যে পরিণাম ভোগ করেছে তোমরাও সে একই পরিণামের সম্মুখীন হবে এবং আখিরাতে তোমাদের জন্যে তার চেয়েও নিকৃষ্ট পরিণাম ভাগ্যের লিখন হয়ে আছে। সে সময় তোমরা অনুশোচনা করবে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না।

حٰمٓ ۝١ تَنۡزِيۡلُ الۡكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡعَلِيۡمِ ۝٢ غَافِرِ الذَّنۡۢبِ وَقَابِلِ التَّوۡبِ شَدِيۡدِ الۡعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوۡلِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيۡهِ الۡمَصِيۡرُ ۝٣ مَا يُجَادِلُ فِىۡۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فَلَا يَغۡرُرۡكَ تَقَلُّبُهُمۡ فِى الۡبِلَادِ ۝٤

হা–মীম। এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত যিনি মহাপরাক্রমশালী, সবকিছু সম্পর্কে অতিশয় জ্ঞাত, গোনাহ মাফকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং অত্যন্ত দয়ালু। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।[১]

আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে কেবল সে সবলোকই বিতর্ক[২] সৃষ্টি করে যারা কুফরী করেছে[৩] এরপরও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে তাদের চলাফেরা যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।[৪]

১. এটা বক্তব্যের ভূমিকা। এর মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই শ্রোতাদেরকে এ মর্মে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সামনে যে বাণী পেশ করা হচ্ছে তা কোন সাধারণ সত্তার বাণী নয়, বরং তা নাযিল হয়েছে এমন আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি এসব গুণাবলীর অধিকারী। এরপর একের পর এক আল্লাহ তা'আলার কতিপয় গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। যা পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত :

প্রথম গুণটি হচ্ছে তিনি পরাক্রমশালী বা সর্বশক্তিমান অর্থাৎ সবার ওপরে বিজয়ী। কারো ব্যাপারে তিনি যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন তা নিশ্চিতভাবেই কার্যকরী হয়। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে কেউ বিজয়ী হতে পারে না। কিংবা কেউ তাঁর পাকড়াও থেকেও বাঁচতে পারে না। তাই তাঁর নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেউ যদি সফলতার আশা করে এবং তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে তাঁকে পরাভূত ও অবদমিত দেখানোর আশা

করে, তাহলে তা তার নিজের বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের আশা কখনো পূরণ হতে পারে না।

দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে, তিনি সবকিছু জানেন। অর্থাৎ তিনি অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন কথা বলেন না, বরং তিনি প্রতিটি বস্তু সম্পর্কেই সরাসরি জ্ঞানের অধিকারী। এ জন্য অনুভূতি ও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়ে তিনি যেসব তথ্য দিচ্ছেন কেবল সেগুলোই সঠিক হতে পারে এবং তা না মানার অর্থ হচ্ছে অযথা অজ্ঞতার অনুসরণ করা। একইভাবে তিনি জানেন কোন্ জিনিসে মানুষের উন্নতি এবং তার কল্যাণের জন্য কোন্ নীতিমালা, আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ আবশ্যক। তাঁর প্রতিটি শিক্ষা সঠিক কৌশল ও জ্ঞান-ভিত্তিক যার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব, তাঁর পথনির্দেশনা গ্রহণ না করার অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি নিজেই তার ধ্বংসের পথে চলতে চায়। তাছাড়া মানুষের কোন গতিবিধি তাঁর নিকট গোপন থাকতে পারে না। এমনকি মনের যে নিয়ত ও ইচ্ছা মানুষের সমস্ত কাজ-কর্মের মূল চালিকাশক্তি তাও তিনি জানেন। তাই কোন অজুহাত বা বাহানা দেখিয়ে মানুষ তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে না।

তৃতীয় গুণ হচ্ছে, "গোনাহ মাফকারী ও তাওবা কবুলকারী" এটা তাঁর আশা ও উৎসাহ দানকারী গুণ। এ গুণটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা এখনো পর্যন্ত বিদ্রোহ করে চলেছে তারা যেন নিরাশ না হয় বরং একথা ভেবে নিজেদের আচরণ পুনর্বিবেচনা করে যে, এখনো যদি তারা এ আচরণ থেকে বিরত হয় তাহলে আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। এখানে একথা বুঝে নিতে হবে যে, গোনাহ মাফ করা আর তাওবা কবুল করা একই বিষয়ের দু'টি শিরোনাম মোটেই নয়। অনেক সময় তাওবা ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা গোনাহ মাফ করতে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি ভুল-ক্রটিও করে আবার নেকীর কাজও করে এবং তার নেকীর কাজ গোনাহ মাফ হওয়ার কারণ হয়ে যায়, চাই ঐ সব ভুল-ক্রটির জন্য তার তাওবা করার ও ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগ হোক বা না হোক। এমনকি সে যদি তা ভুলে গিয়ে থাকে তাও। অনুরূপভাবে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তির ওপর যত দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি এবং নানা রকম দুশ্চিন্তা ও মর্মপীড়াদায়ক বিপদাপদই আসে তা সবই তার গোনাহ ও ভুল-ক্রটির কাফ্ফারা হয়ে যায়। এ কারণে গোনাহ মাফ করার কথা তাওবা কবুল করার কথা থেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাওবা ছাড়াই গোনাহ মাফলাভের এ সুযোগ কেবল ঈমানদারদের জন্যই আছে। আর ঈমানদারদের মধ্যেও কেবল তারাই এ সুযোগ লাভ করবে যারা বিদ্রোহ করার মানসিকতা থেকে মুক্ত এবং যাদের দ্বারা মানবিক দুর্বলতার কারণে গোনাহর কাজ সংঘটিত হয়েছে, অহংকার ও বার বার গোনাহ করার কারণে নয়।

চতুর্থ গুণ হচ্ছে, তিনি কঠিন শাস্তিদাতা। এ গুণটি উল্লেখ করে মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, বন্দেগী ও দাসত্বের পথ অনুসরণকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যতটা দয়াবান, বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার আচরণকারীদের জন্য তিনি ঠিক ততটাই কঠোর। যেসব সীমা পর্যন্ত তিনি ভুল-ক্রটি ক্ষমা ও উপক্ষো করেন, যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি সে সীমাসমূহ লংঘন করে তখন তারা তাঁর শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। আর তাঁর শাস্তি এমন ভয়াবহ যে, কোন নির্বোধ মানুষই কেবল তা সহ্য করার মত বলে মনে করতে পারে।

পঞ্চম গুণ হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত দয়ালু অর্থাৎ দানশীল, অভাবশূন্য এবং উদার ও অকৃপণ। সমস্ত সৃষ্টিকূলের ওপর প্রতিমুহূর্তে তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি ব্যাপকভাবে বর্ষিত হচ্ছে। বান্দা যা কিছু লাভ করছে তা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেই লাভ করছে।

এ পাঁচটি গুণ বর্ণনা করার পর অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে দু'টি সত্য বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, মানুষ আর যত মিথ্যা উপাস্যই বানিয়ে রাখুক না কেন প্রকৃত উপাস্য একমাত্র তিনি। অপরটি হচ্ছে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। মানুষের কৃতকর্মসমূহের হিসেব গ্রহণকারী এবং সে অনুসারে পুরস্কার বা শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী আর কোন উপাস্য নেই। অতএব, কেউ যদি তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের উপাস্য বানিয়ে নেয় তাহলে তার এ নির্বুদ্ধিতার ফল সে নিজেই ভোগ করবে।

২. বিতর্ক সৃষ্টি করার অর্থ বাক চাতুরী করা, ত্রুটি বের করা, আবোল–তাবোল আপত্তি উত্থাপন করা, পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোন একটা শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে তা থেকে নানা রকম বিষয় বের করে তার ওপর সন্দেহ–সংশয় ও অপবাদের ইমারত নির্মাণ করা। বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপেক্ষা করে তার বিভ্রান্তিকর অর্থ করা যাতে ব্যক্তি নিজেও কথা বুঝতে না পারে এবং অন্যদেরকেও বুঝতে না দেয়। মতানৈক্য ও বিরোধ করার এ পন্থা কেবল তারাই গ্রহণ করে, যাদের মতানৈক্য ও মতবিরোধ অসদোদ্দেশ্য প্রণোদিত। সৎ নিয়তে বিরোধকারী বিতর্কে লিপ্ত হলেও বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যেই এবং প্রকৃত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে বিষয়টি সম্পর্কে তার নিজের দৃষ্টিকোণ সঠিক না বিপক্ষের দৃষ্টিকোণ সঠিক তা নিশ্চিত করতে চায়। এ ধরনের বিতর্ক হয় সত্যকে জানার জন্য, কাউকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য নয়। পক্ষান্তরে অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিপক্ষের লক্ষ তা বুঝা বা বুঝানো নয় বরং সে বিপক্ষকে পরাস্ত ও উত্যক্ত করতে চায়। অপরের কথা কোনভাবেই চলতে দেয়া যাবে না সে এ উদ্দেশ্যেই বিতর্কে লিপ্ত হয়। এ কারণে সে কখনো মূল প্রশ্নের মুখোমুখি হয় না, বরং সবসময় একথা সে কথা বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়।

৩. এখানে "কুফর" শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক, নিয়ামতের অস্বীকৃতি অর্থে, দুই, ন্যায় ও সত্যের অস্বীকৃতি অর্থে। প্রথম অর্থ অনুসারে এ বাক্যাংশের মানে হচ্ছে, আল্লাহর আয়াতসমূহ অর্থাৎ বাণী বা আদেশ–নিষেধসমূহের বিরুদ্ধে এ কর্মপন্থা কেবল সেসব লোকেরাই গ্রহণ করে যারা তাঁর অনুগ্রহরাজি ভুলে গিয়েছে এবং এ অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে যে, তাঁরই নিয়ামতের সাহায্যে তারা পালিত হচ্ছে। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে এ বাক্যাংশের মানে হচ্ছে, যারা ন্যায় ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং না মানার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কেবল তারাই এ কর্মপন্থা গ্রহণ করে থাকে। পূর্বাপর বিষয় বিবেচনা করলে এ বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ ক্ষেত্রে কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তি বলতে যারা মুসলমান নয় এমন সব ব্যক্তি মাত্রকেই বুঝানো হয়নি। কেননা, যেসব অমুসলিম ইসলামকে বুঝার উদ্দেশ্যে সৎ নিয়তে বিতর্ক করে এবং যে কথা বুঝতে তার কষ্ট হচ্ছে তা বুঝার জন্য ব্যাখ্যা পাওয়ার চেষ্টা করে, ইসলাম গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত পারিভাষিক অর্থে তারা কাফের বটে, কিন্তু সাথে সাথে একথাও সত্য যে, এ আয়াতে যে জিনিসটির নিন্দা করা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۖ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝

এর পূর্বে নূহের (আ) কওম অস্বীকার করেছে এবং তাদের পরে আরো বহু দল ও গোষ্ঠী এ কাজ করেছে। প্রত্যেক উম্মত তার রসূলকে পাকড়াও করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা সবাই বাতিলের হাতিয়ারের সাহায্যে হককে অবদমিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। দেখে নাও, কত কঠিন ছিল আমার শাস্তি। অনুরূপ যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য তোমার রবের এ সিদ্ধান্তও অবধারিত হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহান্নামের বাসিন্দা হবে।[৫]

৪. আয়াতের প্রথমাংশ ও দ্বিতীয়াংশের মধ্যে একটা শূন্যতা আছে যা বুঝে নেয়ার দায়িত্ব শ্রোতাদের মন-মগজ ও চিন্তা-ভাবনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কথার ধরন থেকে আপনা আপনি এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, যারা আল্লাহর আয়াত বা আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কর্মপন্থা গ্রহণ করে, তারা শাস্তি থেকে কখনো রক্ষা পেতে পারে না। তাদের দুর্ভাগ্যের পালা একদিন না একদিন অবশ্যই আসবে। এ মুহূর্তে যদিও তোমরা দেখছো যে, তারা এসব কিছু করেও আল্লাহর দুনিয়ায় নিশ্চিন্তে বুকটান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের জম-জমাট কারবার চলছে, জাঁক-জমকের সাথে তাদের কর্তৃত্ব ও শাসন চলছে এবং খুব ভোগ ও আরাম আয়েশের মধ্যে ডুবে আছে, তবুও এ ধোঁকায় পড়ো না যে, তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে গিয়েছে। কিংবা আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধে লড়াই কোন খেল-তামাশার বিষয় যা তামাশা হিসেবে খেলা যেতে পারে এবং এ খেলার খেলোয়াড়দেরকে এর মন্দ ফলাফল কখনো ভোগ করতে হবে না। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে দেয়া অবকাশ। এ অবকাশকে অন্যায়ভাবে কাজে লাগিয়ে যারা যতটা অপকর্ম করে তাদের জাহাজ ততটা পূর্ণ হয়ে নিমজ্জিত হয়।

৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের ওপর যে আযাব এসেছে তা তাদের জন্য নির্ধারিত চূড়ান্ত আযাব ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এ ফায়সালাও করে দিয়েছেন যে, তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে। এ আয়াতের আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, যেভাবে অতীত জাতিসমূহের দুর্ভাগ্য এসেছে, এখন যারা কুফরী করছে অনুরূপভাবে তাদের জন্যও আল্লাহর স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকেও জাহান্নামে যেতে হবে।

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑦

আল্লাহর আরশের ধারক ফেরেশতাগণ এবং যারা আরশের চার পাশে হাজির থাকে তারা সবাই প্রশংসাসহ তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং ঈমানদারদের জন্য দোয়া করে।[৬] তারা বলে ঃ হে আমাদের রব, তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো।[৭] তাই মাফ করে দাও এবং দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কারো[৮] যারা তাওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করেছে[৯] তাদেরকে।

৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগীদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য একথা বলা হয়েছে। তারা সে সময় মক্কার কাফেরদের বিদ্রূপ, কটূভাষণ ও অত্যাচার এবং তাদের সামনে নিজেদের অসহায়ত্ব দেখে দেখে ভগ্ন হৃদয় হয়ে পড়ছিলো। তাই বলা হয়েছে, এসব নীচু ও হীন লোকদের কথায় তোমরা মন খারাপ করছো কেন? তোমরা এমন মর্যাদার অধিকারী যে, আল্লাহর আরশের ধারক ফেরেশতারা এবং আরশের চারপাশে অবস্থানরত ফেরেশতারা পর্যন্ত তোমাদের সহযোগী। তারা তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করছে। সাধারণ ফেরেশতাদের কথা না বলে আল্লাহর আরশের ধারক ও তার চারপাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ ধারণা দেয়ার জন্য যে, মহান আল্লাহর বিশাল সাম্রাজ্যের কর্মচারীরা তো বটেই, তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থানরত যেসব ফেরেশতা ঐ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ এবং বিশ্ব–জাহানের শাসন কর্তার কাছে যারা নৈকট্য লাভ করেছে তারা পর্যন্ত তোমাদের প্রতি গভীর আগ্রহ ও সমবেদনা পোষণ করে। আরো বলা হয়েছে যে, এসব ফেরেশতা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ এবং ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। একথা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, ঈমানের বন্ধনই প্রকৃত বন্ধন যা আসমান ও যমীনবাসীদেরকে পরস্পর একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছে। এ সম্পর্কের কারণেই আরশের পাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের তাদের মতই আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান পোষণকারী মাটির মানুষদের সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর প্রতি ফেরেশতাদের ঈমান পোষণ করার অর্থ এই নয় যে, তারা কুফরী করতে পারতো। কিন্তু তা না করে তারা ঈমান গ্রহণ করেছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা এক ও লা–শরীক আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকেই স্বীকার করে নিয়েছে। এমন আর কোন সত্তা নেই যে তাদের আদেশ দান করে আর তারাও তার আনুগত্য করে চলে। ঈমান গ্রহণকারী মানুষ যখন এ পথই গ্রহণ করলো তখন এত বড় জাতিগত পার্থক্য ও স্থানগত দূরত্ব সত্ত্বেও তাদের এবং ফেরেশতাদের মধ্যে একই দৃষ্টিভঙ্গিগত দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ۣالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۭ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

হে আমাদের রব উপরন্তু তাদেরকে তোমার প্রতিশ্রুত[১০] চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তাদের বাপ মা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল (তাদেরকেও সেখানে তাদের সাথে পৌঁছিয়ে দাও)।[১১] তুমি নিসন্দেহে সর্বশক্তিমান ও মহাকৌশলী। আর তাদেরকে মন্দ কাজসমূহ থেকে রক্ষা করো।[১২] কিয়ামতের দিন তুমি যাকে মন্দ ও অকল্যাণসমূহ[১৩] থেকে রক্ষা করেছো তার প্রতি তুমি বড় করুণা করেছো। এটাই বড় সফলতা।

৭. অর্থাৎ তোমার বান্দার দুর্বলতা, বিচ্যুতি ও ভুল-ত্রুটি তোমার অজানা নয়। নিসন্দেহে তুমি সবকিছু জানো। কিন্তু তোমার জ্ঞানের মত তোমার রহমতও ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি জানা সত্ত্বেও এই অসহায়দের ক্ষমা করে দাও। আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, তোমার জ্ঞানানুসারে যাদের সম্পর্কে তুমি জান যে, তারা সরল মনে 'তাওবা' করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে তোমার পথ অবলম্বন করেছে, দয়া ও রহমত দিয়ে তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দাও।

৮. ক্ষমা করা ও দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করা যদিও পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এর একটি কথা বলার পর বাহ্যত অপর কথাটি বলার কোন প্রয়োজন থাকে না। তবে এ বাচনভঙ্গি দ্বারা মূলত ঈমানদারদের প্রতি ফেরেশতাদের গভীর আগ্রহ প্রকাশ পায়। প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে, কোন ব্যাপারে কারো মন যদি আকৃষ্ট হয় সে যখন শাসকের কাছে আবেদন জানানোর সুযোগ লাভ করে তখন একই আবেদনকে সে বার বার নানাভাবে মিনতি করে পেশ করতে থাকে। এ ক্ষেত্রে একটি কথা একবার মাত্র পেশ করে সে তৃপ্তি ও সান্ত্বনা পায় না।

৯. অর্থাৎ অবাধ্যতা পরিত্যাগ করেছে, বিদ্রোহ থেকে বিরত হয়েছে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে তোমার নিজের নির্দেশিত জীবন পথে চলতে শুরু করেছে।

১০. একথাটির মধ্যেও সেই মিনতি ভরা আবেদনের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান যার প্রতি আমরা ওপরে ৮নং টীকায় ইংগিত দিয়েছি। একথা সুস্পষ্ট যে, ক্ষমা করা এবং দোযখ থেকে রক্ষা করা দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করার অর্থও আপনা আপনিই এবং আনিবার্যভাবেই প্রকাশ পায়। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা নিজে ঈমানদারদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿١١﴾ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

যারা কুফরী করেছে কিয়ামতের দিন তাদের ডেকে বলা হবে, "আজ তোমরা নিজেদের ওপর যতটা ক্রোধান্বিত হচ্ছো, আল্লাহ তোমাদের ওপর তার চেয়েও অধিক ক্রোধান্বিত হতেন তখন যখন তোমাদেরকে ঈমানের দিকে আহবান জানানো হতো আর তোমরা উল্টা কুফরী করতে।"[১৪] তারা বলবে : হে আমাদের রব, প্রকৃতই তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছো এবং দু'বার জীবন দান করেছো।[১৫] এখন আমরা অপরাধ স্বীকার করছি।[১৬] এখন এখান থেকে বের হওয়ার কোন উপায় কি আছে?[১৭] (জবাব দেয়া হবে) এ অবস্থা যার মধ্যে তোমরা আছ, তা এ কারণে যে, যখন একমাত্র আল্লাহর দিকে ডাকা হতো তখন তোমরা তা মানতে অস্বীকার করতে। কিন্তু যখন তাঁর সাথে অন্যদেরকেও শামিল করা হতো তখন মেনে নিতে। এখন তো ফায়সালা মহান ও মর্যাদাবান আল্লাহর হাতে।[১৮]

দিয়েছেন মু'মিনদেরকে সেটি দেয়ার জন্য দোয়া করা বাহ্যত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। কিন্তু ফেরেশতাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কল্যাণকামিতার এতটা আবেগ বিদ্যমান যে, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য একাধারে কল্যাণ কামনা করে দোয়া করে যাচ্ছে। অথচ তারা জানে, আল্লাহ তাদের প্রতি এসব অনুগ্রহ অবশ্যই করবেন।

১১. অর্থাৎ তাদের চক্ষু শীতল করার জন্য তাদের মা-বাবা, স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদেরও তাদের সাথে একত্রিত করে দেবেন। জান্নাতে ঈমানদারদেরকে যেসব নিয়ামত দান করা হবে তার বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা নিজেও একথা বলেছেন। দেখুন, সূরা রা'দ, আয়াত ২৩ এবং সূরা তূর, আয়াত ২১। সূরা তূরের আয়াতে এ কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয় এবং তার মা, বাবা ও সন্তান-সন্ততি অনুরূপ মর্যাদা লাভ না করে তাহলে তাকে উচ্চ মর্যাদা থেকে নামিয়ে তাদের সাথে মিলিত করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার বাবা-মা ও সন্তান-সন্ততিকেই উচ্চ মর্যাদা দিয়ে তার পর্যায়ে উন্নীত করবেন।

১২. سَيِّئَات (মন্দ কাজসমূহ) তিনটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য। এক, ভুল আকীদা-বিশ্বাস, বিকৃত নৈতিক চরিত্র এবং মন্দ কাজ-কর্ম। দুই, গোমরাহী ও মন্দ কাজের পরিণাম। তিন, বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্ট—তা এ পৃথিবীর হোক, আলমে বারযাখ বা মৃত্যুর পরের জীবনের হোক কিংবা কিয়ামতের দিনের হোক। ফেরেশতাদের দোয়ার লক্ষ হলো, যেসব জিনিস তাদের জন্য অকল্যাণকর সেরূপ প্রতিটি জিনিস থেকে তাদের রক্ষা করো।

১৩. কিয়ামতের দিনের অকল্যাণ অর্থ হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা, ছায়া ও অন্যান্য আরাম-আয়েশ ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া, হিসেব-নিকেশের কঠোরতা, সমস্ত সৃষ্টির সামনে জীবনের গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশ হয়ে যাওয়ার লাঞ্ছনা ও অপমান এবং সেখানে অপরাধীরা আর যেসব লাঞ্ছনা ও কষ্টের সম্মুখীন হবে তাও।

১৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফেররা যখন দেখবে যে, তারা পৃথিবীতে শিরক, নাস্তিকতা, আখেরাত অস্বীকৃতি এবং নবী-রসূলদের বিরোধিতার ওপর নিজেদের গোটা জীবনের তৎপরতার ভিত্তি স্থাপন করে যারপর নাই নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছে এবং সে নির্বুদ্ধিতার কারণে এখন চরম অকল্যাণকর ও অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে তখন তারা নিজেদের আঙ্গুল কামড়াতে থাকবে এবং বিরক্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদেরই অভিশাপ দিতে থাকবে। তখন ফেরেশতারা তাদের ডেকে বলবে, আজ তোমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হচ্ছো। কিন্তু ইতিপূর্বে পৃথিবীতে তোমাদেরকে এ পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এবং সৎকর্মশীল লোকেরা সঠিক পথের দিকে আহবান জানাতেন আর তোমরা সে আহবান প্রত্যাখ্যান করতে তখন আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ এর চেয়েও বেশী করে প্রজ্জ্বলিত হতো।

১৫. দু'বার মৃত্যু এবং দু'বার জীবন বলতে সূরা বাকারার ২৮ আয়াতে যা বলা হয়েছে তাই বুঝানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহর সাথে কি করে কুফরী করো, অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তিনি তোমাদের প্রাণ দান করেছেন। এরপর তিনি পুনরায় তোমাদের মৃত্যু দিবেন এবং পরে আবার জীবন দান করবেন। কাফেররা এসব ঘটনার প্রথম তিনটি অস্বীকার করে না। কারণ, ঐগুলো বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং সে জন্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তারা শেষোক্ত ঘটনাটির সংঘটন অস্বীকার করে। কারণ, এখনো পর্যন্ত তারা তা প্রত্যক্ষ করেনি এবং শুধু নবী-রসূলগণই এটির খবর দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন এ চতুর্থ অবস্থাটিও তারা কার্যত দেখতে পাবে এবং তখন স্বীকার করবে যে, আমাদেরকে যে বিষয়ের খবর দেয়া হয়েছিলো তা প্রকৃতই সত্যে পরিণত হলো।

১৬. অর্থাৎ এ দ্বিতীয় জীবনটির কথা অস্বীকার করে আমরা যে ভুল করেছি এবং এ ভ্রান্ত মতবাদ অনুসারে কাজ করে আমাদের জীবন যে পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে তা আমরা স্বীকার করি।

১৭. অর্থাৎ এখন আমরা আযাবের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি আমাদের পক্ষ থেকে অপরাধের স্বীকৃতিকে গ্রহণ করে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা কি আছে?

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

তিনিই তো তোমাদের নিদর্শনসমূহ দেখান[১৯] এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিযিক নাযিল করেন[২০] (কিন্তু এসব নিদর্শন দেখে) কেবল তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী[২১] (সুতরাং হে প্রত্যাবর্তনকারীরা,) দীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে[২২] তাঁকেই ডাকো, তোমাদের এ কাজ কাফেরদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।

তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী,[২৩], আরশের অধিপতি।[২৪] তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার কাছে ইচ্ছা নিজের হুকুমে 'রূহ' নাযিল করেন[২৫] যাতে সে সাক্ষাতের দিন[২৬] সম্পর্কে সাবধান করে দেয়। সেটি এমন দিন যখন সব মানুষের সবকিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে। আল্লাহর কাছে তাদের কোন কথাই গোপন থাকবে না। (সেদিন ঘোষণা দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে) আজ রাজত্ব কার?[২৭] (সমস্ত সৃষ্টি বলে উঠবে) একমাত্র আল্লাহর যিনি কাহ্হার।

১৮. অর্থাৎ যে আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে নিতে তোমরা রাজি ছিলে না সেই একমাত্র আল্লাহর হাতেই এখন ফায়সালা। আর ইলাহী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে যাদেরকে অংশীদার বানাতে তোমরা জিদ ধরেছিলে, ফায়সালার ক্ষেত্রে এখন তাদের কোন হাত নেই। (একথাটা বুঝার জন্য সূরা যুমারের ৪৫ আয়াত এবং তার ৬৪নং টীকার প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে) এ আয়াতাংশের মধ্যে আপনা থেকে এ অর্থও অন্তরভুক্ত হয়ে আছে যে, এখন আযাবের এ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথও নেই। কারণ, তোমরা শুধু আখেরাত অস্বীকার করেছিলে তাই নয়, বরং তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহর প্রতিও ছিল তোমাদের চরম বিদ্বেষভাব। তাছাড়া তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করা ছাড়া তোমরা আদৌ কোন মানসিক তৃপ্তি লাভ করতে পারতে না।

১৯. নিদর্শনসমূহ বলতে সেসব নিদর্শনকে বুঝানো হয়েছে যা থেকে এ বিশ্ব–জাহানের নির্মাতা, কারিগর, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা তা জানা যায়।

২০. এখানে রিযিক অর্থ বৃষ্টিপাত। কেননা, মানুষ এ পৃথিবীতে যত প্রকার রিযিক লাভ করে থাকে তা সবই বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসংখ্য নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে এ একটি মাত্র নিদর্শনের কথা তুলে ধরে এ মর্মে মানুষের দৃষ্টি আ'কর্ষণ করেছেন যে, তোমরা যদি কেবল এ একটি জিনিসের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করো তাহলে বুঝতে পারবে, কুরআনে তোমাদেরকে বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধানের যে ধারণা দেয়া হচ্ছে সেটিই বাস্তব ও সত্য। পৃথিবী ও তার সমস্ত সৃষ্টিকুল এবং পানি, বাতাস, সূর্য, উষ্ণতা ও শীতলতা সবকিছুর স্রষ্টা যদি একমাত্র আল্লাহ হন কেবল সে ক্ষেত্রেই এ ধরনের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধান সম্ভব। আর সে অনাদি অনন্ত আল্লাহই যদি চালু রাখেন কেবল তখনই এ ব্যবস্থা লক্ষ কোটি বছর পর্যন্ত একাধারে নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলতে পারে। এ ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠাকারী কেবল একমাত্র আল্লাহই হতে পারেন যিনি মহাজ্ঞানী, অতি দয়াবান ও পালনকর্তা। যিনি পৃথিবীতে মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদরাজি সৃষ্টি করার সাথে সাথে তাদের প্রয়োজন অনুসারে পানিও সৃষ্টি করেছেন এবং তা নিয়মিতভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌছিয়ে দেয়া ও ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিস্ময়কর এ ব্যবস্থাপনাও দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এসব দেখে শুনেও আল্লাহকে অস্বীকার করে কিংবা আরো কিছু সত্তাকে তাঁর প্রভুত্বে অংশীদার বানায় তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?

২১. অর্থাৎ আল্লাহ বিমুখ ব্যক্তি যার জ্ঞান বুদ্ধির ওপর গাফলতি এবং গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার পর্দা পড়ে আছে সে কোন জিনিস দেখেও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। তার পশু–চক্ষু এ দৃশ্য অবশ্যই দেখবে যে, বাতাস বয়ে গেল, মেঘরাশি উড়ে আসলো, বিদ্যুৎ চমকালো ও বজ্র ধ্বনি হলো এবং বৃষ্টিপাত হলো কিন্তু তার মানবিক মন–মগজ ভেবে দেখবে না, এসব কেন হচ্ছে, কে করছে এবং আমার কাছে তার কি কি অধিকার ও প্রাপ্য রয়েছে।

২২. দীনকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত করার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা যুমারের ৩নং টীকায় করা হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি থেকে তার মর্যাদা অনেক উচ্চে। এ বিশ্ব–জাহানে বিদ্যমান কোন সত্তাই সে ফেরেশতা, নবী, অলী বা অন্য কোন সৃষ্টি যাই হোক না কেন আর তার মর্যাদা অন্য সব সৃষ্টিকুলের তুলনায় যত উচ্চ ও উন্নতই হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে তাঁর শরীক হওয়ার ধারণা করা তো দূরের কথা তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার ধারে কাছে পৌছার কথাও কল্পনা করা যায় না।

২৪. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব–জাহানের বাদশাহ ও শাসক এবং এ সাম্রাজ্যের সিংহাসনের অধিপতি। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৪১; ইউনুস, টীকা ৪; আর রা'দ, টীকা ৩; ত্বা-হা, টীকা ২)।

২৫. রূহ অর্থ অহী ও নবুওয়াত। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, আন–নাহল, টীকা ২; বনী ইসরাঈল, টীকা ১০৩।) আর **"আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা এ রূহ নাযিল**

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ؕ۬ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾ وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾

(বলা হবে,) আজ প্রত্যেক প্রাণীকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি কোন জুলুম হবে না।[২৮] আল্লাহ অতি দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।[২৯] হে নবী, এসব লোকদের সেদিন সম্পর্কে সাবধান করে দাও যা সন্নিকটবর্তী হয়েছে।[৩০] যেদিন কলিজা মুখের মধ্যে এসে যাবে আর সব মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। জালেমদের জন্য না থাকবে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু,[৩১] না থাকবে কোন গ্রহণযোগ্য শাফায়াতকারী।[৩২] আল্লাহ চোখের চুরি ও মনের গোপন কথা পর্যন্ত জানেন। আল্লাহ সঠিক ও ন্যায় ভিত্তিক ফায়সালা করবেন। আর (এ মুশরিকরা) আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে। তারা কোন কিছুরই ফায়সালাকারী নয়। নিসন্দেহে আল্লাহই সবকিছু শোনেন ও দেখেন।[৩৩]

করেন।" এ বাণীর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর মেহেরবানী ও অনুগ্রহের ওপর কারো কোন ইজারাদারী নেই। অমুক ব্যক্তিকে সৌন্দর্য দান করা হয়েছে কেন এবং অমুক ব্যক্তিকে স্মরণ শক্তি বা অসাধারণ মেধা শক্তি দান করা হয়েছে কেন, একথা বলার অধিকার যেমন কেউ রাখে না, তেমনি কেউ একথা বলারও অধিকার রাখে না যে, অমুক ব্যক্তিকে নবুওয়াতের পদমর্যাদার জন্য বাছাই করা হয়েছে কেন এবং আমরা যাকে চাই তাকে নবী বানানো হয়নি কেন?

২৬. অর্থাৎ যেদিন সমস্ত মানুষ, জিন ও শয়তান একই সময়ে তাদের রবের সামনে উপস্থিত হবে এবং তাদের কাজ–কর্মের সমস্ত সাক্ষীও উপস্থিত হবে।

২৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে তো বহু অহংকারী ভ্রান্ত লোক নিজেদের বাদশাহী ও শক্তিমত্তার ডঙ্কা বাজাতো আর বহু সংখ্যক নির্বোধ তাদের বাদশাহী ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতো। এখন বলো প্রকৃতপক্ষে বাদশাহী কার? ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকৃত মালিক কে? আর হুকুমই বা চলে কার? এটা এমন একটা বিষয় যে কোন ব্যক্তি যদি তা বুঝার চেষ্টা করে তাহলে সে

যত বড় বাদশাহ কিংবা একনায়ক হয়ে থাকুক না কেন, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তার মন-মগজ থেকে শক্তিমত্তার সমস্ত অহংকার উবে যাবে। এখানে ঐতিহাসিক এ ঘটনাটা উল্লেখ্য যে, সামানী খান্দানের শাসক নাসর ইবনে আহমাদ (৩০১-৩৩১ হিঃ) নিশাপুরে প্রবেশ করলে একটি দরবার ডাকেন এবং সিংহাসনে বসার পর কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে কাজকর্ম শুরু হবে বলে আদেশ দেন। একথা শুনে একজন সম্মানিত জ্ঞানী ব্যক্তি অগ্রসর হন এবং এ রুকূ'টি তিলাওয়াত করেন। যখন তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন তখন নাসর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে সিংহাসন থেকে নামলেন এবং মাথার মুকুট খুলে সিজদায় পড়ে বললেন ঃ হে আমার প্রভু, বাদশাহী তোমারই, আমার নয়।

২৮. অর্থাৎ কোন ধরনের জুলুমই হবে না। প্রকাশ থাকে যে, প্রতিদানের ক্ষেত্রে জুলুমের কয়েকটি রূপ হতে পারে। এক, প্রতিদানের অধিকারী ব্যক্তিকে প্রতিদান না দেয়া। দুই, সে যতটা প্রতিদান লাভের উপযুক্ত তার চেয়ে কম দেয়া। তিন, শাস্তি যোগ্য না হলেও শাস্তি দেয়া। চার, যে শাস্তির উপযুক্ত তাকে শাস্তি না দেয়া। পাঁচ, যে কম শাস্তির উপযুক্ত তাকে বেশী শাস্তি দেয়া। ছয়, জালেমের নির্দোষ মুক্তি পাওয়া এবং মজলুমের তা চেয়ে দেখতে থাকা। সাত, একজনের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেয়া। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর আদালতে এ ধরনের কোন জুলুমই হতে পারবে না।

২৯. এর অর্থ হিসেব নিতে আল্লাহর কোন বিলম্ব হবে না। যেভাবে তিনি গোটা বিশ্ব-জাহানের সমস্ত সৃষ্টিকে যুগপৎ রিযিক দান করছেন এবং কাউকে রিযিক পৌঁছানোর ব্যবস্থাপনায় এমন ব্যস্ত নন যে, অন্যদের রিযিক দেয়ার অবকাশই তিনি পান না। যেভাবে তিনি গোটা বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসকে যুগপৎ দেখছেন, সমস্ত শব্দ যুগপৎ শুনছেন, প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এবং বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ব্যাপারের ব্যবস্থাপনাও তিনি যুগপৎ করছেন এবং কোন জিনিস এমনভাবে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না যে, ঠিক সে মুহূর্তে তিনি আর সব বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন না, তেমনি তিনি যুগপৎ প্রত্যেক ব্যক্তির হিসেবেও গ্রহণ করবেন এবং একটি বিচার্য বিষয়ের শুনানিতে তিনি কখনো এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না যে, সে সময়ে অন্য অসংখ্য মোকদ্দমার শুনানি করতে পারবেন না। তাছাড়া তাঁর আদালতে এ কারণেও কোন বিলম্ব হবে না যে, মোকদ্দমার পটভূমি ও ঘটনাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ এবং তার সাক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ কঠিন হবে। আদালতের বিচারক নিজে সরাসরি বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবেন। মোকদ্দমার বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের সবকিছুই তাঁর জানা থাকবে। সমস্ত ঘটনার খুঁটি-নাটি সব দিক পর্যন্ত অনস্বীকার্য সাক্ষ প্রমাণসহ অনতিবিলম্বে সবিস্তার পেশ করা হবে। তাই সমস্ত মোকদ্দমার ফায়সালা ঝটপট হয়ে যাবে।

৩০. কুরআন মজীদে মানুষকে বার বার এ উপলব্ধি দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কিয়ামত তাদের থেকে বেশী দূরে নয়, বরং তা অতি সন্নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে এবং যে কোন মুহূর্তে সংঘটিত হতে পারে। কোথাও বলা হয়েছে ঃ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ (আল নাহল ১)।কোথাও বলা হয়েছে اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (আল আম্বিয়া ১) কোথাও সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (আল ক্বামার ১)। কোথাও বলা হয়েছেঃ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

৩ রুকূ'

এসব লোক কি কখনো পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি তাহলে ইতিপূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের পরিণাম দেখতে পেতো? তারা এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল এবং এদের চেয়েও বেশী শক্তিশালী স্মৃতিচিহ্ন পৃথিবীর বুকে রেখে গিয়েছে। কিন্তু গোনাহর কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আল্লাহর হাত থেকে তাদের রক্ষাকারী কাউকে পাওয়া যায়নি। তাদের এহেন পরিণতির কারণ হলো তাদের কাছে তাদের রসূল স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ[৩৪] নিয়ে এসেছিলো আর তারা তা মানতে অস্বীকার করেছিলো। অবশেষে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন। নিসন্দেহে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কঠোর শাস্তিদাতা।

আমি মূসাকে[৩৫] ফেরাউন, হামান[৩৬] ও কারূণের কাছে আমার নিদর্শনসমূহ এবং আমার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ[৩৭] সহ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা বললো ঃ জাদুকর, মিথ্যাবাদী।

دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (আন নাজ্‌ম ৫৭)। এসব কথার উদ্দেশ্য মানুষকে এ মর্মে সাবধান করে দেয়া যে, তারা যেন কিয়ামতকে দূরের কোন জিনিস মনে করে শঙ্কাহীন না থাকে। সতর্ক ও সামলিয়ে চলার প্রয়োজন মনে করলে এক মুহূর্তও নষ্ট না করে যেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩১. মূল আয়াতে حَمِيمٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এমন বন্ধু যাকে প্রহৃত হতে দেখে নিজেও উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তাঁকে রক্ষার জন্য দ্রুত অগ্রসর হয়।

৩২. কাফেরদের শাফায়াত সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে অবরোহমূলক-ভাবে একথাটি বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জালেমদের জন্য সেখানে আদৌ কোন শাফায়াতকারী থাকবে না। কারণ, শাফায়াতের অনুমতি লাভ করলে কেবল আল্লাহর নেক বান্দারাই করবে। আর আল্লাহর নেক বান্দারা কখনো কাফের, মুশরিক এবং ফাসেক ও পাপাচারীদের বন্ধু হতে পারে না যে, তারা-তাদের বাঁচানোর জন্য শাফায়াত করার চিন্তা করবে। তবে যেহেতু কাফের, মুশরিক ও পথভ্রষ্ট লোকদের সাধারণ আকীদা–বিশ্বাস অতীতেও এই ছিল এবং বর্তমানেও আছে যে, আমরা যে বুযর্গদের অনুসরণ করে চলেছি তারা কখনো আমাদেরকে দোযখে যেতে দেবেন না। তারা বরং বাধা হয়ে সামনে দাঁড়াবেন এবং ক্ষমা করিয়েই ছাড়বেন। তাই বলা হয়েছে সেখানে এ রকম শাফায়াতকারী কেউ থাকবে না, যার কথা মেনে নেয়া হবে এবং আল্লাহকে যার সুপারিশ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

৩৩. অর্থাৎ তিনি তোমাদের উপাস্যদের মত কোন অন্ধ ও বধির আল্লাহ নন যে, যে ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন তার কৃতকর্ম সম্পর্কে কিছু জানেন না।

৩৪. স্পষ্ট নিদর্শন বলতে তিনটি জিনিস বুঝানো হয়েছে। এক, এমন সুস্পষ্ট চিহ্ন ও নিদর্শন যা তাঁদের আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদিষ্ট হওয়ার প্রমাণ। দুই, এমন সব উজ্জ্বল প্রমাণ যা তাঁদের আনীত শিক্ষার সত্যতা প্রমাণ করছিলো। তিন, জীবনের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে এমন সব সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা যা দেখে যে কোন যুক্তিবাদী মানুষ বুঝতে পারতো যে, কোন স্বার্থপর মানুষ এরূপ পবিত্র শিক্ষা দিতে পারে না।

৩৫. হযরত মূসার (আ) কাহিনীর আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, টীকা ৬৪ থেকে ৭৬; আন নিসা, টীকা ২০৬; আল মা–য়েদা, টীকা ৪২; আল আ'রাফ, টীকা ৯৩ থেকে ১১৯; ইউনুস, টীকা ৭২ থেকে ৯৪; হূদ, টীকা ১৯, ১০৪, ১১১; ইউসুফ, ভূমিকা; ইবরাহীম, টীকা ৮ থেকে ১৩; বনী ইসরাঈল, টীকা ১১৩ থেকে ১১৭; আল কাহাফ, টীকা ৫৭ থেকে ৫৯; মারয়াম, টীকা ২৯ থেকে ৩১, ত্বাহা, ভূমিকা, টীকা ৫ থেকে ৭৫; আল মু'মিনূন, টীকা ৩৯–৪২; আশ শু'আরা, টীকা ৭ থেকে ৪৯; আন নামল, টীকা ৮ থেকে ১৭১; আল কাসাস, ভূমিকা, টীকা ১ থেকে ৫৭; আল আহযাব আয়াত ৬৯; আস সাফ্ফাত, আয়াত ১১৪ থেকে ১২২।

৩৬. হামান সম্পর্কে ভিন্ন মতাবলম্বীদের আপত্তির জবাব ইতিপূর্বে সূরা কাসাসের টীকাসমূহে দেয়া হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ এমন স্পষ্ট নিদর্শনসহ যা দেখে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতো না যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত আর তাঁর পক্ষে আছে বিশ্ব–জাহানের পালনকর্তা মহান আল্লাহর শক্তি। যে নিদর্শনগুলোকে এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মূসার (আ) আদিষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেগুলো কি কুরআন মজীদে হযরত মূসার (আ) কাহিনীর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সে দিকে গভীরভাবে লক্ষ করলে তা বুঝা যায়। প্রথমত এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে কয়েক বছর আগে যে ব্যক্তি ফেরাউনের কওমের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো এবং যার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল, সে একখানা লাঠি হাতে হঠাৎ

فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوٓا أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِىٓ أَقْتُلْ مُوسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهُۥٓ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِى الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ مُوسٰىٓ إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

অতপর যখন সে আমার পক্ষ থেকে সত্য এনে হাজির করলো[৩৮] তখন তারা বললো, যারা ঈমান এনে তার সাথে সামিল হয়েছে তাদের ছেলেদের হত্যা করো এবং মেয়েদের জীবিত রাখো।[৩৯] কিন্তু কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়ে গেল।[৪০]

একদিন[৪১] ফেরাউন তার সভাসদদের বললো : আমাকে ছাড়ো, আমি এ মূসাকে হত্যা করবো।[৪২] সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমার আশংকা হয়, সে তোমাদের দীনকে পাল্টে দেবে কিংবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।[৪৩]

মূসা বললো, যেসব অহংকারী হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে না, তাদের প্রত্যেকের মোকাবিলায় আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি।[৪৪]

সোজা ফেরাউনের ভরা দরবারে নির্ভীক ও নিশঙ্কচিত্তে হাজির হচ্ছে এবং সাহসিকতার সাথে বাদশাহ ও তার সভাসদদের সম্বোধন করে আহবান জানাচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নেয় এবং তার নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে। কিন্তু তার গায়ে হাত তোলার সাহস কারো হচ্ছে না। অথচ মূসা (আ) যে কওমের লোক তারা এমন নিদারুনভাবে গোলামীর যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিলো যে, হত্যার অভিযোগে যদি তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেফতার করা হতো তাহলে তার কওমের বিদ্রোহ করা তো দূরের কথা প্রতিবাদের জন্য মুখ খোলারও কোন আশংকা ছিল না। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, লাঠি ও "ইয়াদে বায়দা"র (শ্বেত–শুভ্র হাত) মু'জিযা দেখারও পূর্বে ফেরাউন এবং তার সভাসদরা হযরত মূসার (আ) আগমনেই ভীত হয়ে পড়েছিলো। প্রথম দর্শনেই তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে, এ ব্যক্তি অন্য কোন শক্তির ভরসায় এখানে এসেছে। অতপর তার হাতে একের পর এক বিস্ময়কর যেসব মু'জিযা সংঘটিত হলো তার প্রত্যেকটি এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল করার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, এটা জাদুশক্তি নয়, বরং খোদায়ী

শক্তির বিস্ময়কর প্রকাশ। এমন কোন জাদু আছে যার জোরে লাঠি সত্যিকার আজদাহায় রূপান্তরিত হতে পারে? কিংবা গোটা একটা দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হতে পারে? কিংবা একটি নোটিশ দেয়ার সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল বিস্তৃত একটি এলাকায় নানা ধরনের ঝড় তুফান আসতে পারে এবং আরেকটি নোটিশে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে? কুরআন মজীদের বর্ণনা অনুসারে এ কারণে ফেরাউন ও তার দায়িত্বশীল লোকজন মুখে যত অস্বীকার করুক না কেন, মন তাদের পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলো যে, হযরত মূসা (আ) সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৮৬ থেকে ৮৯; ত্বা-হা, টীকা ২৯ থেকে ৫৩; আশ শু'আরা, টীকা ২২ থেকে ৪১; আন নামল, টীকা ১৬)।

৩৮. অর্থাৎ যখন হযরত মূসা (আ) একের পর এক মু'জিযা ও নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে পুরোপুরি প্রমাণ করলেন যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রসূল এবং মজবুত প্রমাণাদি দ্বারা তাঁর সত্য হওয়া সুস্পষ্ট করে দিলেন।

৩৯. পূর্বেই সূরা আ'রাফের ১২৭ আয়াতে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, ফেরাউনের দরবারের লোকজন তাকে বলেছিলো, মূসাকে এভাবে অবাধে তৎপরতা চালানোর অধিকার আর কতদিন দেয়া যাবে এবং তার জবাবে ফেরাউন বলেছিলো অচিরেই আমি বনী ইসরাঈলদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত রাখার নির্দেশ দিতে যাচ্ছি। (তাফহীমুল কুরআন , আল আ'রাফ, টীকা ৯৩)। এ আয়াতটি থেকে জানা যাচ্ছে যে, ফেরাউনের পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত যে নির্দেশ জারী করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য ছিল হযরত মূসা (আ) এবং তাঁর সহযোগী ও অনুসারীদের এতটা ভীত সন্ত্রস্ত করে দেয়া যে, তারা যেন ভয়ের চোটে তার পক্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

৪০. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ اِلاَّ فِىْ ضَلاَلٍ । এ আয়াতাংশের আরেকটি অর্থ হতে পারে এই যে, ঐ কাফেরদের চক্রান্ত ছিল গোমরাহী, জুলুম-নির্যাতন এবং ন্যায় ও সত্যের বিরোধিতার খাতিরে। অর্থাৎ ন্যায় ও সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং মনে মনে তার সমর্থক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জিদ ও হঠকারিতা বৃদ্ধিই পেয়েছে এবং সত্যকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য তারা জঘন্য থেকে জঘন্যতম পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধান্বিত হয়নি।

৪১. এখান থেকে যে ঘটনার বর্ণনা শুরু হচ্ছে তা বনী ইসরাঈল জাতির ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অথচ বনী ইসরাঈল নিজেরাই তা বিস্মৃত হয়ে বসেছে। বাইবেল এবং তালমুদে এর কোন উল্লেখ নেই এবং অন্যান্য ইসরাঈলী বর্ণনায়ও তার কোন নাম গন্ধ পর্যন্ত দেখা যায় না। ফেরাউন এবং হযরত মূসার (আ) মধ্যকার সংঘাতের যুগে এক সময় এ ঘটনাটিও যে সংঘটিত হয়েছিলো বিশ্ববাসী কেবল কুরআন মজীদের মাধ্যমেই তা জানতে পেরেছে। ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে শত্রুতায় অন্ধ হয়ে না থাকলে যে ব্যক্তিই এ কাহিনী পাঠ করবে সে একথা উপলব্ধি না করে পারবে না যে, ন্যায় ও সত্যের দিকে আহবানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কাহিনী অত্যন্ত মূল্যবান ও বিশেষ মর্যাদার দাবীদার। তাছাড়া হযরত মূসার (আ) ব্যক্তিত্ব, তাঁর তাবলীগ ও প্রচার এবং তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া বিস্ময়কর মু'জিযাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফেরাউনের নিজের সভাসদদের মধ্য থেকে কারো সংগোপনে ঈমান গ্রহণ করা এবং মূসাকে (আ) হত্যার

ব্যাপারে ফেরাউনকে উদ্যোগী হতে দেখে আত্মসংবরণ করতে না পারা বুদ্ধি–বিবেক ও যুক্তি বিরোধীও নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার লম্বা চওড়া দাবি সত্ত্বেও গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতায় অন্ধ হয়ে কুরআনের সুস্পষ্ট সত্যসমূহের ধামাচাপা দেয়ার প্রচেষ্টা চালায়। ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামের "মূসা" নামক প্রবন্ধের লেখক এ শিরোনামের প্রবন্ধে যা লিখেছেন তা থেকেই একথা বুঝা যায়। তিনি লিখছেন ঃ

"ফেরাউনের দরবারে একজন বিশ্বাসী মূসাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন, কুরআনের বর্ণিত এ কাহিনী সুস্পষ্ট নয় (সূরা ৪০, আয়াত ২৮)। আমরা কি তাহলে হাগ্‌গাদায় বর্ণিত কাহিনীর বিষয়বস্তুর সাথে এ কাহিনীর তুলনা করবো যাতে ক্ষমা সুলভ দৃষ্টিতে কাজ করার জন্য ইয়েথরো ফেরাউনের দরবারে পরামর্শ দিয়েছিলো?"

জ্ঞান গবেষণার এসব দাবিদারদের কাছে এটা যেন স্বতঃসিদ্ধ যে, কুরআনের প্রতিটি বিষয়ে অবশ্যই খুঁত বের করতে হবে। কুরআনের কোন বক্তব্যের মধ্যে যদি কোন খুঁত বের করার সুযোগ না–ই পাওয়া যায় তাহলেও অন্তত এতটুকু যেন বলা যায় যে, এ কাহিনী পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। এভাবে ধীরে ধীরে পাঠকদের মনে এ সন্দেহও সৃষ্টি করে দেয়ার চেষ্টা করা যে, ইয়েথরো কর্তৃক মূসার (আ) জন্ম পূর্ব যে কাহিনী হাগ্‌গাদায় বর্ণিত হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো কোথাও থেকে তা শুনে থাকবেন এবং সেটাই এখানে এভাবে বর্ণনা করে থাকবেন। এটা হচ্ছে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার একটা বিশেষ স্টাইল যা এসব লোকেরা ইসলাম, কুরআন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে অবলম্বন করে চলেছে।

৪২. একথার দ্বারা ফেরাউন এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছে যেন কিছু লোক তাকে বিরত রেখেছে আর সেই কারণে সে মূসাকে (আ) হত্যা করছে না। তারা যদি বাধা না দিতো তাহলে বহু পূর্বেই সে তাঁকে হত্যা করে ফেলতো। অথচ প্রকৃতপক্ষে বাইরের কোন শক্তিই তাকে বাধা দিচ্ছিলো না। তার মনের ভীতিই তাকে আল্লাহর রসূলের গায়ে হাত তোলা থেকে বিরত রেখেছিলো।

৪৩. অর্থাৎ আমি তার পক্ষ থেকে বিপ্লবের আশংকা করছি। আর সে যদি বিপ্লব করতে নাও পারে তাহলে এতটুকু বিপদাশঙ্কা অন্তত অবশ্যই আছে যে, তার কর্ম-তৎপরতার ফলে দেশে অবশ্যই বিপর্যয় দেখা দেবে। তাই সে মৃত্যুদণ্ড লাভের মত কোন অপরাধ না করলেও শুধু দেশের আইন–শৃঙ্খলা রক্ষার (Maintenance of public order) খাতিরে তাকে হত্যা করা প্রয়োজন। সে ব্যক্তির ব্যক্তি সত্তা আইন শৃঙ্খলার জন্য সত্যিই বিপজ্জনক কিনা তা দেখার দরকার নেই। সে জন্য শুধু "হিজ ম্যাজেষ্টি"র সন্তুষ্টিই যথেষ্ট। মহামান্য সরকার যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, এ লোকটি বিপজ্জনক তাহলে মেনে নিতে হবে, সে সত্যিই বিপজ্জনক এবং সে জন্য শিরোচ্ছেদের উপযুক্ত।

এ স্থানে "দীন পাল্টে দেয়া"র অর্থও ভালভাবে বুঝে নিন, যার আশঙ্কায় ফেরাউন হযরত মূসাকে (আ) হত্যা করতে চাচ্ছিলো। এখানে দীন অর্থ শাসন ব্যবস্থা। তাই ফেরাউনের কথার অর্থ হলো انی اخاف ان يغير سلطانكم (روح المعانی ج ٢٤ ص ٥٦) । অন্য কথায়, ফেরাউন ও তার খান্দানের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে ধর্ম, রাজনীতি, সভ্যতা ও অর্থনীতির যে ব্যবস্থা মিসরে চলছিলো তা ছিল তৎকালে ঐ

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ۖ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

৪ রুকূ'

এ সময় ফেরাউনের দরবারের এক ব্যক্তি যে তার ঈমান গোপন রেখেছিলো—বললো : তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, আল্লাহ আমার রব? অথচ সে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে।[৪৫] সে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে তার মিথ্যার দায়–দায়িত্ব তারই[৪৬]। কিন্তু সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে যেসব ভয়ানক পরিণামের কথা সে বলছে তার কিছুটা তো অবশ্যই তোমাদের ওপর আসবে। আল্লাহ কোন সীমালংঘনকারী মিথ্যাবাদী লোককে হিদায়াত দান করেন না।[৪৭]

দেশের 'দীন'। আর ফেরাউন হযরত মূসার আন্দোলনের কারণে এ দীন পাল্টে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলো। কিন্তু প্রত্যেক যুগের কুচক্রী ও ধূরন্ধর শাসকদের মত সেও একথা বলছে না যে, আমার হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। তাই আমি মূসাকে হত্যা করতে চাই। বরং পরিস্থিতিকে সে এভাবে পেশ করছে যে, হে জনগণ, বিপদ আমার নয়, তোমাদের। কারণ মূসার আন্দোলন যদি সফল হয়, তাহলে তোমাদের দীন বদলে যাবে। নিজের জন্য আমার চিন্তা নেই। আমি তোমাদের চিন্তায় নিশেষ হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে, আমার ক্ষমতার ছত্রছায়া থেকে বঞ্চিত হলে তোমাদের কি হবে। তাই যে জালেমের দ্বারা তোমাদের ওপর থেকে এ ছত্রছায়া উঠে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাকে হত্যা করা প্রয়োজন। কারণ সে দেশ ও জাতি উভয়ের শত্রু।

৪৪. এখানে দু'টি সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান। এ দু'টি সম্ভাবনার কোনটিকেই অগ্রাধিকার দেয়ার কোন ইংগিত এখানে নেই। একটি সম্ভাবনা হচ্ছে, হযরত মূসা নিজেই সে সময় দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং হযরত মূসা (আ) তাকে ও তার সভাসদদের উদ্দেশ করে তখনই সবার সামনে প্রকাশ্যে এ জবাব দেন। অপর সম্ভাবনাটি হচ্ছে, ফেরাউন হযরত মূসার (আ) অনুপস্থিতিতে তার সরকারের দায়িত্বশীল লোকদের কোন মজলিসে একথা প্রকাশ করে এবং হযরত মূসাকে (আ) তার এ আলোচনার খবর কিছু সংখ্যক ঈমানদার লোক পৌছিয়ে দেয়, আর তা শুনে তিনি তাঁর অনুসারীদের একথা বলেন। এ দু'টি অবস্থার যেটিই বাস্তবে ঘটে থাকুক না কেন হযরত মূসার (আ) কথায় স্পষ্টত প্রকাশ পাচ্ছে যে,

ফেরাউনের হুমকি তাঁর মনে সামান্যতম ভীতিভাবও সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার হুমকির জবাব তার মুখের ওপরেই দিয়ে দিয়েছেন। যে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কুরআন মজীদে এ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে আপনা আপনি একথা প্রকাশ পায় যে, "হিসেবের দিন" সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে যেসব জালেমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিলো তাদের জন্যও সে একই জবাব।

৪৫. অর্থাৎ সে তোমাদেরকে এমন সব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিয়েছে যে, সে যে তোমাদের রবের রসূল তা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমানদার ব্যক্তির ইংগিত ছিল সে নিদর্শনসমূহের প্রতি যার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। (তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯১, এবং ৯৪ থেকে ৯৬; বনী ইসরাঈল, টীকা ১১৩ থেকে ১১৬; ত্বা-হা, টীকা ২৯ থেকে ৫০; আশ শু'আরা, টীকা ২৬ থেকে ৩৯; আন নামল, টীকা ১৬)।

৪৬. অর্থাৎ এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও তোমরা যদি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করো, সে ক্ষেত্রেও তোমাদের জন্য উচিত তাকে তার মত চলতে দেয়া। কারণ, অপর সম্ভাবনা এবং অত্যন্ত জোরদার সম্ভাবনা হচ্ছে, সে সত্যবাদী। আর সে ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করে আল্লাহর আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। তাই তোমরা যদি তাকে মিথ্যাবাদীও মনে করো তবুও তাকে বাধা দিও না। সে যদি আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলে থাকে তাহলে আল্লাহ নিজেই তার সাথে বুঝা পড়া করবেন। এর আগে হযরত মূসা আলাইহিস সালামও প্রায় অনুরূপ কথাই ফেরাউনকে বলেছিলেন ঃ

وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (الدخان : ٢١)

"তোমরা যদি কথা না মানো তাহলে আমাকে আমার মত চলতে দাও।"

এখানে এ বিষয় লক্ষ রাখতে হবে যে, ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার মু'মিন ব্যক্তি তার বক্তব্যের শুরুতে স্পষ্ট করে একথা বলেনি যে, সে হযরত মূসার (আ) প্রতি ঈমান এনেছে। প্রথম দিকে সে এমনভাবে তার বক্তব্য পেশ করেছে যাতে মনে হয় সে ফেরাউনের গোষ্ঠীরই একজন লোক এবং তার জাতির কল্যাণের জন্যই সে এ কথা বলছে। কিন্তু যখন সে দেখছে ফেরাউন ও সভাসদরা কোনক্রমেই সঠিক পথ অনুসরণ করতে চাচ্ছে না তখন শেষ মুহূর্তে সে তার ঈমানের গোপনীয়তা প্রকাশ করছে। পঞ্চম রুকূ'তে তার বক্তব্য থেকে তা প্রকাশ পাচ্ছে।

৪৭. এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ সম্ভব। ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তি হয়তো ইচ্ছা করেই এ দ্ব্যর্থবোধক শব্দটি এ জন্য বলেছিলো যে, তখনো সে তার ধ্যান-ধারণা খোলাখুলি প্রকাশ করতে চাচ্ছিলো না। এর একটি তাৎপর্য হচ্ছে, একই ব্যক্তির মধ্যে সত্যবাদিতার মত গুণ এবং মিথ্যা ও অপবাদের মত দোষের সমাবেশ ঘটতে পারে না। তোমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছো, মূসা (আ) একজন অতীব পবিত্র চরিত্র এবং অত্যন্ত উন্নত স্বভাবের মানুষ। তোমাদের মন-মগজে একথা কি করে স্থান পায়

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝ وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۝ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۝

হে আমার কওমের লোকেরা, আজ তোমরা বাদশাহীর অধিকারী এবং এ ভূ-ভাগের বিজয়ী শক্তি। কিন্তু আল্লাহর আযাব যদি আমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করার মত কে আছে?[৪৮]

ফেরাউন বললো, আমি যা ভাল মনে করছি সে মতামতই তোমাদের সামনে পেশ করছি। আর আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের নির্দেশনাই দিচ্ছি।[৪৯]

যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিলো, বললো : হে আমার কওমের লোকেরা, আমার আশংকা হচ্ছে, তোমাদের ওপরও সেদিনের মত দিন এসে না যায়, যা এর আগে বহু দলের ওপর এসেছিলো। যেমন দিন এসেছিলো নূহ (আ), আদ, সামূদ এবং তাদের পরবর্তী কওমসমূহের ওপর। আর এটা সত্য যে, আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর জুলুম করার কোন ইচ্ছা রাখেন না।[৫০]

যে, এক দিকে সে এত বড় মিথ্যাবাদী যে আল্লাহর নাম নিয়ে নবুওয়াতের ভিত্তিহীন দাবী করছে, অন্যদিকে তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে এরূপ উন্নত স্বভাব চরিত্র দান করেছেন। এর আরেকটি তাৎপর্য হচ্ছে, তোমরা যদি সীমালংঘনের মাধ্যমে মূসার (আ) প্রাণ নাশের জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তোমাদের দূরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে তৎপর হও তাহলে মনে রেখো, আল্লাহ কখনো তোমাদেরকে সফল হতে দেবেন না।

৪৮. অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া এ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিরূপ নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে নিজেদের জন্য তাঁর গযব ডেকে আনছো কেন?

৪৯. ফেরাউনের এ জবাব থেকে বুঝা যায় তার দরবারের এ সভাসদ যে মনে মনে ঈমান এনেছে, তা সে তখনো পর্যন্ত জানতে পারেনি। এ কারণে সে তার কথায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি বটে তবে একথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, তার মতামত ও চিন্তা ভাবনা শোনার পরও সে নিজের মত পাল্টাতে প্রস্তুত নয়।

وَيٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۗ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۗ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۖ ﴿٣٤﴾

হে কওম, আমার ভয় হয়, তোমাদের ওপর ফরিয়াদ ও অনুশোচনা করার দিন না এসে পড়ে, যখন তোমরা একে অপরকে ডাকতে থাকবে এবং দৌড়িয়ে পালাতে থাকবে। কিন্তু সেখানে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচানোর কেউ থাকবে না। সত্য কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করে দেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। এর আগে ইউসূফ তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু তোমরা তার আনীত শিক্ষার ব্যাপারে সন্দেহই পোষণ করেছো। পরে তার ইন্তিকাল হলে তোমরা বললে ঃ এখন আর আল্লাহ কোন রাসূল পাঠাবেন না।[৫১] এভাবে[৫২] আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকদের গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন যারা সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ প্রবণ হয়।

৫০. অর্থাৎ বান্দার সাথে আল্লাহর কোন শত্রুতা নেই যে, তিনি অযথা তাদের ধ্বংস করবেন। তিনি তাদের ওপর আযাব কেবল তখনই পাঠান যখন তারা সীমালংঘন করে। আর সে সময় তাদের ওপর আযাব তাঁর ন্যায় ও ইনসাফের দাবী হয়ে দাঁড়ায়।

৫১. অর্থাৎ তোমাদের গোমরাহী এবং সে গোমরাহীর ব্যাপারে তোমাদের হঠকারিতার অবস্থা এই যে, মূসা আলাইহিস সালামের পূর্বে তোমাদের দেশে ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবী হয়ে এসেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তোমরা নিজেরাও স্বীকার করো যে, তিনি অত্যন্ত উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, একথাও তোমরা স্বীকার করো যে, সে সময়ে তোমাদের ওপর যে দুর্ভিক্ষ এসেছিলো তৎকালীন বাদশাহর স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা বলে দিয়ে সাত বছর ব্যাপী সে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের ধ্বংসকারিতা থেকে তিনি তোমাদের রক্ষা করেছিলেন। তোমাদের গোটা জাতি একথাও স্বীকার করে যে, তাঁর শাসনামলের চেয়ে অধিক ন্যায় ও ইনসাফ এবং কল্যাণ ও বরকতের যুগ মিসরে আর কখনো আসেনি। কিন্তু তাঁর এসব গুণাবলী জানা ও মানা সত্ত্বেও তোমরা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর ওপর কখনো ঈমান আনো নাই। তাঁর মৃত্যু হলে তোমরা বলতে শুরু করলে, তাঁর মত লোক কি আর কখনো জন্ম নিতে পারে? তোমরা তাঁর গুণাবলী স্বীকার করলেও পরবর্তী কালেও সেটিকেই যেন তোমরা পরবর্তী সমস্ত নবীকে অস্বীকার করার একটা

ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰهَٰمَٰنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَٰبَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِى تَبَابٍ ﴿٣٧﴾

এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের ব্যাপারে ঝগড়া করে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন সনদ বা প্রমাণ আসেনি।[৫৩] আল্লাহ ও ঈমানদারদের কাছে এ আচরণ অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী। এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীর মনে মোহর লাগিয়ে দেন।[৫৪]

ফেরাউন বললো ঃ "হে হামান, আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করো যাতে আমি রাস্তাসমূহ পর্যন্ত পৌছতে পারি অর্থাৎ আসমানের রাস্তা এবং মূসার ইলাহকে উকি দিয়ে দেখতে পারি। মূসাকে মিথ্যাবাদী বলেই আমার মনে হয়।"[৫৫] এভাবে ফেরাউনের জন্য তার কুকর্মসমূহ সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তার সোজা পথে চলা থামিয়ে দেয়া হয়েছে। ফেরাউনের সমস্ত চক্রান্ত (তার নিজের) ধ্বংসের পথেই ব্যয়িত হয়েছে।

স্থায়ী বাহানা বানিয়ে নিয়েছো। এর অর্থ, কোন অবস্থায়ই তোমরা হিদায়াত গ্রহণ করবে না।

৫২. বাহ্যত মনে হয়, ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তির বক্তব্যের ব্যাখ্যা ও সংযোজনা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী বাক্যগুলো বলেছেন।

৫৩. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে সেসব লোককেই গোমরাহীতে নিক্ষেপ করা হয় যাদের মধ্যে এ তিনটি বৈশিষ্ট রয়েছে। এক, তারা কুকর্মে সীমা লংঘন করে এবং গোনাহ ও পাপাচারে এমনভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে যে, নৈতিক চরিত্র সংশোধনের কোন আহবানই গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। দুই, নবী-রসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত থাকা হয় তাদের স্থায়ী আচরণ। আল্লাহর নবী তাদের সামনে যত সুস্পষ্ট নিদর্শনই পেশ করুন না কেন, তারা তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ

وَقَالَ الَّذِيٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

৫ রুকূ'

যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিলো, বললো ঃ হে আমার কওমের লোকেরা, আমার কথা মেনে নাও। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছি। হে কওম, দুনিয়ার এ জীবন তো কয়েক দিনের জন্য।[৫৬] *একমাত্র আখেরাতই চিরদিনের অবস্থানস্থল। যে মন্দ কাজ করবে সে যতটুকু মন্দ করবে ততটুকুরই প্রতিফল লাভ করবে। আর নারী হোক বা পুরুষ যে নেক কাজ করবে সে যদি ঈমানদার হয় তাহলে তারা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে বে হিসেব রিযিক দেয়া হবে।*

করে। তাছাড়া তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে তারা যেসব সত্য ও বাস্তবতা পেশ করেছেন তারা সেগুলোকেও সবসময় সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। তিন, তারা আল্লাহর কিতাবের বাণীসমূহ সম্পর্কে যুক্তি গ্রাহ্য পন্থায় চিন্তা-ভাবনা করার পরিবর্তে কূট তর্কের দ্বারা তার মোকাবিলার চেষ্টা করে। তাদের এ কূট তর্কের ভিত্তি কোন জ্ঞানগত যুক্তি বা আসমানী কিতাবের সনদ নয় বরং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের জিদ ও হঠকারিতাই তার একমাত্র ভিত্তি। যখন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে এ তিনটি দোষ দেখা দেয় আল্লাহ তখন তাদেরকে গোমরাহীর গহবরে নিক্ষেপ করেন। দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করতে পারে না।

৫৪. অর্থাৎ বিনা কারণে কারো মনে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয় না। যার মধ্যে অহংকার ও স্বেচ্ছাচারিতা সৃষ্টি হয় লা'নতের এ মোহর কেবল তার মনের ওপরেই লাগানো হয়। 'তাকাববুর' অর্থ ব্যক্তির মিথ্যা অহংকার যার কারণে ন্যায় ও সত্যের সামনে মাথা নত করাকে সে তার মর্যাদার চেয়ে নীচু কাজ বলে মনে করে। স্বেচ্ছাচারিতা অর্থ আল্লাহর সৃষ্টির ওপর জুলুম করা। এ জুলুমের অবাধ লাইসেন্স লাভের জন্য ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়াতের বাধ্য-বাধকতা মেনে নেয়া থেকে দূরে থাকে।

৫৫. ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার মু'মিন ব্যক্তির বক্তব্য পেশের সময় ফেরাউন হামানকে সম্বোধন করে একথা কিছুটা এমন ভঙ্গিতে বলছে যেন সে ঐ মু'মিনের কথাকে

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۝ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ز وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۝ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝ فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۚ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ ۝

হে কওম, কি ব্যাপার যে, আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে আহবান জানাচ্ছি আর তোমরা আমাকে আগুনের দিকে আহবান জানাচ্ছো। তোমরা আমাকে আহবান জানাচ্ছো যেন আমি আল্লাহর সাথে কুফরী করি এবং সেসব সত্তাকে তাঁর সাথে শরীক করি যাদের আমি জানি না।[৫৭] অথচ আমি তোমাদের সে মহাপরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে আহবান জানাচ্ছি। না, সত্য হচ্ছে এই যে, তোমরা যেসব জিনিসের দিকে আমাকে ডাকছো, তাতে না আছে দুনিয়াতে কোন আবেদন না আছে আখেরাতে কোন আহবান।[৫৮] আমাদেরকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। আর সীমালংঘনকারী[৫৯] আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। আজ তোমাদেরকে আমি যা বলছি অচিরেই এমন সময় আসবে যখন তোমরা তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক।[৬০]

আদৌ বিবেচনার যোগ্য বলে মনে করে না। তাই অহংকারী ভঙ্গিতে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হামানকে বলছেঃ আমার জন্য একটা উঁচু ইমারত নির্মাণ করো। আমি দেখতে চাই, মূসা যে আল্লাহর কথা বলে সে আল্লাহ কোথায় থাকে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল কাসাস, টীকা ৫২ থেকে ৫৪)।

৫৬. অর্থাৎ তোমরা যে এ পৃথিবীর অস্থায়ী ধন-সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে গর্বিত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছো তা তোমাদের অজ্ঞতা।

৫৭. অর্থাৎ তারা আল্লাহর শরীক এ ব্যাপারে আমার কাছে কোন জ্ঞানগত প্রমাণ নেই। তাই আমি চোখ বন্ধ করে এত বড় কথা কি করে মেনে নিতে পারি যে, প্রভুত্বে তাদেরও অংশীদারিত্ব আছে এবং আল্লাহর বন্দেগী করার সাথে সাথে আমাকে তাদের বন্দেগীও করতে হবে।

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾

শেষ পর্যন্ত তারা ঐ ঈমানদারের বিরুদ্ধে যেসব জঘন্য চক্রান্ত করেছে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।[৬১] *আর ফেরাউনের সাংগপাংগরাই জঘন্য আযাবের চক্রে পড়ে গিয়েছে।*[৬২] *দোযখের আগুন, যে আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল–সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।*[৬৩] *তারপর একটু চিন্তা করে দেখো সে সময়ের কথা যখন এসব লোক দোযখের মধ্যে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিল তারা সেসব লোকদের বলবে যারা নিজেদের বড় মনে করতো, "আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। এখন এখানে কি তোমরা আমাদেরকে জাহান্নামের কষ্টের কিছু অংশ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে?"*[৬৪]

৫৮. এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, তাদের প্রভুত্ব মেনে নেয়ার জন্য আল্লাহর সৃষ্টিকে দাওয়াত দেয়ার অধিকার তাদের দুনিয়াতেও নেই আখেরাতেও নেই। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, মানুষ জোর করে তাদেরকে ইলাহ বানিয়েছে। অন্যথায় তারা নিজেরা না দুনিয়াতে প্রভুত্বের দাবী করে, না আখিরাতে এ দাবী করবে যে, আমরাও ইলাহ ছিলাম। তোমরা আমাদেরকে কেন মেনে নাওনি? তৃতীয় অর্থ তাদেরকে ডাকার কোন উপকার না এই দুনিয়ায় আছে, না আখেরাতে আছে। কেননা, তারা একেবারেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বহীন এবং তাদেরকে ডাকা একেবারেই অর্থহীন।

৫৯. 'সীমালংঘন করা' অর্থ ন্যায় ও সত্যকে লংঘন করা। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রভুত্ব মেনে নেয় অথবা নিজেই প্রভু হয়ে বসে কিংবা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পৃথিবীতে নিজে স্বাধীন হওয়ার নীতি ও আচরণ করে এবং নিজের ওপর, আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির ওপর এবং পৃথিবীর যে জিনিসের সাথেই তারা সংশ্লিষ্ট হয় তার ওপরই অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করে, এসব ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান–বুদ্ধি ও ইনসাফের সকল সীমালংঘনকারী মানুষ।

৬০. এ আয়াতাংশ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, একথা বলার সময় উক্ত মু'মিন ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ সত্য বলার অপরাধে সে ফেরাউনের গোটা রাজ শক্তির রোষানলে

পড়বে এবং তাকে শুধু তার সম্মান, মর্যাদা ও স্বার্থ হারাতে হবে তাই নয়, জীবনের আশাও ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু এত কিছু বুঝতে পারা সত্ত্বেও তিনি শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করে এ নাজুক সময়ে তার বিবেক যেটিকে তার কর্তব্য বলে মনে করেছে সে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৬১. এ থেকে জানা যায়, ফেরাউনের সাম্রাজ্যে সে ব্যক্তি এতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল যে, ভরা দরবারে ফেরাউনের মুখের ওপরে এ ধরনের সত্য কথন সত্ত্বেও তাকে প্রকাশ্যে শাস্তি দেয়ার সাহস হয়নি। এ কারণে তাকে হত্যা করার জন্য ফেরাউন ও তার সহযোগীদের গোপনে ষড়যন্ত্র করতে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ সে ষড়যন্ত্রও বাস্তবায়িত হতে দেননি।

৬২. এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, ফেরাউনের সভাসদদের মধ্যকার ঈমানদার ব্যক্তির সত্য কথনের এ ঘটনা হযরত মূসা (আ) ও ফেরাউনের মধ্যকার দ্বন্দ্বের একেবারে শেষ যুগে সংঘটিত হয়েছিল। সম্ভবত এ দীর্ঘ দ্বন্দ্ব–সংঘাতে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ফেরাউন হযরত মূসাকে হত্যা করার সংকল্প করে থাকবে। কিন্তু তার সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী এ ব্যক্তির সত্য কথনের কারণে সে হয়তো আশঙ্কা করেছিলো যে, মূসা আলাইহিস সালামের প্রভাব সরকারের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের ওপরেও পড়েছে। হয়তো এ কারণেই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, মূসার (আ) বিরুদ্ধে এ পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বেই সাম্রাজ্যের আমীর, উমরা ও উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী লোকদের মধ্যে যারা এ আন্দোলনে প্রভাবিত হয়েছে সেসব লোকদের খুঁজে বের করা হোক যাতে তাদের মূলোৎপাটনের পর মূসাকে হত্যা করা যায়। কিন্তু সে এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকাকালেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও তাঁর অনুসারীদের হিজরতের আদেশ দিলেন। আর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে ফেরাউন তার সৈন্য–সামন্তসহ ডুবে মারা যায়।

৬৩. বহু সংখ্যক হাদীসে কবরের আযাব নামক বরযখের আযাবের যে উল্লেখ আছে এ আয়াত তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় আযাবের দু'টি পর্যায়ের উল্লেখ করছেন। একটি হচ্ছে কম মাত্রার আযাব যা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ফেরাউনের অনুসারীদের দেয়া হচ্ছে অর্থাৎ তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় দোযখের আগুনের সামনে পেশ করা হয় আর ঐ আগুন দেখে তারা সর্বক্ষণ আতংকিত হয়ে কাটায় এই ভেবে যে, এ দোযখেই তাদেরকে শেষ পর্যন্ত যেতে হবে। এরপর কিয়ামত আসলে তাদেরকে তাদের জন্য নির্ধারিত বড় এবং সত্যিকার আযাব দেয়া হবে। ডুবে মরার সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাদেরকে যে আযাবের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত দেখানো হবে। এ ব্যাপারটি শুধু ফেরাউন ও ফেরাউনের অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। অপরাধীদের জন্য যে জঘন্য পরিণাম অপেক্ষা করছে, মৃত্যুর মুহূর্ত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তারা সবাই সে দৃশ্য দেখতে পায় আর সমস্ত সৎকর্মশীল লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে শুভ পরিণাম প্রস্তুত করে রেখেছেন তার সুন্দর দৃশ্যও তাদেরকে দেখানো হয়। বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۖ قَالُوْا بَلٰى ۖ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾

বড়ত্বের দাবীদাররা বলবেঃ আমরা সবাই এখানে একই অবস্থায় আছি। আর আল্লাহ তার বান্দাদের ব্যাপারে ফায়সালা করে দিয়েছেন।[৬৫] দোযখে নিক্ষিপ্ত এসব লোক জাহান্নামের কর্মকর্তাদের বলবে ঃ "তোমাদের রবের কাছে দোয়া করো তিনি যেন একদিনের জন্য আমাদের আযাব হ্রাস করেন।" তারা বলবে, "তোমাদের রসূলগণ কি তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসেননি?" "তারা বলবে হ্যাঁ।" জাহান্নামের কর্মকর্তারা বলবে ঃ "তাহলে তোমরাই দোয়া করো। তবে কাফেরদের দোয়া ব্যর্থই হয়ে থাকে।"[৬৬]

ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى ، ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة ، وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل اليه يوم القيامة -

"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই মারা যায় তাকেই সকাল ও সন্ধায় তার শেষ বাসস্থান দেখানো হতে থাকে। জান্নাতী ও দোযখী উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি হতে থাকে। তাকে বলা হয় কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তোমাকে পুনরায় জীবিত করে তাঁর সান্নিধ্যে ডেকে নেবেন, তখন তোমাকে আল্লাহ যে জায়গা দান করবেন, এটা সেই জায়গা।"

(অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা, আয়াত ৯৭; আল আন'আম, ৯৩, ৯৪; আল আনফাল ৫০; আন নাহল ২৮, ৩২; আল মু'মিনূন, ৯৯, ১০০; ইয়াসীন ২৬, ২৭; টীকা ২২ ও ২৩; মুহাম্মাদ ২৭, টীকা ৩৭)।

৬৪. তারা এমন কোন আশা নিয়ে একথা বলবে না যে, তাদের ঐ সব পূর্বতন নেতা কিংবা শাসক বা পথপ্রদর্শক প্রকৃতই তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে বা তা

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾

৬ রুকূ'

নিশ্চিত জানো, আমি এ পার্থিব জীবনে আমার রসূল ও ঈমানদারদের অবশ্যই সাহায্য করি[৬৭] এবং যেদিন সাক্ষীদের পেশ করা হবে[৬৮] সেদিনও করবো। যেদিন ওজর ও যুক্তি পেশ জালেমদের কোন উপকারে আসবে না, তাদের ওপর লা'নত পড়বে এবং তাদের জন্য হবে জঘন্যতম ঠিকানা। অবশেষে দেখো, আমি মূসাকে পথনির্দেশনা দিয়েছিলাম[৬৯] এবং বনী ইসরাঈলদের এমন এক কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি যা ছিল বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের জন্য হিদায়াত ও নসিহত।[৭০]

কিছুটা লাঘব করিয়ে দেবে। তখন তাদের কাছে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এখানে এসব লোক আমাদের কোন কাজে আসার মত নয়। তারা তাদেরকে হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্য তাদেরকে বলবে ঃ দুনিয়ায় তো জনাব অত্যন্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ফলিয়ে আমাদের ওপর আপনার নেতৃত্ব চালাতেন। আপনাদের কল্যাণে এখন এখানে যে বিপদ আমাদের ওপর আপতিত তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন তো দেখি।

৬৫. অর্থাৎ আমরা ও তোমরা সবাই সাজাপ্রাপ্ত এবং আল্লাহর আদালত থেকে যার যে সাজা প্রাপ্য তা পেয়ে গেছি। তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা কিংবা তাঁর দেয়া শাস্তি হ্রাস বৃদ্ধি করার সাধ্য কারো নেই।

৬৬. অর্থাৎ ঘটনা যখন এই যে, রসূল তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলেন। আর তোমরা তাঁর কথা মানতে অস্বীকার (কুফরী) করেছিলে সে কারণে সাজা প্রাপ্ত হয়ে এখানে এসেছো তখন আমাদের পক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ, এ ধরনের দোয়ার জন্য কোন না কোন ওজর বা যুক্তি থাকা চাই। কিন্তু তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন ওজর বা যুক্তি পেশের সুযোগ আগেই নষ্ট করে ফেলেছো। এ অবস্থায় তোমরা নিজেরা দোয়া করতে চাইলে করে দেখো। তবে আমরা তোমাদেরকে প্রথমেই একথা বলে দিতে চাই যে, তোমাদের মত কুফরী করে যারা এখানে এসেছে তাদের দোয়া করা একেবারেই নিরর্থক।

৬৭. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আস সাফ্‌ফাত, টীকা ৯৩।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝٥٥ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۙ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝٥٦

অতএব, হে নবী, ধৈর্যধারণ করো।[৭১] *আল্লাহর ওয়াদা সত্য,*[৭২] *নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য মাফ চাও*[৭৩] *এবং সকাল সন্ধ্যা নিজের রবের প্রশংসার সাথে সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।*[৭৪] *প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যারা তাদের কাছে আসা যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে ঝগড়া করছে তাদের মন অহংকারে ভরা*[৭৫] *কিন্তু তারা যে বড়ত্বের অহংকার করে তারা তার ধারেও ঘেঁষতে পারবে না।*[৭৬] *তাই আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো*[৭৭] *তিনি সবকিছু দেখেন এবং শোনেন।*

৬৮. অর্থাৎ যখন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে এবং তাঁর সামনে সাক্ষী পেশ করা হবে।

৬৯. অর্থাৎ আমি মূসাকে (আ) ফেরাউনের মোকাবিলায় পাঠিয়ে তাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দিয়েছিলাম না। বরং প্রতি পদে আমি তাকে পথনির্দেশনা দিচ্ছিলাম এবং এভাবে তাকে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌছিয়ে দিয়েছিলাম। একথাটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত আছে। ইংগিতটি হচ্ছে, হে মুহাম্মাদ, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি তোমার সাথেও একই আচরণ করবো। তোমাকেও মক্কা নগরীতে কুরাইশ গোত্রের মধ্যে নবুয়াত দিয়ে পাঠানোর পর তোমাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেইনি যে, এ জালেমরা তোমার সাথে যেমন ইচ্ছা আচরণ করবে। বরং আমি নিজে তোমার পৃষ্ঠপোষক আছি এবং তোমাকে পথনির্দেশনা দান করছি।

৭০. অর্থাৎ যেভাবে মূসার (আ) দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীরা এ নিয়ামত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো এবং তাঁর প্রতি ঈমান পোষণকারী বনী ইসরাঈলকেই কিতাবের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে তেমনিভাবে এখন যারা তোমাকে অস্বীকার করবে তারা বঞ্চিত হবে এবং তোমার প্রতি ঈমান পোষণকারীরাই কুরআনের উত্তরাধীকারী এবং পৃথিবীতে হিদায়াতের পতাকাবাহী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে।

৭১. অর্থাৎ তুমি যে পারিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছো তা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে প্রশান্ত মনে বরদাশত করতে থাকো।

৭২. "আমি এ পার্থিব জীবনেও আমার রসূল ও ঈমানদারদের অবশ্যই সাহায্য করি।" একটু আগেই ওপরে বর্ণিত এ বাক্যাংশের প্রতিশ্রুতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

৭৩. যে প্রসংগে একথা বলা হয়েছে তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায়, এ ক্ষেত্রে ভুল–ত্রুটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে ধৈর্যহীনতার সে পরিস্থিতিকে যখন চরম বিরোধিতার সে পরিবেশে বিশেষ করে তাঁর সংগী সাথীদেরকে ক্রমাগত নির্যাতিত হতে দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিলো। তিনি চাচ্ছিলেন শীঘ্রই এমন মু'জিযা দেখিয়ে দিতে যা দেখে কাফেররা স্বীকার করে নেবে কিংবা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে এমন কিছু প্রকাশ পাক যা দেখে বিরোধিতার এ আগুন নিভে যায়। এ ধরনের আকাংখা পোষণ কোন গোনাহ ছিল না যে, সে জন্য তাওবা ও ইসতিগফারের প্রয়োজন পড়তো। তবে আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) যে উচ্চ আসনে সমাসীন করেছিলেন এবং সে পদমর্যাদা যে উচ্চ ও মহত সংকল্পের দাবি করে সে দিকের বিচারে এ যৎসামান্য ধৈর্যচ্যুতিও আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদার চেয়ে অনেক নীচু মনে হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, এ দুর্বলতার জন্য তোমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং পাথরের মত অটল হয়ে স্বীয় ভূমিকায় এমন অবিচল থাকো যেমনটি তোমার মত মহত মর্যাদার লোকদের হওয়া প্রয়োজন।

৭৪. অর্থাৎ এ প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করাই সে উপায় যার মাধ্যমে আল্লাহর পথের কর্মীরা আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো দুঃখ–কষ্টের মোকাবিলা করার শক্তি অর্জন করে। সকাল ও সন্ধ্যায় 'হামদ' ও 'তাসবীহ' বা প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সদা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। দুই, এ নির্দিষ্ট সময় দু'টিতে নামায আদায় করো। দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা এ সূরা নাযিল হওয়ার কিছুদিন পর সমস্ত ঈমানদারদের জন্য ফরয করে দেয়া হয়েছিল। কারণ, আরবী ভাষায় عشى শব্দটি সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের প্রথম অংশ পর্যন্ত সময় বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ সময়ের মধ্যে যোহর থেকে শুরু করে এশা পর্যন্ত চার ওয়াক্ত নামায অন্তরভুক্ত। আর ابكار শব্দটি ভোর বেলায় উষার আলো প্রকাশ পাওয়ার সময় থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে অর্থাৎ ফজরের নামাযের ওয়াক্তকে বলা হয়। (অধিক বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ৫, ৫৯, ৬০, ২৬৩; হূদ, টীকা ১১৩; আল হিজ্‌র, টীকা ৫৩; বনী ইসরাঈল, ভূমিকা এবং টীকা ১, ৯১ থেকে ৯৮; ত্বা–হা, টীকা ১১১; আন নূর, টীকা ৮৪ থেকে ৮৯; আল আনকাবূত, টীকা ৭৬ থেকে ৭৯; আর রূম, টীকা ২৪, ৫০)।

৭৫. অর্থাৎ এসব লোকের যুক্তি–প্রমাণহীন বিরোধিতা এবং যুক্তিহীন কূট তর্কের মূল কারণ এ নয় যে, আল্লাহর আয়াতসমূহে যেসব সত্য এবং কল্যাণের কথা তাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে তা তাদের বোধগম্য হয় না। সুতরাং তারা তা বুঝার জন্য সৎ নিয়তে তর্কে লিপ্ত হয়। বরং তাদের এহেন আচরণের মূল কারণ হচ্ছে, তাদের মনের গর্ব ও অহংকার একথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয় যে, তারা থাকতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা মেনে নেয়া হবে এবং একদিন তাদের নিজেদেরকেও এ ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে, যার তুলনায় নিজেদেরকেই তারা নেতৃত্বের অধিক উপযুক্ত মনে করে। তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সে জন্য তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জঘন্য থেকে জঘন্যতর কোন কৌশল কাজে লাগাতেও তারা দ্বিধান্বিত নয়।

মানুষ[৭৮] সৃষ্টি করার চেয়ে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা নিসন্দেহে অনেক বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।[৭৯] অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী এক রকম হতে পারে না এবং ঈমানদার ও সৎকর্মশীল সমান হতে পারে না। কিন্তু তোমরা কমই বুঝতে পারো।[৮০] কিয়ামত নিশ্চয়ই আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না।[৮১]

তোমাদের[৮২] রব বলেন : আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।[৮৩] যেসব মানুষ গর্বের কারণে আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৮৪]

৭৬. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ যাকে বড় বানিয়েছেন সে–ই বড় হয়ে থাকবে এবং এসব ছোট লোক নিজেদের বড়ত্ব কায়েম রাখার জন্য যে চেষ্টা–সাধনা করছে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

৭৭. অর্থাৎ ফেরাউনের হুমকির মুখে মহাপরাক্রমশালী একমাত্র আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে মূসা (আ) যেমন চিন্তা মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তেমনি কুরাইশ নেতাদের হুমকি ও ষড়যন্ত্রের মুখে তুমিও তাঁর আশ্রয় নাও এবং চিন্তামুক্ত হয়ে তাঁর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য তৎপরতা চালিয়ে যাও।

৭৮. ওপরে সাড়ে তিনটি রুকূ'তে কুরাইশ নেতাদের ষড়যন্ত্রসমূহ পর্যালোচনা করার পর এখান থেকে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা হচ্ছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যেসব সত্য মেনে নেয়ার আহবান জানাচ্ছেন তা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসংগত। তা মেনে নেয়ার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ এবং না মানা তোমাদের জন্য ধ্বংসাত্মক। এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের

কথা বলে তার সপক্ষে যুক্তি–প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। কারণ, কাফেরদের কাছে এ বিশ্বাস ছিল অদ্ভুত। একে তারা দুর্বোধ্য ও জ্ঞান–বুদ্ধির পরিপন্থী বলে মনে করতো।

৭৯. এটি আখেরাত সম্ভব হওয়ার প্রমাণ। কাফেরদের ধারণা ছিল যে, মৃত্যুর পর মানুষের পুনরায় জীবিত হওয়া অসম্ভব। এর জবাবে বলা হচ্ছে, যারা এ ধরনের কথা বলে তারা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ। যদি জ্ঞান–বুদ্ধি কাজে লাগানো হয় তাহলে একথা বুঝা তাদের জন্য মোটেই কঠিন নয় যে, যে আল্লাহ এ বিশ্ব–জাহান বানিয়েছেন মানুষকে পুনরায় জীবিত করা তাঁর জন্য কোন কঠিন কাজ হতে পারে না।

৮০. এটি আখেরাতের অনিবার্যতার প্রমাণ। ওপরের আয়াতাংশে বলা হয়েছিলো যে, আখেরাত হতে পারে তা হওয়া অসম্ভব নয়। আর এ আয়াতাংশে বলা হচ্ছে যে, আখেরাত হওয়া অনিবার্য, অবধারিত। জ্ঞান–বুদ্ধি ও ইনসাফের দাবী হলো তা হতেই হবে। তা হওয়া নয়, না হওয়াই জ্ঞান–বুদ্ধি ও ইনসাফের পরিপন্থী। কোন যুক্তিবাদী মানুষ কি কখনো একথা সঠিক বলে মেনে নিতে পারে যে, যারা পৃথিবীতে অন্ধদের মত জীবন যাপন করে এবং নিজেদের দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্ম দ্বারা আল্লাহর পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করে তোলে তারা তাদের ভুল আচার আচরণ ও কর্মকাণ্ডের কোন খারাপ পরিণাম আদৌ দেখবে না এবং অনুরূপ যারা দুনিয়াতে ভালমন্দ বিচার করে চলে এবং ঈমান গ্রহণ করে নেক কাজ করে, তারা নিজেদের এ উত্তম কর্মকাণ্ডের কোন ভাল ফলাফল থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে? এ বিষয়টি যদি জ্ঞান–বুদ্ধি ও ইনসাফের পরিপন্থী হয় তাহলে আখেরাত অস্বীকৃতির আকীদাও অবশ্যই জ্ঞান–বুদ্ধি ও ইনসাফের পরিপন্থী হতে হবে। কারণ, আখেরাত না হওয়ার অর্থ হচ্ছে ভাল ও মন্দ উভয় শ্রেণীর মানুষ মরে মাটিতে মিশে যাওয়া এবং উভয়ের একই পরিণতি লাভ করা। এরূপ হলে শুধু জ্ঞান–বুদ্ধি ও ইনসাফকেই হত্যা করা হয় না, বরং নৈতিকতাও মূলোৎপাটিত হয়। কারণ, ভাল ও মন্দ উভয় শ্রেণীর মানুষের যদি একই পরিণাম হয় তাহলে মন্দ লোকেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এ কারণে যে, তারা মৃত্যুর পূর্বে হৃদয়-মনের সমস্ত কামনা বাসনা পূরণ করেছে। আর সৎলোকেরা অত্যন্ত নির্বোধ এ কারণে যে, তারা অযথা নিজেদের ওপরে নানা রকমের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে রেখেছিলো।

৮১. এটা হচ্ছে আখেরাত সংঘটিত হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা। এ ধরনের ঘোষণা যুক্তি–তর্কের ভিত্তিতে দেয়া যায় না শুধু জ্ঞানের ভিত্তিতেই দেয়া যায়। আর আল্লাহর বাণী ছাড়া অন্য কোন বাণীতে এ বিষয়টি এমন অকাট্যভাবে বর্ণিত হতে পারে না। অহী বাদ দিয়ে শুধু জ্ঞান–বুদ্ধির উদ্ভাবনী ক্ষমতা, যা বলা যেতে পারে, তা শুধু এতটুকু যে, আখেরাত সংঘটিত হতে পারে এবং হওয়া উচিত। এর চেয়ে অগ্রসর হয়ে আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে একথা কেবল সে মহান সত্তাই বলতে পারেন যার জানা আছে যে, আখেরাত হবে। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া এমন সত্তা আর কেউ নেই। এখানে এসেই একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, অনুমান ও যুক্তি–তর্কের পরিবর্তে নির্ভুল জ্ঞানের ওপর যদি দীনের ভিত্তি স্থাপিত হয় তবে তা হতে পারে শুধু আল্লাহর অহীর মাধ্যমে।

৮২. আখেরাতের আলোচনার পর এখন তাওহীদ সম্পর্কে বক্তব্য শুরু হচ্ছে। আর এটি ছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মাঝে বিরোধের দ্বিতীয় বিষয়।

৮৩. অর্থাৎ দোয়া কবুল করা না করার সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার আমার কাছে। অথবা তোমরা অন্যদের কাছে দোয়া করো না, আমার কাছে দোয়া করো। এ আয়াতটির মূল ভাবধারা সঠিকভাবে বুঝতে হলে তিনটি বিষয় ভালভাবে বুঝে নিতে হবে।

প্রথমত, মানুষ দোয়া করে কেবল সে সত্তার কাছে যাকে সে سميع (সর্বশ্রোতা), بصير (সর্বদ্রষ্টা) এবং অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার (Super natural powers) অধিকারী মনে করে। মূলত মানুষের আভ্যন্তরীণ অনুভূতি তাকে দোয়া করতে উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুজগতের প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ যখন তার কোন কষ্ট নিবারণ কিংবা কোন প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয় বা যথেষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না তখন কোন অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী সত্তার কাছে ধর্ণা দেয়া অপরিহার্য। তখনই মানুষ দোয়া করে এবং না দেখেই সে সত্তাকে ডাকে; প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি জায়গায় এবং সর্বাবস্থায় ডাকে। একাকী নির্জনে ডাকে, উচ্চস্বরেই শুধু নয়, চুপে চুপেও ডাকে এবং মনে মনেও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। একটি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তা হয়। বিশ্বাসটি হচ্ছে, সেই সত্তা তাকে সর্বত্র সর্বাবস্থায় দেখছেন। তাঁর মনের কথাও শুনছেন। তিনি এমন অসীম ক্ষমতার অধিকারী যে, তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী যেখানেই অবস্থান করুক না কেন তিনি তাকে সাহায্য করতে পারেন, তার বিপর্যস্ত ভাগ্যকে পুনরায় তৈরী করতে পারেন। দোয়ার এ তাৎপর্য অনুধাবন করার পর মানুষের জন্য একথা বুঝা আর কঠিন থাকে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে সাহায্যের জন্য ডাকে সে প্রকৃতই নিরেট নির্ভেজাল এবং স্পষ্ট শিরকে লিপ্ত হয়। কারণ, যেসব গুণাবলী কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তা সেসব সত্তার মধ্যেও আছে বলে সে বিশ্বাস করে। সে যদি তাদেরকে ঐ সব খোদায়ী গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক না করতো তাহলে তার কাছে দোয়া করার কল্পনা পর্যন্ত তার মনে কখনো আসতো না।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় যে কথাটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে তা হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি কারো সম্পর্কে নিজের থেকেই একথা মনে করে বসে যে, সে অনেক ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক তাহলে অনিবার্য রূপেই সে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হয়ে যায় না। ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হওয়া একটি বাস্তব ব্যাপার যা কারো মনে করা বা না করার ওপর নির্ভর করে না। আপনি মালিক মনে করেন আর না করেন প্রকৃতই যে ক্ষমতা ইখতিয়ারের মালিক সে সর্বাবস্থায়েই মালিক থাকবে। আর যে প্রকৃত মালিক নয় আপনি তাকে মালিক মনে করে বসলেও এ মনে করাটা তাকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অতি সামান্য অংশও দিতে পারবে না। এটা বাস্তব ও সত্য যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তাই সর্বশক্তিমান, বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপক ও শাসক এবং সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তিনিই সামগ্রিকভাবে সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক। সমগ্র বিশ্ব-জাহানে দ্বিতীয় এমন কোন সত্তাই নেই, যে দোয়া শোনার কোন যোগ্যতা ও ইখতিয়ার রাখে বা তা কবুল করা বা না করার ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। মানুষ যদি এ বাস্তবতার পরিপন্থী কাজ করে নিজের পক্ষ থেকে নবী-রসূল, আওলিয়া, ফেরেশতা, জিন, গ্রহ-উপগ্রহ ও মনগড়া দেবতাদেরকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে অংশীদার মনে করে বসে তাতে বাস্তব অবস্থার সামান্যতম পরিবর্তনও হবে না। মালিক মালিকই থাকবেন এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ারহীন দাস দাসই থেকে যাবে।

তৃতীয় কথাটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যদের কাছে প্রার্থনা করা হুবহু এমন যেন কোন ব্যক্তি দরখাস্ত লিখে নিয়ে রাজ প্রাসাদে গেল কিন্তু ক্ষমতার প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে সেখানে অন্য যেসব প্রার্থী নিজেদের অভাব পূরণের আশায় বসে আছে তাদের কারো সামনে দরখাস্ত পেশ করে করজোড়ে কাকুতি-মিনতি করে বলতে থাকলো। হুজুরই সবকিছু, এখানে তো আপনার হুকুমই চলে, আমার প্রয়োজন যদি আপনি পূরণ করেন তবেই পূরণ হতে পারে। প্রথমত এ আচরণ নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক কিন্তু তখন যদি প্রকৃত ক্ষমতার ও ইখতিয়ারের মালিক শাসক সামনে বিদ্যমান থাকেন আর তার উপস্থিতিতে তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো সামনে দরখাস্ত পেশ করে কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করা হয় তাহলে এমন অবস্থায় তা চরম অশোভন ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ বলে পরিগণিত হয়। তাছাড়া এ অজ্ঞতা চরমে পৌঁছে তখন, যখন যে ব্যক্তির সামনে দরখাস্ত পেশ করা হচ্ছে সে নিজে তাকে বারবার একথা বুঝায় যে, আমিও তোমার মত একজন প্রার্থী। আমার কাছে কিছুই নেই। আসল শাসক তো সামনেই আছেন। তুমি তার কাছে দরখাস্ত পেশ কর। কিন্তু তার বুঝানো ও নিষেধ সত্ত্বেও এ নির্বোধ যদি বলতেই থাকে যে, আমার মালিক মনিব আপনি। আপনি যদি করে দেন তবেই আমার কাজ হবে। বস্তুত এরূপ অবস্থায়ই এ অজ্ঞতার চরম বহির্প্রকাশ ঘটে।

এ তিনটি বিষয় মনে রেখে আল্লাহ তা'আলার বাণী "আমাকে ডাকো। তোমাদের ডাকে সাড়া দানকারী আমি। তা গ্রহণ করা আমার কাজ।" আল্লাহ তা'আলার এ বাণীটি বুঝার চেষ্টা করুন।

৮৪. এ আয়াতের দু'টি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একটি হচ্ছে, এখানে "দোয়া" ও "ইবাদাত" শব্দ দু'টিকে সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, প্রথম বাক্যাংশে যে জিনিসকে দোয়া শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যাংশে সে জিনিসকেই ইবাদাত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এ দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, দোয়াও ঠিক ইবাদাত তথা ইবাদাতের প্রাণ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না এমন লোকদের জন্য "অহংকার ও গর্বভরে আমার ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়" কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর কাছে দোয়া করা বন্দেগী বা দাসত্বের দাবী। এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অর্থ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গর্ব ও অহংকারে ডুবে আছে। এ কারণে নিজের স্রষ্টা ও মনিবের কাছে দাসত্বের স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাণীতে আয়াতের এ দু'টি বিষয় পরিষ্কার বর্ণনা করেছেন। হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন : .... اِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ দোয়াই 'ইবাদাত'। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। (তোমরা আমাকে ডাকো আমি সাড়া দেবো। আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর)। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন : الدعاء مخ العبادة "দোয়া হচ্ছে ইবাদাতের সারবস্তু" (তিরমিযী)। হযরত আবু হুরাইরা বলেন, নবী (সা) বলেছেন : من لم يسأل الله يغضب عليه "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন" (তিরমিযী)।

এ পর্যায়ে একটি সমস্যারও সমাধান হয়ে যায় যা বহু সংখ্যক মানুষের মনে বেশীর ভাগ সময় দ্বিধা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে থাকে। দোয়া করার ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তাধারা হলো, তাকদীরের ভাল–মন্দ যখন আল্লাহর ইখতিয়ারে তখন তিনি তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যে ফায়সালা করেছেন সেটাই অনিবার্যরূপে ঘটবে। সুতরাং আমার দোয়া করার স্বার্থকতা কি? এটা একটা বড় রকমের ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তি মানুষের মন থেকে দোয়ার সমস্ত গুরুত্ব মুছে ফেলে। এ ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে পড়ে থেকে মানুষ যদি দোয়া করেও সেসব দোয়ায় কোন প্রাণ থাকে না। কুরআন মজীদের এ আয়াতটি দুটি পন্থায় এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করে। প্রথমত, আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছেন, "আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।" এ থেকে জানা যায়, তাকদীর এমন কোন জিনিস নয়। আমাদের মত (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলার হাত পাও বেঁধে দিয়েছে এবং তিনি দোয়া কবুল করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার হারিয়ে ফেলেছেন। নিসন্দেহে বান্দা আল্লাহর সিদ্ধান্তসমূহ এড়ানো বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু কোন বান্দার দোয়া ও আবেদন নিবেদন শুনে আল্লাহ নিজে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা অবশ্যই রাখেন। এ আয়াতে দ্বিতীয় যে কথাটি বলা হয়েছে তা হলো, দোয়া কবুল হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তার একটি ছোট বা বড় ফায়দা থাকে কোন অবস্থায়ই তা ফায়দাহীন নয়। সে ফায়দা হলো, বান্দা তার প্রভুর সামনে নিজের অভাব ও প্রয়োজন পেশ এবং দোয়া করে তাঁর প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় এবং নিজের দাসত্ব ও অক্ষমতা স্বীকার করে। নিজের দাসত্বের এ স্বীকৃতিই যথাস্থানে একটি ইবাদাত তথা ইবাদাতের প্রাণসত্তা। বান্দা যে উদ্দেশ্যে দোয়া করলো সেই বিশেষ জিনিসটি তাকে দেয়া হোক বা না হোক কোন অবস্থায়ই সে তার এ দোয়ার প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে না।

আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা পেয়ে যাই। নিম্ন বর্ণিত হাদীসগুলো প্রথমোক্ত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে।

হযরত সালমান ফারসী থেকে বর্ণিত নবী (সা) বলেছেন : لا يرد القضاء الا الدعاء (ترمذى) "দোয়া ছাড়া আর কোন কিছুই তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না" অর্থাৎ কোন কিছুর মধ্যেই আল্লাহর ফায়সালা পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই। কিন্তু আল্লাহ নিজে তাঁর ফায়সালা পরিবর্তন করতে পারেন। আর এটা হয় কেবল তখনি যখন বান্দা তাঁর কাছে দোয়া করে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

ما من احد يدعو بدعاء الا اتاه الله ما سال او كف عنه من السوء مثله ما لم يدع با ثم او قطيعة رحم (ترمذى)

"বান্দা যখনই আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ তখন হয় তার প্রার্থিত জিনিস তাকে দান করেন কিংবা তার ওপরে সে পর্যায়ের বিপদ আসা বন্ধ করে দেন—যদি সে গোনাহর কাজে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না করে।"

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক রসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত আরেকটি প্রায় অনুরূপ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله احدى ثلث ، اما ان يعجل له دعوته ، واما ان يدخرها له فى الا خرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها (مسند احمد)

"একজন মুসলমান যখনই কোন দোয়া করে তা যদি কোন গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা তিনটি অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় কবুল করে থাকেন। হয় তার দোয়া এ দুনিয়াতেই কবুল করা হয়, নয়তো আখেরাতে প্রতিদান দেয়ার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় অথবা তার ওপরে ঐ পর্যায়ের কোন বিপদ আসা বন্ধ করা হয়।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفرلى ان شيئت ، ارحمنى ان شئت ، ارزقنى ان شئت ، وليغزم مسئلته (بخارى)

"তোমাদের কোন ব্যক্তি দোয়া করলে সে যেন এভাবে না বলে, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে মাফ করে দাও, তুমি চাইলে আমার প্রতি রহম করো এবং তুমি চাইলে আমাকে রিযিক দাও। বরং তাকে নির্দিষ্ট করে দৃঢ়তার সাথে বলতে হবে; "হে আল্লাহ, আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করো।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকেই আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির ভাষা হচ্ছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ

ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة (ترمذى)

"আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করো।"

আরেকটি হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন যে,

يستجاب للعبد ما لم يدع باثم او قطيعة رحم مالم يستعجل ، قيل يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم اريستجاب لى فيستحسر عند ذلك و يدع الدعاء (مسلم)

"যদি গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় এবং তাড়াহুড়া না করা হয় তাহলে বান্দার দোয়া কবুল করা হয়।" জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহর রসূল,

তাড়াহুড়ো কি? তিনি বললেন : তাড়াহুড়ো হচ্ছে ব্যক্তির একথা বলা যে, "আমি অনেক দোয়া করেছি। কিন্তু দেখছি আমার কোন দোয়াই কবুল হচ্ছেনা। এভাবে সে অবসন্ন গ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা ছেড়ে দেয়।"

দ্বিতীয় বিষয়টিও নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন :

ليس شيئ اكرم على الله من الدعاء (ترمذى ، ابن ماجة)

"আল্লাহর কাছে দোয়ার চাইতে অধিক সম্মানার্হ জিনিস আর কিছুই নেই।"

হযরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

سلوا الله من فضله فان الله يحب ان يسال (ترمذى).

"আল্লাহর কাছে তার করুণা ও রহমত প্রার্থনা করো। কারণ, আল্লাহ তাঁর কাছে প্রার্থনা করা পছন্দ করেন।"

হযরত ইবনে উমর (রা) ও মু'আয ইবনে জাবাল বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন :

ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء

(ترمذى ، مسند احمد)

"যে বিপদ আপতিত হয়েছে তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী এবং যে বিপদ এখনো আপতিত হয়নি তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী। অতএব হে আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের দোয়া করা কর্তব্য।" (তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন :

يسال احدكم ربه حاجته كله حتى يسال شسع نعله اذا انقطع

(ترمذى)

"তোমাদের প্রত্যেকের উচিত তার রবের কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তাও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।"

অর্থাৎ মানুষ যে ব্যাপারগুলো বাহ্যত নিজের ইখতিয়ারভুক্ত বলে মনে করে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের আগে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবে। কারণ, কোন ব্যাপারে আমাদের কোন চেষ্টা–তদবীরই আল্লাহর তাওফিক ও সাহায্য ছাড়া সাফল্য লাভ করতে পারে না। চেষ্টা–তদবীর শুরু করার আগে দোয়া করার অর্থ হচ্ছে , বান্দা সর্বাবস্থায় তার নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছে।

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ﴿۶۱﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؗ فَاَنّٰی تُؤْفَكُوْنَ ﴿۶۲﴾ كَذٰلِكَ یُؤْفَكُ الَّذِیْنَ كَانُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ یَجْحَدُوْنَ ﴿۶۳﴾ اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۴﴾

৭ রুকূ'

আল্লাহই তো সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা রাতের বেলা আরাম করতে পারো। আর দিনকে আলোকিত করেছেন। সত্য এই যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুকম্পাশীল। তবে অধিকাংশ লোক শুকরিয়া আদায় করে না।[৮৫] সে আল্লাহই (যিনি তোমাদের জন্য এসব করেছেন) তোমাদের রব, সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।[৮৬] তোমাদেরকে কোন্ দিকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?[৮৭] এভাবেই সেসব লোককে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো।[৮৮]

আল্লাহই তো সেই সত্তা যিনি পৃথিবীকে অবস্থানস্থল বানিয়েছেন[৮৯] এবং ওপরে আসমানকে গম্বুজ বানিয়ে দিয়েছেন।[৯০] যিনি তোমাদের আকৃতি নির্মাণ করেছেন এবং অতি উত্তম আকৃতি নির্মাণ করেছেন। যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিসের রিযিক দিয়েছেন।[৯১] সে আল্লাহই (এগুলো যার কাজ) তোমাদের রব। অপরিসীম কল্যাণের অধিকারী তিনি। বিশ্ব–জাহানের রব তিনি।

৮৫. এ আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তরভুক্ত হয়েছে। প্রথমত এতে রাত ও দিনকে তাওহীদের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কারণ, রাত ও দিনের নিয়মতান্ত্রিকভাবে আগমনের অর্থ পৃথিবী ও সূর্যের ওপর একই আল্লাহর শাসন চলছে। আর তার ঘুরে ফিরে আসা এবং পৃথিবীর আর সব সৃষ্টির জন্য উপকারী হওয়া এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এক মাত্র আল্লাহই এসব জিনিসের স্রষ্টাও। তিনি তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের

জ্ঞান ও কৌশল দ্বারা এমনভাবে এ ব্যবস্থা চালু করেছেন যাতে তাঁর সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর হয়। দ্বিতীয়ত, এতে আল্লাহকে অস্বীকারকারী এবং আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী মানুষদেরকেও এ অনুভূতি দেয়া হয়েছে যে, রাত ও দিনের আকারে আল্লাহ তাদেরকে কত বড় নিয়ামত দান করেছেন। কিন্তু তারা কত বড় অকৃতজ্ঞ যে, তাঁর এ নিয়ামত নিজেদের কল্যাণে কাজে লাগিয়েও তারা দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও বিশ্বাসহীনতার কাজ করে যাচ্ছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা ইউনুস, টীকা ৬৫; আল ফুরকান, টীকা ৭৭; আন নাম্‌ল, টীকা ১০৪; আল কাসাস, টীকা ৯১; আর রূম, টীকা ৩৬; লোকমান, আয়াত ২৯; টীকা ৫০; ইয়াসীন, আয়াত ৩৭, টীকা ৩২)।

৮৬. অর্থাৎ রাত ও দিনের ঘুরে ফিরে আসা প্রমাণ করে যে, তিনিই তোমাদের ওসব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তাছাড়া এ আবর্তনের মধ্যে তোমাদের জীবনের জন্য যে বিরাট কল্যাণ নিহিত আছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তোমাদের অত্যন্ত দয়াবান পালনকর্তা। সুতরাং একথা আপনা থেকেই নিসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, তোমাদের প্রকৃত উপাস্যও তিনিই। তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা হবেন আল্লাহ আর উপাস্য হবে অন্য কেউ এটা জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইনসাফের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

৮৭. অর্থাৎ যে তোমাদের স্রষ্টাও নয় পালনকর্তাও নয় সে তোমাদের ইবাদাত তথা দাসত্ব পাওয়ার অধিকারী হবে একথা বলে তোমাদেরকে কে বিভ্রান্ত করছে?

৮৮. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগেই সাধারণ মানুষ শুধু এ কারণে এসব বিভ্রান্তকারীদের ধোঁকাবাজির শিকার হয়েছে যে, সত্য বুঝানোর জন্য আল্লাহ তাঁর রসূলের মাধ্যমে যে আয়াত নাযিল করেছেন মানুষ তা মানেনি। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, তারা সেসব স্বার্থপর ধোঁকাবাজদের জালে আটকে পড়েছে যারা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য নকল খোদার আস্তানা বানিয়ে বসেছিল।

৮৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআান, আন নাম্‌ল, টীকা ৭৪, ৭৫।

৯০. অর্থাৎ তোমাদেরকে খোলা আকাশের নিচে এমনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, মহাশূন্যের বিপদাপদ বৃষ্টির মত বর্ষিত হয়ে তোমাদেরকে তছনছ করে দেবে। বরং পৃথিবীর ওপরে একটি সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা কায়েম করে দিয়েছেন (যা দেখতে গম্বুজের মত মনে হয়)। এ ব্যবস্থাপনা অতিক্রম করে কোন ধ্বংসাত্মক বস্তুই তোমাদের কাছে পৌছতে পারে না। এমনকি মহাশূন্যের প্রাণ সংহারী রশ্মিসমূহও পৌছতে পারে না। এ কারণেই তোমরা নিরাপদে আরামে এ পৃথিবীতে বেঁচে আছ।

৯১. অর্থাৎ তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্বেই এমন সুরক্ষিত ও নিরাপদ অবস্থানস্থল প্রস্তুত করেছেন। তারপর তোমাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটি সর্বোত্তম দেহ-কাঠামো, উপযুক্ত অংগ-প্রত্যংগ এবং উন্নত দৈহিক ও চিন্তা শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ সরল সোজা দেহ কাঠামো, হাত পা, চোখ নাক, এবং কান, বাকশক্তি সম্পন্ন এ জিহবা এবং সর্বোত্তম যোগ্যতার ভাণ্ডার এ মস্তিষ্ক তোমরা নিজে তৈরী করে আননি, তোমাদের বাবা-মাও তৈরী করেনি, কোন নবী, অলী কিংবা দেবতার মধ্যেও তা তৈরী করার ক্ষমতা ছিল না। এসব যোগ্যতা ও ক্ষমতার সৃষ্টিকারী ছিলেন সে মহাজ্ঞানী,

هُوَ الْحَيُّ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّي ۡ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٦٦﴾

তিনি চিরঞ্জীব।[৯২] তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তোমাদের দীন তাঁর জন্য নিবেদিত করে তাঁকেই ডাকো।[৯৩] গোটা সৃষ্টি জগতের রব আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা।[৯৪]

হে নবী, এসব লোককে বলে দাও, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো আমাকে সেসব সত্তার দাসত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৯৫] (আমি কি করে এ কাজ করতে পারি) আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী এসেছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন গোটা বিশ্ব-জাহানের রবের সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করি।

দয়ালু ও সর্বশক্তিমান সত্তা যিনি মানুষকে সৃষ্টি করার সময় পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তাকে এ নজীরবিহীন দেহ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অতপর জন্মলাভ করার সাথে সাথে তাঁর দয়ায় তোমরা প্রচুর পবিত্র খাদ্য পেয়েছো, পানাহারের এমন সব পবিত্র উপকরণ লাভ করেছো যা বিষাক্ত নয়, সুস্বাস্থ্য দায়ক, তিক্ত, নোংরা ও বিস্বাদ নয় বরং সুস্বাদু, পচা গলা ও দুর্গন্ধ নয় বরং সুবাসিত খাদ্য প্রাণহীন নয়, বরং তোমাদের দেহের লালন ও প্রবৃদ্ধির জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী খাদ্য প্রাণ ও প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানে সমৃদ্ধ। পানি, খাদ্য, শস্য, তরকারী, ফলমূল, দুধ, মধু, গোশত, লবণ, মরিচ ও মসলা তোমাদের পুষ্টি সাধনের জন্য এসব অত্যন্ত উপযোগী এবং জীবনদায়িনী শক্তিই শুধু নয়, বরং জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদলাভের জন্যও অত্যন্ত উপযোগী। এ পৃথিবীতে এসব জিনিস কে এত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করেছে, ভূমি থেকে খাদ্যের এ অগণিত ভাণ্ডার উৎপাদনের এ ব্যবস্থা কে করেছে যে, তার যোগান কখনো বন্ধ হয় না? চিন্তা করে দেখো, রিযিকের এ ব্যবস্থা না করেই যদি তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হতো তাহলে তোমাদের জীবনের পরিস্থিতি কি দাঁড়াতো? সুতরাং এটা কি এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, তোমাদের স্রষ্টা শুধু স্রষ্টাই নন, বরং মহাজ্ঞানী স্রষ্টা এবং অত্যন্ত দয়ালু প্রভু? (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা হূদ, টীকা ৬ ও ৭, আন নাম্‌ল, টীকা ৭৩ থেকে ৮৩)।

৯২. অর্থাৎ তাঁর জীবনই বাস্তব ও প্রকৃত জীবন। একমাত্র তিনিই আপন ক্ষমতায় জীবিত। তাঁর জীবন ছাড়া আর কারো জীবনই অনাদি ও চিরস্থায়ী নয়। আর সবার জীবনই আল্লাহ প্রদত্ত, মরণশীল ও ধ্বংসশীল।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٨﴾

তিনিই তো সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্র থেকে। তারপর রক্তের পিণ্ড থেকে। অতপর তিনি তোমাদেরকে শিশুর আকৃতিতে বের করে আনেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেন যাতে তোমরা নিজেদের পূর্ণ শক্তিতে উপনীত হতে পারো। তারপর আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেন যাতে তোমরা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও। তোমাদের কাউকে আগেই ফিরিয়ে নেয়া হয়।[৯৬] এসব কাজ করা হয় এ জন্য যাতে তোমরা তোমাদের নির্ধারিত সময়ের সীমায় পৌঁছতে পারো[৯৭] এবং যাতে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারো।[৯৮] তিনিই প্রাণ সঞ্চারকারী এবং তিনিই মৃত্যুদানকারী। তিনি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে শুধু একটি নির্দেশ দেন যে, তা হয়ে যাক, আর তখনি তা হয়ে যায়।

৯৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আয যুমার, টীকা ৩ ও ৪।

৯৪. অর্থাৎ দ্বিতীয় আর কেউ নেই যার প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করা যেতে পারে এবং যার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যেতে পারে।

৯৫. এখানে পুনরায় 'ইবাদাত' ও দোয়াকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৯৬. অর্থাৎ কেউ জন্মলাভের পূর্বে, কেউ যৌবন প্রাপ্তির পূর্বে এবং কেউ বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছার পূর্বে মৃত্যু বরণ করে থাকে।

৯৭. নির্ধারিত সময়ের অর্থ মৃত্যুর সময় অথবা সে সময় যখন পুনরায় জীবিত হওয়ার পর সমস্ত মানুষকে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। প্রথম অর্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিয়ে সে বিশেষ সময় পর্যন্ত নিয়ে যান যা তিনি প্রত্যেক মানুষের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। বিশেষ সে মুহূর্তটি আসার পূর্বে যদি গোটা দুনিয়ার মানুষ মিলিত হয়েও তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে তবুও হত্যা করতে পারবে না। আবার সে মুহূর্তটি এসে যাওয়ার পর দুনিয়ার সমস্ত শক্তি মিলিত হয়েও যদি কাউকে জীবিত রাখার জন্য চেষ্টা করে তবুও সফল হতে পারবে না। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে এ পৃথিবীতে

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾

৮ রুকূ'

তুমি কি সেসব লোকদের দেখনি যারা আল্লাহর বিধানাবলী নিয়ে ঝগড়া করে, তাদেরকে কোথা থেকে ফিরানো হচ্ছে?[৯৯] যারা এ কিতাবকে অস্বীকার করে এবং আমি আমার রসূলদের যা দিয়ে পাঠিয়েছিলাম[১০০] তাও অস্বীকার করে? এসব লোক অচিরেই জানতে পারবে যখন তাদের গলায় থাকবে গ্রীবা বন্ধনী ও শৃঙ্খল, এসব ধরে টানতে টানতে তাদেরকে ফুটন্ত পানির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।[১০১]

তোমাদেরকে এ জন্য সৃষ্টি করা হয়নি যে, তোমরা মরে মাটিতে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বরং তিনি তোমাদেরকে জীবনের এসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এ জন্য অতিক্রম করান যাতে তাঁর নির্ধারিত সময়ে তোমরা তার সামনে হাজির হও।

৯৮. অর্থাৎ জীবনের এসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে অতিক্রম করানোর কারণ এ নয় যে, তোমরা পশুর মত জীবন যাপন করবে এবং পশুর মত মরবে। বরং এসব পর্যায় অতিক্রম করানো হয় এ জন্য যে, আল্লাহ তোমাদেরকে যে জ্ঞান–বুদ্ধি দিয়েছেন তা কাজে লাগাবে এবং সে নিয়ম–নীতি ও ব্যবস্থাপনা উপলব্ধি করবে যার অধীনে তোমাদের আপন সত্তার ওপর দিয়ে এসব আবার আবর্তন চলে। মাটির প্রাণহীন উপাদানসমূহের মধ্যে জীবনের মত বিস্ময়কর ও অদ্ভুত জিনিসের উৎপত্তি হওয়া, কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্টি–গোচর হয় এমন অতি ক্ষুদ্র শুক্রকীট থেকে মানুষের মত বিস্ময়কর সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভ করা তারপর মাতৃগর্ভে স্থিতিকাল থেকে প্রসবকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই এমনভাবে বেড়ে ওঠা যে, তার লিংগ, তার আকার–আকৃতি, তার দৈহিক কাঠামো, তার মানসিক বৈশিষ্টাবলী এবং তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা সবকিছুই সেখানে নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার সৃষ্টির ব্যাপারে দুনিয়ার কোন শক্তিরই প্রভাব খাটাতে না পারা। তাছাড়া যার গর্ভপাত হয় তার গর্ভপাতের শিকার হওয়া, যে শিশুকালে মরে যায় তার শিশুকালেই মরে যাওয়া, যে যৌবনকালে বা বৃদ্ধাবস্থায় কোন নির্দিষ্ট বয়স সীমায় পৌঁছে তার এমন সব ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেও সে বয়সে উপনীত হওয়া যেসব পরিস্থিতিতে নিশ্চিত মৃত্যু হওয়া উচিত এবং যাকে বয়সের কোন এক পর্যায়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে তার পৃথিবীর সর্বোত্তম কোন হাসপাতালে সুদক্ষ ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন থেকেও

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

অতপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে; এখন তোমাদের সেসব ইলাহ কোথায় যাদেরকে তোমরা শরীক করতে।[১০২] তারা জবাব দেবে, তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে। এর আগে আমরা যাদেরকে ডাকতাম তারা কিছুই না।[১০৩] আল্লাহ এভাবে কাফেরদের ভ্রষ্টতাকে কার্যকর করে দেবেন। তাদের বলা হবে, তোমাদের এ পরিণতির কারণ হচ্ছে, তোমরা পৃথিবীতে অসত্য নিয়ে মেতে ছিলে এবং সে জন্য গর্ব প্রকাশ করতে।[১০৪] এখন অগ্রসর হয়ে জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ করো। তোমাদেরকে চিরদিন সেখানেই থাকতে হবে। অহংকারীদের জন্য তা অতীব জঘন্য জায়গা।

মৃত্যুবরণ করা। এসব বিষয় কি এ সত্যটিই তুলে ধরছে না যে, আমাদের জীবনও কোন এক সর্বশক্তিমান সত্তার হাতে? বাস্তব অবস্থা যখন এই যে, এক সর্বশক্তিমান সত্তা আমাদের জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী তখন কোন নবী, অলী, ফেরেশতা কিংবা তারকা বা গ্রহ-উপগ্রহ আমাদের ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য হয় কিভাবে? তাছাড়া কোন মানব শক্তি এ পদমর্যাদা কিভাবে লাভ করলো যে, আমরা তার আইন-কানুন, তার আদেশ-নিষেধ এবং তার নিজের নির্ধারিত হালাল-হারাম বিনা বাক্যে মেনে নেব? (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা হজ্জ, টীকা ৯)।

৯৯. অর্থাৎ ওপরের বক্তব্য শোনার পরও কি তুমি একথা উপলব্ধি করতে পারনি যে, এসব লোকের ভ্রান্তি ও ভ্রান্ত আচরণের মূল উৎস কোথায় এবং তারা কোথায় ঠোকর খেয়ে গোমরাহীর এ গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে? (প্রকাশ থাকে যে, এখানে তুমি শব্দটি দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়নি, বরং এ আয়াত ক'টি পাঠকারী ও শ্রবণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে)।

১০০. এটা হচ্ছে তাদের হোঁচট খাওয়ার মূল কারণ। তাদের কুরআন এবং আল্লাহর রসূলদের আনীত শিক্ষা না মানা এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার পরিবর্তে ঝগড়াটেপনা দিয়ে তার মোকাবেলা করা এসব মৌলিক

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

হে নবী, ধৈর্য অবলম্বন করো।[১০৫] আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আমি তাদেরকে যে মন্দ পরিণতির ভয় দেখাচ্ছি এখন তোমার সামনেই এদেরকে তার কোন অংশ দেখিয়ে দেই কিংবা (তার আগেই) তোমাকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেই, সর্বাবস্থায় এদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।[১০৬]

হে নবী,[১০৭] তোমার আগে আমি বহু রসূল পাঠিয়েছিলাম। আমি তাদের অনেকের কাহিনী তোমাকে বলেছি আবার অনেকের কাহিনী তোমাকে বলিনি। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন নিদর্শন দেখানোর ক্ষমতা কোন রসূলেরই ছিল না।[১০৮] অতপর যখন আল্লাহর হুকুম এসেছে তখন ন্যায়সংগতভাবে ফায়সালা করা হয়েছে এবং ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[১০৯]

কারণেই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে এবং তাদের সোজা পথে আসার সমস্ত সম্ভাবনা নিশেষ করে দিয়েছে।

১০১. অর্থাৎ তারা যখন তীব্র পিপাসায় বাধ্য হয়ে পানি চাইবে তখন দোযখের কর্মচারীরা তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে টেনে হেঁচড়ে এমন ঝর্ণাধারার দিকে নিয়ে যাবে, যা থেকে টগবগে গরম পানি বেরিয়ে আসছে। অতপর তাদের সে পানি পান করা শেষ হলে আবার তারা তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবে।

১০২. অর্থাৎ তারা যদি সত্যিই রব হয়ে থাকে কিংবা প্রভুত্বে শরীক থেকে থাকে এবং বিপদের মুহূর্তে তারা তোমাদের কাজে আসবে এ আশায় তোমরা তাদের দাসত্ব করে থাকো তাহলে এখন তারা তোমাদেরকে উদ্ধার করছে না কেন?

১০৩. একথার অর্থ এই নয় যে, আমরা দুনিয়াতে শিরক করতাম না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এখন আমাদের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, দুনিয়ায় আমরা যাদের ডাকতাম তারা কিছুই ছিল না, নগণ্য ছিল, মূল্যহীন ছিল।

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾

৯ রুকূ'

আল্লাহই তোমাদের জন্য এসব গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা এসব পশুর কোনটির পিঠে আরোহণ করতে পার এবং কোনটির গোশত খেতে পার। এসবের মধ্যে তোমাদের জন্য আরো অনেক কল্যাণ নিহিত আছে। তোমাদের মনে যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয় এসবের পিঠে আরোহণ করে তোমরা সেখানে পৌছতে পার। এসব পশু এবং নৌকাতেও তোমাদের আরোহণ করতে হয়। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর এসব নিদর্শন দেখাচ্ছেন। তোমরা তাঁর কোন্ কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে?[১১০]

১০৪. অর্থাৎ যা ন্যায় ও সত্য ছিল না তোমরা শুধু তার আনুগত্য ও অনুসরণ করেই ক্ষান্ত হওনি বরং সে অসত্য নিয়ে তোমরা এতটা মগ্ন ছিলে যে, তোমাদের সামনে ন্যায় ও সত্য পেশ করা হলে সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করনি এবং নিজেদের বাতিল পূজার জন্য উল্টো গর্ব করেছো।

১০৫. অর্থাৎ যারা ঝগড়া ও বিতর্ক দ্বারা তোমাদের মোকাবিলা করছে এবং হীন চক্রান্তের মাধ্যমে তোমাদেরকে হেয় করতে চাচ্ছে তাদের কথা ও আচরণের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করো।

১০৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তিই তোমাকে পরাভূত করার জন্য চেষ্টা করেছে তাকেই এ পৃথিবীতে এবং তোমার জীবদ্দশাতেই আমি শাস্তি দেবো তা জরুরী নয়। কেউ এখানে শাস্তি পাক বা না পাক সে আমার শাস্তি থেকে কোন অবস্থায়ই রক্ষা পেতে পারে না। মৃত্যুর পর তাকে আমার কাছেই আসতে হবে। তখন সে তার কৃতকর্মের পুরো শাস্তি ভোগ করবে।

১০৭. এখান থেকে ভিন্ন একটি বিষয় শুরু হচ্ছে। মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, আমাদের দাবিকৃত মু'জিযা না দেখানো পর্যন্ত আমরা আপনাকে আল্লাহর রসূল বলে মেনে নিতে পারি না। তাদের একথা উল্লেখ না করেই পরবর্তী আয়াতসমূহে তার জবাব দেয়া হচ্ছে। (তারা যে ধরনের মু'জিযা দেখানোর দাবি করতো তার কয়েকটি নমুনার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, হূদ, টীকা ১৩; আল হিজর, টীকা ৪ ও ৫; বনী ইসরাঈল, টীকা ১০৫ ও ১০৬ ও আল ফুরকান, টীকা ৩৩)

১০৮. অর্থাৎ কোন নবীই নিজের ইচ্ছা মত কখনো কোন মু'জিযা দেখাননি। তাছাড়া নিজের পক্ষ থেকে মু'জিযা দেখানোর ক্ষমতাও কোন নবীর নেই। কোন নবীর মাধ্যমে

মু'জিযা কেবল তখনই প্রকাশ পেয়েছে যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে কোন অবাধ্য কওমকে দেখাতে চেয়েছেন। এটা কাফেরদের দাবির প্রথম জবাব।

১০৯. অর্থাৎ খেল–তামাসা হিসেবে কখনো মু'জিযা দেখানো হয়নি! মু'জিযা তো একটি সিদ্ধান্ত সূচক জিনিস। তা প্রকাশ পাওয়ার পরও কোন কওম যখন মানে না তখন তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তোমরা শুধু তামাশা দেখার জন্য মু'জিযা দাবী করছো। কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো না যে, এভাবে দাবীর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেদের দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনছো। এটা কাফেরদের এ ধরনের দাবীর দ্বিতীয় জবাব। ইতিপূর্বে কুরআনের কয়েকটি স্থানে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল হিজর, টীকা ৫ ও ৩০; বনী ইসরাঈল, টীকা ৬৮ ও ৬৯; আল আম্বিয়া, টীকা ৭ ও ৮; আল ফুরকান, টীকা ৩৩ ও আশ শু'আরা, টীকা ৪৯)।

১১০. অর্থাৎ তোমরা যদি শুধু তামাশা দেখা ও মনের আনন্দের জন্য মু'জিযার দাবী করে থাকো অর্থাৎ এতোটুকু নিশ্চিত হওয়া তোমাদের প্রয়োজন হয়ে থাকে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব কথা মানার জন্য তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন তা সত্য কিনা তাহলে আল্লাহর যেসব নিদর্শনাবলী তোমরা সর্বদা অবলোকন করছো এবং তোমাদের অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত হচ্ছে সেগুলোই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। প্রকৃত সত্য বুঝার জন্য এসব নিদর্শনের বর্তমানে আর কোন নিদর্শনের কি প্রয়োজন থাকতে পারে। এটা মু'জিযা দাবী করার প্রেক্ষিতে তৃতীয় জবাব। কুরআন মজীদের কতিপয় স্থানে এ জবাবটিও ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। সেখানে আমরা ভালভাবে এর ব্যাখ্যা করেছি। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ২৬ ও ২৭; ইউনুস, টীকা ১০৫; আর রা'দ, টীকা ১৫ থেকে ২০; আশ শু'আরা, টীকা ৩, ৪ ও ৫)।

পৃথিবীতে যেসব জন্তু মানুষের সেবায় নিয়োজিত আছে তার মধ্যে বিশেষ করে আছে গরু, মোষ, ভেড়া, বকরী, উট ও ঘোড়া। এসব জন্তুর সৃষ্টিকর্তা এমন নকশা অনুসারে এদের সৃষ্টি করেছেন যে, এসব অতি সহজেই মানুষের পোষ মানা সেবকে পরিণত হয়ে যায় এবং তাদের সাহায্যে মানুষের অসংখ্য প্রয়োজন পূরণ হয়। মানুষ এসবের ওপর আরোহণ করে, এসবকে ভার বহন করার কাজে লাগায়, ক্ষেত, কৃষি ও ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে, এর দুধ দোহন করে পান করে আবার তা দিয়ে লাচ্ছি, মাখন, ঘি, দধি, পনির এবং নানা রকমের মিষ্টি তৈরী করে। এর গোশত খায় এবং চর্বি ব্যবহার করে। এর পশম, লোম, চামড়া, নাড়িভুঁড়ি, হাড্ডি, রক্ত, গোবর তথা প্রতিটি জিনিস তার কাজে লাগে। এটা কি সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, মানুষের সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে তাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তার এ অসংখ্য প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে একটি বিশেষ পরিকল্পনাধীনে এ জন্তুটিকে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে?

তাছাড়া পৃথিবীর তিন–চতুর্থাংশ পানি এবং এক চতুর্থাংশ স্থলভাগ। স্থলভাগেরও বহু সংখ্যক ছোট বড় অঞ্চলের মধ্যে জলভাগ অবস্থিত। পৃথিবী গ্রহের এসব স্থলভাগে মানব বসতির বিস্তার এবং তাদের মাঝে পর্যটন ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া আদৌ সম্ভব হতো না যদি পানি, সমুদ্র ও বাতাসকে এমন নিয়ম–বিধির অধীন না করা হতো যার কারণে নৌ–পরিবহন করা সম্ভব হয়েছে এবং এমন সব উপায় উপকরণ সৃষ্টি করা

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

সুতরাং এরা কি[১১১] এ পৃথিবীতে বিচরণ করেনি, তাহলে এরা এদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণতি দেখতে পেত? তারা সংখ্যায় এদের চেয়ে বেশী ছিল, এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল এবং পৃথিবীর বুকে এদের চেয়ে অধিক জাঁকালো নিদর্শন রেখে গেছে। তারা যা অর্জন করেছিল, তা শেষ পর্যন্ত তাদের কাজে লাগেনি। তাদের রসূল যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে তাদের কাছে এসেছিলেন তখন তারা নিজের কাছে বিদ্যমান জ্ঞান নিয়েই মগ্ন ছিল[১১২] এবং যে জিনিস নিয়ে তারা বিদ্রূপ করতো সে জিনিসের আবর্তেই তারা পড়ে গিয়েছিলো। তারা যখন আমার আযাব দেখতে পেল তখন চিৎকার করে বলে উঠলো, আমরা এক ও লা-শরীক আল্লাহকে মেনে নিলাম। আর যেসব উপাস্যদের আমরা শরীক করতাম তাদের অস্বীকার করলাম। কিন্তু আমার আযাব দেখার পর তাদের ঈমান গ্রহণ কোন উপকারে আসার নয়। কারণ, এটাই আল্লাহর সুনির্ধারিত বিধান যা সবসময় তাঁর বান্দাদের মধ্যে চালু ছিল।[১১৩] সে সময় কাফেররা ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল।

না হতো যা ব্যবহার করে মানুষ জাহাজ নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। এটা কি এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, এক সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও মহাজ্ঞানী প্রভু আছেন যিনি মানুষ, পৃথিবী, পানি, সমুদ্র, বাতাস এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত জিনিসকে তাঁর নিজের বিশেষ পরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্টি করেছেন? এমনকি মানুষ যদি শুধু নৌপরিবহনের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করে তাহলে নক্ষত্রসমূহের অবস্থান এবং গ্রহসমূহের নিয়মিত আবর্তন থেকে এ ক্ষেত্রে যে সাহায্য পাওয়া যায় তা প্রমাণ করে যে, শুধু পৃথিবী নয়, মহানুভব সে প্রভু আসমানসমূহেরও স্রষ্টা।

তাছাড়া এ বিষয়টিও একটু ভেবে দেখুন, যে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাঁর এ অসংখ্য জিনিস মানুষের কর্তৃত্বাধীনে দিয়ে রেখেছেন এবং তার কল্যাণের জন্য এসব সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন, জ্ঞান ও চেতনা সুস্থ থাকলে আপনি কি তাঁর সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করতে পারেন যে, সে আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ) এমন নির্বোধ যে, তিনি মানুষকে এসব দিয়েছেন কিন্তু কখনো তার হিসেব নেবেন না?

১১১. এটা সমাপ্তিসূচক বাক্য। এ অংশ পাঠ করার সময় ৪, ৫ ও ২১ আয়াত ক'টি আরেকবার দেখে নিন।

১১২. অর্থাৎ নিজেদের দর্শন ও বিজ্ঞান, নিজেদের পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান, নেতাদের মনগড়া ধর্মীয় কিসসা কাহিনী (Mythology) এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানকেই (Theology) তারা প্রকৃত জ্ঞান মনে করেছে এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের আনীত জ্ঞানকে হীন ও নগণ্য মনে করে সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করেনি।

১১৩. আল্লাহর আযাব কিংবা মৃত্যুর মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্তই কেবল তাওবা ও ঈমান উপকারে আসে। আযাব এসে পড়া বা মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর ঈমান আনা কিংবা তাওবা করা আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।